শিক্ষা ও সমাজকাঠামো

বার্ট্রান্ড রাসেল

অনুবাদ
আরশাদ আজিজ

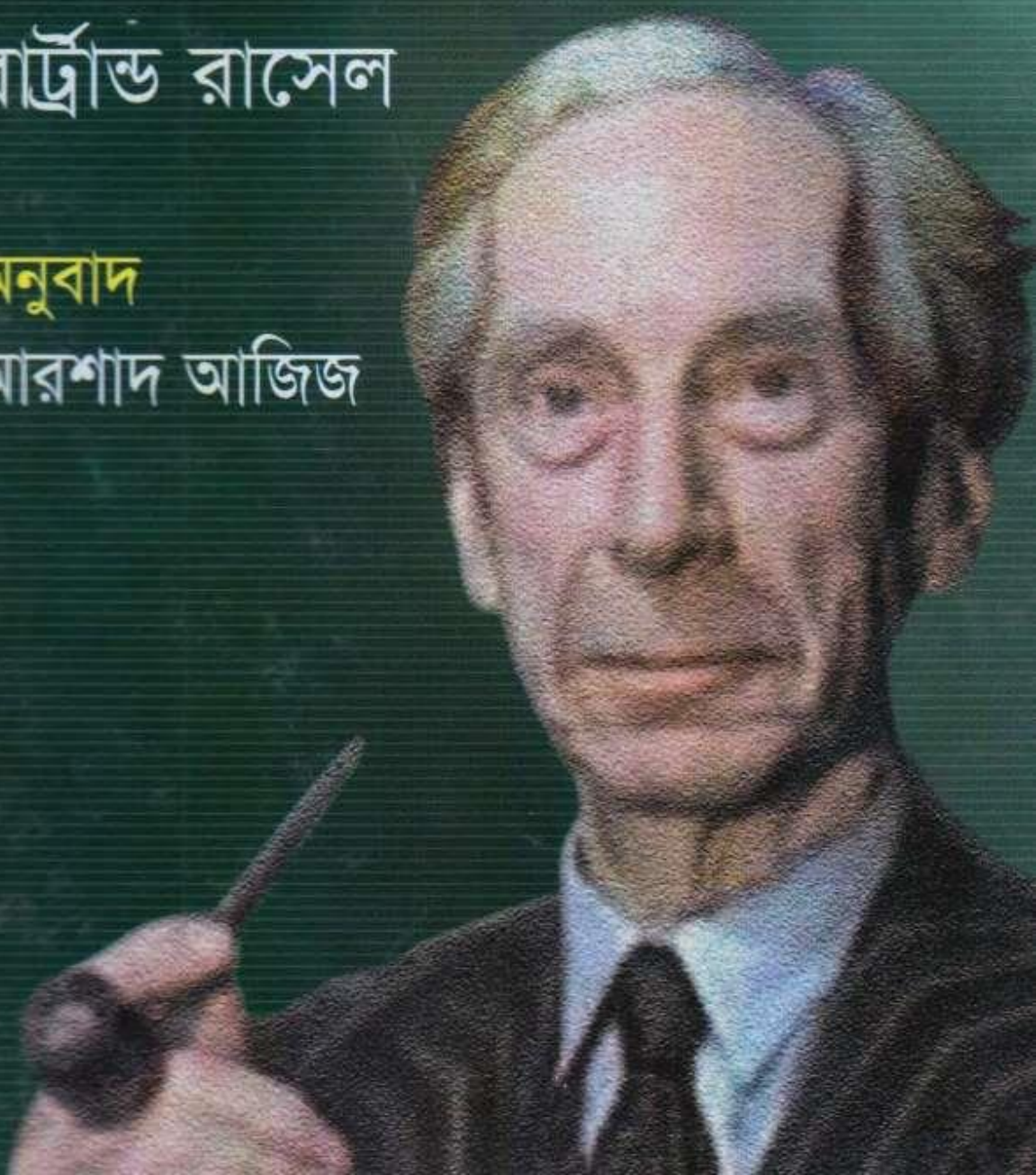

শিক্ষা
ও
সমাজকাঠামো

www.pathagar.com

বার্ট্রান্ড রাসেল

শিক্ষা ও সমাজকাঠামো

অনুবাদ
আরশাদ আজিজ

অবসর

www.pathagar.com

প্রথম অবসর প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

অবসর প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
প্রতীক ডট ডিজাইন

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 415 - 208 - 9

Shiksha O Samajkathamo [Bengali translation of the book : Education and the Social Order by Bertrand Russell]. Translated by Arshad Aziz.
Published by ABOSAR. 46/1 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
First Abosar Edition : February 2007. Price : Taka 120.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

বার্ট্রান্ড রাসেল ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে তাঁকে নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁকে অর্ডার অব মেরিট সম্মানে ভূষিত করেন ১৯৪৮ সালে। কোনো সন্দেহ নেই যে রাসেল ছিলেন তাঁর সময়ের বিশ্বের সেরা দার্শনিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। গণিত, প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের দর্শনে তাঁর অবদান অসামান্য। এতদ্ব্যতীত তিনি নানাবিধ জনপ্রিয় বিষয়ে একাধিক পুস্তক লিখেছেন। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা থেকে শুরু করে বিবাহ, সুখ, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি কোনো বিষয়ই তাঁর আওতা-বহির্ভূত ছিল না। এক সময় তিনি কিছু শখের গল্পও লেখেন। তা ছাড়া অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের হতবুদ্ধিকর আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সুবোধ ব্যাখ্যামূলক পুস্তক লেখেন এ.বি.সি. অব রিলেটিভিটি নামে।

বিষয় যাই হোক না কেন, জনপ্রিয় কিংবা টেকনিক্যাল, রাসেল কিন্তু সকল সময় স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তার স্বাক্ষর রাখতেন। তাঁর ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। এতটা প্রাঞ্জল যে পাঠককে অনেক সময় হোঁচট খেতে হয়। কোহ্লারের গেস্টাল্ট সাইকোলজি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে সরল ও কৌতুককর 'দৃশ্যে'র অবতারণা করেন তা সহজে বিস্মৃত হবার মতো ঘটনা নয়। শিক্ষা প্রক্রিয়ায় গেস্টাল্ট মনস্তত্ত্ব বিষয়ে কোহ্লারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে বোঝা যায় তিনি বলতে চান যে, জার্মান শাখামৃগরা কলা সংগ্রহের সমস্যার সম্মুখীন হলে হাত-পা গুটিয়ে ধ্যান করতে বসে যায়, অপেক্ষা করে আকস্মিক অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য। পক্ষান্তরে মার্কিনি শাখামৃগরা, রাসেল মনে করেন, সমস্যা-সমুদ্রে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ দিতে এতটুকু ইতস্তত করে না এবং অবলম্বন করে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতি। 'কলা' কথাটার পাদটীকায় রাসেল উল্লেখ করেছেন :

> called by Kohler the objective because the word 'banana' is too humble for learned work. The Pictures disclose the fact that 'the objective' was a mere banana।

রাসেলের দীর্ঘ কর্মজীবনে ঘটেছে নানা রঙের সমাবেশ। তাঁর জীবনের একটা দিকের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি বায়রনের তুলনা চলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে শান্তিবাদী আন্দোলনের জন্য তাঁকে ছয় মাস কারাভোগ করতে হয়। এই সময় তিনি লেখেন Introduction to Mathematical Philosophy. বর্তমান শতাব্দীর বিশের ও তিরিশের দশকে আগ্রহী কম্যুনিজম-বিরোধিতার জন্য তিনি বন্ধুবান্ধবদের গালমন্দ শোনেন। অবশ্য অনতিকাল পর উক্ত বন্ধুরা আবিষ্কার করেন যে বলশেভিজম একটা জঘন্য অন্যায় ও অমঙ্গলজনক মতবাদ। অতএব তাদের উপলব্ধি হয় যে, রাসেলের সাবধানবাণী অসার ও অমূলক ছিল না। এ ছাড়া তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত হন।

www.pathagar.com

নাস্তিকতা এবং রোমান্টিক প্রণয় ব্যাপারে তাঁর ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নিউইয়র্ক সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কার করেন। ফিলাডেলফিয়ার বার্নস ফাউন্ডেশন তাঁকে বহিষ্কার করে ক্লাস রুমে মিসেস রাসেলের 'অনভিপ্রেত' আচরণের জন্য। এক সময় একটি উড়োজাহাজ তাঁকে বহন করে যাত্রার সময় নরওয়ের অদূরে এক বরফ–গলা সাগরের উপকূলে ভেঙে পড়ে। রাসেল সাঁতরে তীরে ওঠেন। তিনি তখনো ভারী ওভারকোটখানা পরে আছেন।

বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর Education and the Social Order পুস্তক প্রকাশ করেন ১৯৩২ সালে। ইতঃপূর্বে তিনি শিক্ষা বিষয়ক আরো একটি কেতাব লেখেন। On Education নামক সেই পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। উক্ত পুস্তকে তিনি বিদ্যার্থীদের সামনে একটা আদর্শ তুলে ধরেন। রাসেল মনে করেন শিশুদের ব্যক্তি হিসেবে, বিশ্বের মুক্ত স্বাধীন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। বর্তমান পুস্তক, অর্থাৎ Education and the Social Order-এ তিনি দেখিয়েছেন, কোন ধরনের সামাজিক চাপ উক্ত আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অর্থ, দেশপ্রেম ও স্নবারি শিক্ষাদর্শের প্রভূত ক্ষতি করে থাকে। তা ছাড়া যৌনতা ও ধর্ম বিষয়ে ভুল শিক্ষা প্রদানের জন্যও বিস্তর অনিষ্টের কারণ ঘটে। উপরন্তু রাসেল বর্তমান পুস্তকে শিক্ষার বিভিন্ন আদর্শ ও পাশ্চাত্যের নানা ধরনের বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। কম্যুনিস্ট দেশের বিদ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্যও তিনি তুলে ধরেছেন।

১৯২৭ সালে বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর শিক্ষানীতি বাস্তবে প্রয়োগের লক্ষ্যে ছোটদের জন্য একটি পাঠশালা খোলেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি প্রভূত সহায়তা লাভ করেন স্ত্রী ডোরা রাসেলের। স্কুলে তিনি বিদ্যার্থীদের ইচ্ছেমতো চলাফেরা ও কাজের সুযোগ দিতেন। কিন্তু কয়েক বছর পর তিনি লক্ষ করেন যে কোনো একটি শিক্ষা পদ্ধতি সকল বিদ্যার্থীর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। আর ছোটদের ওপর একটু নজরদারি করারও দরকার আছে। ফলে তিনি প্রকল্প থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করেন। ১৯৩৫ সাল নাগাদ তিনি স্ত্রী ডোরার প্রতিও আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। ঐ বৎসর তাঁদের বিয়ে ভেঙে যায়।

ডোরা রাসেল কিন্তু বিকন হিল স্কুল নামক উক্ত পাঠশালা ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত পরিচালনা করেন।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ব্যক্তি বনাম নাগরিক ১১
শিক্ষার নঞর্থক তত্ত্ব ২০
শিক্ষা ও বংশগতি ২৭
আবেগ ও শৃঙ্খলা ৩২
গৃহ বনাম পাঠশালা ৩৬
অভিজাতশ্রেণী, গণতন্ত্রী এবং আমলা বাহিনী ৪১
গোষ্ঠীপ্রভাব ও শিক্ষা ৪৭
শিক্ষা ও ধর্ম ৫৩
সেক্স ও শিক্ষা ৬১
শিক্ষায় দেশপ্রেম ৬৮
শিক্ষায় শ্রেণীচেতনা ৭৫
শিক্ষায় প্রতিযোগিতা ৮২
কম্যুনিজমের অধীনে শিক্ষা ৯১
শিক্ষা ও অর্থনীতি ১০০
প্রচারণা ও শিক্ষা ১০৮
স্বকীয় ব্যক্তিতা ও নাগরিকতার মধ্যে সমন্বয় ১১৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিক্ষা ও সমাজ কাঠামো

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ব্যক্তি বনাম নাগরিক

শিক্ষা যে কাঙ্ক্ষণীয় এবং দরকারি তা সকল সভ্য রাষ্ট্রের অভিমত। তথাপি এই অভিমতও সকল যুগে কিছু 'শ্রদ্ধেয়' ব্যক্তি বিতর্কের উর্ধ্বে বলে মেনে নিতে পারেন নি। শিক্ষার বিরোধিতা যাঁরা করেন তাঁদের অভিমত হল শিক্ষা কখনো ঈপ্সিত সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এঁদের অভিমত সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার আগে আমাদের ভেবে দেখতে হবে শিক্ষা কতটা অর্জন করতে পারে বলে আমরা মনে করি। মানবকল্যাণ সম্পর্কে যেমন বিচিত্র ধারণা বিদ্যমান শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তেমনি রয়েছে বিচিত্র অভিমত। আবার এতসব বিতর্কের ভেতর একটা বিভেদ দেখা যাচ্ছে খুবই গভীর। একদল মনে করেন শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যক্তি, অপর দলের অভিমত হল শিক্ষার কেন্দ্রীয় স্থান দখল করবে সমাজ।

যদি ধরে নেওয়া হয় (এ–সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা হবে) শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রশিক্ষণ দেওয়া, কেবল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ঠেকানো নয়, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, শিক্ষা কি সৎ ব্যক্তি তৈরির জন্যে প্রশিক্ষণ দেবে, না সৎ নাগরিক গড়ে তুলবে। হয়তো বলা হবে, হেগেলপন্থীরা তো বলবেনই, যে, সৎ ব্যক্তি এবং সৎ নাগরিকের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। তাকেই সৎ ব্যক্তি বলা হবে যিনি সমষ্টির কল্যাণের জন্য কাজ করেন এবং সমষ্টির কল্যাণ সৎ ব্যক্তিদের সদ্‌গুণের যোগফল। চূড়ান্ত অধিবিদ্যক সত্য হিসেবে এই অভিমত আমি গ্রহণ কিংবা অগ্রাহ্য কোনোটাই করি না। তবে প্রতিদিনের কর্মময় জীবনে একজন শিশুকে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করলে ফলশ্রুতি হিসেবে যে শিক্ষার ধারণা পাওয়া যায় ঐ শিশুকে ভবিষ্যৎ নাগরিক গণ্য করলে যে শিক্ষার ধারণা পাব তা থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। ব্যক্তিমন তৈরি করা আর কেজো নাগরিক তৈরি করা এক ব্যাপার নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নাগরিক হিসেবে জেমস ওয়াটের চেয়ে গ্যেটের উপযোগিতা নিশ্চয় কম ছিল। কিন্তু নিছক ব্যক্তি হিসেবে বিচার করতে গেলে গ্যেটেকে অনেক উপরে স্থান দিতে হয়। ব্যক্তির মঙ্গল এবং সমাজের মঙ্গলে সুস্পষ্ট তফাত রয়েছে। ব্যক্তির মঙ্গল জিনিসটা কী এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা কাজ করে। একজনের ধারণার সঙ্গে যদি আমার ধারণা না মেলে তা হলে তার সঙ্গে আমি কিন্তু বিতর্কে লিপ্ত হব না। তবে এ ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করা হোক না কেন এটা অস্বীকার করা যাবে না যে ব্যক্তি তৈরি করা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে নাগরিক তৈরি করা এক ব্যাপার নয়।

এখন আমরা ভেবে দেখব কিসে ব্যক্তির মঙ্গল হয় বা সৎ ব্যক্তির কী কী গুণাগুণ থাকে। এখানে আমি আমার নিজের অভিমত ব্যক্ত করার চেষ্টা করব। অভিমতটা আমার

www.pathagar.com

একান্ত নিজস্ব হবে এবং এমন দাবি করব না যে অপরে আমার অভিমত অবশ্যই গ্রহণ করবে।

প্রথমেই বলি, ব্যক্তি হবে লেবনিজের মোনাডের মতো জগতের দর্পণ। কেন? তা আমি বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি যে জ্ঞান ও উপলব্ধির শক্তি একজনের গৌরবময় বৈশিষ্ট্য বা গুণ। এই গুণের জন্যেই আমার কাছে ঝিনুকের চেয়ে নিউটনের মূল্য অনেক বেশি। যে মানুষ তার মনের অন্ধকার কুঠুরিতে স্থানের গভীরতা, সূর্য এবং গ্রহসমূহের বিবর্তন, পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক বয়স, মানবতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ধরে রাখতে পারে, সে আমার কাছে প্রতিভাত হয় এমন ব্যক্তি হিসেবে যে মানবতার জন্যে মূল্যবান কিছু করছে। আর মানবতার জন্যে কিছু করার অর্থই হল প্রকৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের জন্যে কিছু করা। বিষয়টি নিয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে গিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমার এই ধারণা তরলিত করার দরকার করে না, যদি প্রমাণিতও হয় যে, আধুনিক পদার্থ শাস্ত্রের ইঙ্গিত সে রকমই, স্থানের গভীরতা এবং সময়ের অন্ধকার অতল গহ্বর গণিতবিদের সমীকরণের গুণক মাত্র। ঘটনা তাই হলে মানুষের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায় মহাজগতের প্রাচীনত্ব নির্ধারক এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর আবিষ্কর্তা হিসেবে। এতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষতি হলেও কল্পনার ক্ষেত্রে তা পুষিয়ে যায়।

মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে, এটা তার একটা বিরাট গুণ, তার চমৎকারিত্বের অংশ; কিন্তু এটা তার পরিচয়ের সবটা নয়। অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের দর্পণ হওয়া সবটা নয়। এখানে আবেগের ব্যাপারও খানিকটা থাকা চাই। জ্ঞেয় বস্তুর উপযোগী বিশেষ আবেগ কাজ করবে এবং জানার কাজে উপভোগ করতে হবে নির্মল আনন্দ। তবু একজন পূর্ণ মানুষের ক্ষেত্রে এক সঙ্গে জানা এবং অনুভব করা যথেষ্ট নয়। এই প্রবহমান জগতে মানুষ তার ভূমিকা পালন করে পরিবর্তনের কারণ হিসেবে, নিজেদের চৈতন্যের ভেতর কারণ হিসেবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে এবং ক্ষমতার ব্যাপারে সচেতনতা লাভ করে। আমাদের উচিত মানবতা অর্জনের জন্যে জ্ঞান, আবেগ ও ক্ষমতাকে যতদূর সম্ভব সম্প্রসারিত করা। প্রচলিত ধর্মতত্ত্ব অনুসারে ক্ষমতা, প্রজ্ঞা ও প্রেম হল যথাক্রমে ট্রিনিটির তিনটি গুণ, আর অন্তত এদিক থেকে দেখলে মানুষ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে নিজের মূর্তি অনুসারে।

এখানে কিন্তু আমরা মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে ভাবছি। বুদ্ধ, স্টয়িকসম্প্রদায়, খ্রিষ্টীয় সাধু এবং সকল অতীন্দ্রিয়বাদীরা মানুষকে যেভাবে দেখতেন আমরাও এখানে মানুষকে সেভাবেই দেখছি। পূর্ণ মানবের মধ্যে আমরা যে জ্ঞান ও আবেগমূলক উপাদানের সমাবেশের কথা ভাবছি তা কিন্তু আবশ্যিকভাবে সামাজিক নয়। আমরা যে ধরনের ব্যক্তির কল্পনা করছি তারা ইচ্ছাশক্তি এবং ক্ষমতাবলে সমাজের সক্রিয় সদস্যে পরিণত হন। এতদ্‌সত্ত্বেও ইচ্ছাশক্তি মানুষকে একনায়কে পরিণত করতে পারে। ব্যক্তির ইচ্ছাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করলে সে ইচ্ছা দাঁড়ায় সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার মতো, যা বলতে পারে 'এটা হও', 'সেটা হও।' একজন নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু একেবারে আলাদা। একজন নাগরিক জানেন তার ইচ্ছাই জগতের একমাত্র ইচ্ছা নয় এবং তার চিন্তা হল সমাজের নানা জনের ইচ্ছের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে তাতে যে কোনো উপায়ে সংগতি আনয়ন করা। ব্যক্তি স্বয়ম্ভূ সত্তা, পক্ষান্তরে একজন নাগরিক প্রতি পদে সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। সমাজ সুযোগ পেলেই তার ব্যক্তিসত্তা কেটে-ছেঁটে দেয়। কিন্তু একথা তো ঠিক একমাত্র রবিনসন ক্রুসো ছাড়া আমরা সবাই নাগরিক। শিক্ষাবিদদের এই ব্যাপারটা অবশ্যই লক্ষ করতে হবে। অবশ্য ধরা যেতে পারে যে, কোনো প্রকার সমঝোতায় পৌঁছা, কিংবা রাজনৈতিক জীবনে কঠোর বাস্তবের অনেক কিছু মেনে আমরা ব্যক্তি হিসেবে যদি

www.pathagar.com

নিজেদের সুপ্ত সম্ভাবনা বিষয়ে সচেতন হই তা হলে শেষ পর্যন্ত সৎ নাগরিক হতে পারব। নাগরিকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল একজন সৎ নাগরিককে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হয়, তার আন্তরিক অভিপ্রায় অন্য রকম হলেও। এখন, যে ব্যক্তি সহযোগিতা করবেন বা করতে চান (এবং তিনি যদি অসাধারণ না হন) তার লক্ষ্য হবে এমন উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা যার জন্যে তিনি সহযোগিতা করবেন। অর্থাৎ উদ্দেশ্যটির উপযোগিতার জন্যেই তিনি সহযোগিতা করবেন। একজন অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষেই শুধু নিঃসঙ্গভাবে কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের কথা ভাবা সম্ভব। এবং সে উদ্দেশ্যের জন্যে লোকেরা যদি সহযোগিতা করে তবে তাদের কল্যাণই হবে। এবং উক্ত অসাধারণ ব্যক্তি লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর জনগণকে আহ্বান জানান সহযোগিতা করার জন্যে। অতীতে এ ধরনের ব্যক্তি অনেক দেখা গেছে। গণিতবিদ পিথাগোরাস জ্যামিতি চর্চা করার জন্যে পরামর্শ দেন, এ জন্য আজকের দিনেও প্রতিটি স্কুলছাত্র তাকে অভিসম্পাত করে থাকে। কিন্তু এ ধরনের নিঃসঙ্গ এবং সৃষ্টিশীল নাগরিক বিরল। তাছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য যদি হয় নাগরিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া তা হলে পিথাগোরাসের মতো নাগরিক সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কমই থাকবে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের কাছে আশা করেন যে তারা স্থিতাবস্থার (status quo) সমর্থক হবে, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যও থাকবে সদা–প্রস্তুত। মজার ব্যাপার হল, দুনিয়ার সকল সরকারই চান কেবল নতজানু নাগরিক তৈরি হোক, আবার তারাই অতীত কালের যাদের বীরের মর্যাদা দিয়ে থাকেন তাদের চলতি আবির্ভাব ঠেকানোর জন্য সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। মার্কিনিরা জর্জ ওয়াশিংটন এবং টমাস জেফারসনকে অত্যন্ত ভক্তি করেন, কিন্তু যারা ঐ দুজনের রাজনৈতিক আদর্শ অনুসরণ করেন তাদের পাঠানো হয় জেলখানায়। ইংরেজরা Boadicea-কে দারুণ ভক্তি করেন। কিন্তু ইনি আধুনিক ভারতের হলে রোমকরা তাঁকে যে দৃষ্টিতে দেখতেন ইংরেজদের মনোভাব তার থেকে ভিন্ন হত না। পশ্চিমের সকল জাতিই খ্রিস্টকে ভক্তি করে থাকে। এই খ্রিস্ট আজকের লোক হলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ফেউরা তাঁর পেছনে লেগেই থাকতো। মার্কিনিরা তো তাঁকে নাগরিকত্ব প্রদান করতেই অস্বীকার করতেন। কারণ খ্রিস্ট কখনো মারণাস্ত্র বহন করতে রাজি হতেন না। এতেই বোঝা যায় আদর্শ হিসেবে নাগরিকতা কেন যথেষ্ট নয়। এতে সৃষ্টিশীলতার কোনো স্থান থাকবে না, রাষ্ট্রের কর্তারা যা বলবেন তাই কবুল করতে হবে, এই রাষ্ট্র গুটিকয়েকের শাসনাধীন হোক, কিংবা গণতান্ত্রিক। আর সৃষ্টিশীলতা বড় মানুষদের আবশ্যিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া রাষ্ট্র সাধারণ মানুষকে মহত্ত্ব অর্জনে বাধা দিয়ে থাকে।

এখানে আমি কিন্তু বিদ্রোহের প্রবক্তা হিসেবে হাজির হই নি। বিদ্রোহ নতজানু নীতির চেয়ে উন্নততর কিছু নয়। বিদ্রোহও বাহ্যিক ঘটনা দ্বারা নির্ধারিত হয়, ব্যক্তির বিচার বিবেচনা থেকে নয়। বিদ্রোহ প্রশংসিত হবে না নিন্দিত হবে তা নির্ভর করবে ব্যক্তি কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছেন সেটা বিবেচনার ওপর। তবে সকল সময় অন্ধ অনুসরণ নয়, মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হওয়ারও দরকার করে। আবার বিদ্রোহ এবং 'জি হুজুরগিরি'র চেয়েও মূল্যবান হল নতুন পথ বেছে নেওয়া। পিথাগোরাস যখন জ্যামিতি উদ্ভাবন করেন তখন এই কাজটিই করেছেন।

নাগরিকতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব বা বিতর্কের ব্যাপারটা শিক্ষা, রাজনীতি, নৈতিকতা এবং অধিবিদ্যার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্ষেত্রে এর তুলনামূলকভাবে সহজ ব্যবহারিক দিক রয়েছে, যা কতকাংশে বিবেচনা করা চলে তাত্ত্বিকতার আওতার বাইরে। গোটা সম্প্রদায়ের তরুণ শ্রেণীকে শিক্ষা যোগানো ব্যয়বহুল ব্যাপার। এই দায়িত্ব প্রধানত রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে। তরুণদের মানসিক গঠনে গির্জাও

www.pathagar.com

বড় ভূমিকা পালন করে। অবশ্য রাষ্ট্রের লক্ষ্য হল নাগরিকদের শিক্ষিত করে তোলা। ঐতিহ্য এই লক্ষ্য অর্জনের ভার অনেকটা বহন করছে এবং তা ঐতিহাসিক কারণেই। মধ্যযুগে লক্ষ্য ছিল কেবল যাজকদের শিক্ষিত করে তোলা। রেনেসাঁসের পর থেকে শিক্ষার লক্ষ্য দাঁড়ায় ভদ্রলোক শ্রেণী। স্নবিশ গণতন্ত্রের জন্য ব্যাপারটা আরো খারাপের দিকে যায়। এখন শিক্ষার লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে এমন লোক গড়ে তোলা, যে লোককে দেখলে ভদ্রলোক মনে হবে। আজকাল এমন জিনিসও পড়ানো হয় যা একজন নাগরিকের কখনো কোনো কাজে লাগবে না। এখানে বিদ্যার্থীদের genteel হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য কাজ করে। মধ্যযুগের ecclesiastical ঐতিহ্যের উপাদানও শিক্ষার মধ্যে রয়ে গেছে। এর লক্ষ্য হল সৃষ্টিকর্তার কার্যপ্রণালী উপলব্ধি করার জন্য সমর্থ করে তোলা। সাধুতা, ভদ্রতা, নাগরিকের নয়, ব্যক্তির গুণ হিসেবে গণ্য। সামগ্রিকভাবে খ্রিস্টধর্ম ব্যক্তির ধর্ম, কারণ এই ধর্ম গড়ে ওঠে রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন ব্যক্তিদের হাতে। আত্মার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক এই ধর্মের প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় এবং যদিও এখানে ব্যক্তির সঙ্গে তার প্রতিবেশীর সম্পর্ক বিষয়ে বিবেচনা করা হয়, তবু ব্যক্তির আত্মা, তার আবেগ এখানে প্রাধান্য পায়, কোনো বিধিমালা কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি বিবেচনায় আসে না।

আজকের দিনে খ্রিস্টধর্মে যে রাজনৈতিক উপাদান লক্ষ করি তা এসেছে সম্রাট কন্সটান্টাইনের কারণে। ইতিপূর্বে খ্রিস্টানদের দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব উপেক্ষা করা। কিন্তু কন্সটান্টাইনের পর থেকে ব্যাপারটা পাল্টে যায়। খ্রিস্টানদেরই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রশক্তিকে মান্য করে চলা। আবার রাষ্ট্রহীনভাবে খ্রিস্টধর্মের উদ্ভব হয়েছিল বলে আনুগত্যহীনতার মেজাজের বারবার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। ক্যাথারি (Cathari), আলবিজেনসেস (Albigenses) এবং স্পিরিচুয়াল ফ্রান্সিসক্যানরা কর্তৃত্ব উপেক্ষা করে নিছক মনের আলোকে পথ চলেছেন। প্রটেস্টান্টদের সূচনাই তো হল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দ্বারা। খ্রিস্টধর্ম রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ লাভ করার পর যে সব ডিক্রি জারি করেছে প্রটেস্টান্টরা তাতে কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পান নি। ফলে তারা অন্তরের যুক্তিতে চলেছেন এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছেন। ক্যাথলিকবাদ তত্ত্বগতভাবে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি কোনোদিন গ্রহণ করে নি। সাময়িক সুবিধার জন্য প্রয়োজনে বাস্তবতা কবুল করেছে। এ ক্ষেত্রে ক্যাথলিকরা রোমক সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য বহন করেছেন। পক্ষান্তরে প্রটেস্টান্টরা Apostle এবং Early Father-দের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে ফিরে গেছেন।

আমরা দু'রকমের ধর্ম দেখতে পাই। একটি রাজনৈতিক, অপরটি ব্যক্তি আত্মার ধর্ম। কনফুসিয়াসের ধর্ম রাজনৈতিক: কনফুসিয়াস যেহেতু এক রাজদরবার থেকে অপর রাজদরবারে ঘুরে বেড়াতেন তাই তিনি সরকারের সমস্যা নিয়ে ভাবিত হন। তিনি মানুষের মধ্যে সেই গুণগুলোই আশা করতেন যা দিয়ে সহজেই জনকল্যাণকর সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। বুদ্ধধর্ম সূচনায় রাজার ধর্ম হলেও, এটি কিন্তু রাজনৈতিক ছিল না। তাই বলে এই ধর্ম সকল যুগেই অরাজনৈতিক ছিল না। তিব্বতে বুদ্ধধর্ম পোপতন্ত্রের মতোই রাজনৈতিক। জাপানের সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধরা আমাকে ইংরেজ archdeacon-দের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তথাপি বৌদ্ধরা নিজেদের নিঃসঙ্গ সত্তা হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত। ইসলাম ধর্ম শুরু থেকেই রাজনৈতিক। মহম্মদ (দঃ)* স্বয়ং শাসক পদে নিযুক্ত হন, তাঁর উত্তরাধিকারী খলিফাগণ মহাসমরের শেষ পর্যন্ত ঐ ঐতিহ্য বহন করেন। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে তফাৎ এখানে

---

* দরুদ সরবরাহকৃত। অনুবাদক

www.pathagar.com

যে খলিফা রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন, মুসলমানদের কাছে এ দুটি দায়িত্ব অভিন্ন। পক্ষান্তরে খ্রিষ্টধর্ম অরাজনৈতিক বিধায় দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিকের সৃষ্টি করে। পোপ ও সম্রাট। পোপ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দাবি করেন এই যুক্তিতে যে ইহজাগতিক শাসনের গুরুত্ব নগণ্য। আমরা যদি রুশ কম্যুনিজমকে উদাহরণ ধরে বিবেচনা করি তা হলে দেখি যে কম্যুনিজম ইসলাম ধর্মের মতোই একটি রাজনৈতিক ধর্ম। এটি বাইজান্টাইন ঐতিহ্য দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে। এবং সম্ভবত ভবিষ্যতে কম্যুনিস্ট পার্টি গির্জার স্থান দখল করবে। তাছাড়া শাসন ব্যবস্থা ধর্মীয় শক্তির বাইরে ততটা রাখবে বিপ্লবের আগে যতটা ছিল। এ ক্ষেত্রে এবং আরো কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাশিয়া প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মানসিকতার দ্বারা দ্বিধা-বিভক্ত। এশীয় হিসেবে কম্যুনিস্ট পার্টি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, ইউরোপীয় হিসেবে কম্যুনিস্ট পার্টি দখল করবে গির্জার স্থান।

বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হল এটা দেখানোর জন্যে যে বর্তমান শিক্ষাদর্শে ব্যক্তির সংস্কৃতি গুরুত্ব পেয়েছে ঐতিহ্যের প্রভাবে। দিন যতই যাবে শিক্ষার আদর্শ ততই সংকুচিত হয়ে আসবে, কেবল নাগরিক তৈরি হয়ে দাঁড়াবে লক্ষ্য। তবে নাগরিক তৈরির শিক্ষা যদি সুবিবেচনাপ্রসূত হয় তা হলে সেটা ব্যক্তি সংস্কৃতির ভালো দিকটা ধরে রাখবে। দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে ব্যর্থ হলে ব্যক্তি রাষ্ট্রযন্ত্রের উপযোগী হাতিয়ারে পরিণত হবে, ব্যক্তির সৃষ্টিশীলতা হবে বিনষ্ট। অতএব সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত নাগরিক শিক্ষাদর্শের অন্তর্নিহিত বিপদ উপলব্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। বুঝতে হবে যে, কেবল নাগরিক তৈরির আদর্শ আখেরে বিপদ ডেকে আনতে পারে। সুনাগরিক সম্পর্কে বিভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলে নাগরিক হিসেবেও মানুষের অবনতি ঘটবে। ব্যক্তি সংস্কৃতিপুষ্ট লোকেরাই শুধু বুঝতে পারে নাগরিকত্বের জন্য ব্যক্তির সংস্কৃতি কী অবদান রাখতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে আজকের দিনে সংস্কৃতিবান লোকদের পাত্তা দেওয়া হয় না, দায়িত্বটা অর্পণ করা হয় নির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের ওপর। এমনকি সাধারণ রাজনীতিকের ওপরও এই দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তাদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা থাকে।

যে শিক্ষার মূল লক্ষ্য থাকে সৎ নাগরিক তৈরি করা তা দুই রকমের হতে পারে। এর একটির লক্ষ্য চালু সরকার সমর্থন, অপরটির লক্ষ্য চালু সরকার উৎখাত। মনে করা হয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষার লক্ষ্য স্থিতাবস্থা সমর্থন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। রাশিয়া ছাড়া অন্যত্র ধর্ম এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী এতটা শক্তিশালী যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেও শিক্ষাদর্শে প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকে যাবে। পক্ষান্তরে ফরাসি বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লবের আগে শিক্ষা ব্যাপক বিস্তার লাভ না করলেও প্রধানত সরকারবিরোধী ছিল। আজকের দিনেও যুক্তরাষ্ট্রের অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ অঞ্চলে অনুরূপ ঝোঁক রয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় এমন মতবাদ বিষয়ে শিক্ষা দিতে চায় যা অজ্ঞ কৃষকদের কাছে অপ্রীতিকর। অথচ এই কৃষকদের কাছ থেকে গৃহীত রাজস্বের টাকায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলে। স্বভাবতই কৃষকরা মনে করেন বংশীবাদককে যে পয়সা দেয় তার নির্বাচিত সুরই তাকে ভাঁজতে হবে। কিন্তু তারা বংশীবাদককে বুঝতে পারে না, সে কোন সুর তুলছে তাও ধরতে পারে না, তখন তার কাছে ব্যাপারটা একটু কঠিন মনে হয়। এসব ব্যতিক্রম সত্ত্বেও আধুনিক জগতে শিক্ষাদর্শের ঝোঁক প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে, সরকার রক্ষণশীল হলে সমর্থন করে, প্রগতিশীল হলে করে বিরোধিতা। আরো দুর্ভাগ্য এখানে যে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সৎ নাগরিক সম্পর্কে যা শিক্ষা দেওয়া হয় তা মোটেই সৎ নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমরবাদী দেশপ্রেমের ওপর খুব জোর দেওয়া হয়। এই দেশপ্রেমের অর্থ হল একটি অঞ্চলের

www.pathagar.com

লোকদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, অন্য অঞ্চলের লোকদের বিরোধিতা করা এবং পছন্দকৃত লোকদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দরকারে সমরশক্তি দিয়ে সাহায্য করতে ইচ্ছুক থাকা। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাগরিক সম্পর্কে যা শেখানো হয় তাতে ঘোরতর অন্যায় থেকে যায়। General Strike-এর সময় ধনাঢ্য তরুণদের একটা বিরাট অংশ দেশপ্রেমিকের রূপ ধারণ করে। তাদের এমন শিক্ষা ছিল না যে তারা ধর্মঘটিদের পক্ষে কাজ করবে। অন্যায়–অবিচারের বিপক্ষে আইন ও শাসনতান্ত্রিকতার সমর্থন নেওয়া যায়। রাশিয়া ছাড়া সর্বত্রই শিক্ষাজীবীরা শাসনতান্ত্রিকভাবে দুর্বলচিত্ত হয়ে থাকে, এবং যেকোনো কারণেই হোক, তারা ধনীদের অনুসারী হয়। আর উভয় কারণেই তারা আইন ও শাসনতন্ত্রের গুরুত্বের ওপর অতিরিক্ত জোর দেয়। অথচ এ দুটিই অতীতকে বর্তমানের ওপর চেপে বসার সুযোগ সৃষ্টি করে। আর যারা দুনিয়ার পরিবর্তন ও সংশোধন চান তারা হয়ে পড়েন বিপ্লবী। বিপ্লবীদের সমাজের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কিত ধারণা সংকীর্ণ হতে বাধ্য। এবং সবশেষে তারা আইন–শৃঙ্খলার প্রবক্তাদের মতোই বিপজ্জনক হয়ে পড়েন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থার প্রবক্তাদের চেয়ে পরিবর্তনের প্রবক্তারা উন্নততর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। পুরোনো নিয়ম পছন্দ করার জন্যে অভ্যাসই যথেষ্ট। রক্ষণশীলতার জন্যে উন্নততর মানসিক প্রক্রিয়ার দরকার করে না। পক্ষান্তরে পরিবর্তনের প্রবক্তাদের যথেষ্ট কল্পনাশক্তি থাকতে হবে যাতে তাঁরা নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারেন। মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানকে বিচার করার ক্ষমতাও তার থাকা চাই এবং যেহেতু তিনি ভালো করেই জানবেন যে স্থিতাবস্থারও প্রবক্তা রয়েছে, অতএব তাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, একজন সাধারণ মানুষের জন্যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সম্ভব। উপরন্তু চালু অবস্থার দরুন নির্যাতিতদের বিরুদ্ধে তার সহানুভূতি চেপে যেতে তিনি বাধ্য নন। স্থিতাবস্থাবিরোধী শিক্ষা, বুদ্ধি ও সহানুভূতির প্রতি কম দমনমূলক হয়, স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী হলে হয় উল্টোটা।

এর অবশ্য কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। স্থিতাবস্থার প্রতি বিরূপতার উৎস এর যে কোনো একটি হতে পারে—ভাগ্যহীনদের প্রতি সহানুভূতি থেকে এটা আসতে পারে কিংবা ভাগ্যবানদের প্রতি ঘৃণা থেকে। যদি ঘৃণা এর উৎস হয় তা হলে সহানুভূতি কম থাকে। অনেক বিপ্লবী তাদের দিবাস্বপ্নে মানুষের সুখের জন্য যতটা না ভাবেন তার চেয়ে বেশি ভাবেন কীভাবে ক্ষমতাসীন ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা যায়। এই ঊর্ধ্বতন লোকদের জন্য তারা বর্তমানে দুর্ভোগের শিকারে পরিণত হয়েছেন। বুদ্ধিগত দিক থেকে বলতে হয়, পরিবর্তনের প্রবক্তাদের ভেতর গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার ঝোঁক কাজ করে, সংকীর্ণ গোঁড়ামি এদের শক্তি। গোঁড়ামি বুদ্ধিবৃত্তির জন্যে কবর রচনা করে, এই গোঁড়ামির প্রকৃতি যাই হোক না কেন। এ জন্যেই চরমপন্থীদের গোঁড়ামি প্রতিক্রিয়াশীলদের চেয়ে উন্নততর কিছু নয়।

একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সংস্কৃতির সঙ্গে নাগরিকের শিক্ষার বিরোধ বাধে। অনিশ্চিত প্রশ্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ বিরোধটা দেখা দেয়। বিজ্ঞান একটা বিশেষ কৌশল উদ্ভাবন করেছে, কৌশলটা নতুন আবিষ্কারের অর্থাৎ পরিবর্তনের। বৈজ্ঞানিক মন তাকেই বলব যা আবিষ্কারের পক্ষে কাজ করে, বিজ্ঞানের চালু নীতিমালার প্রতি অনড় আস্থা গঠন বৈজ্ঞানিক মনের কাজ নয়। একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি আবিষ্কারে অসমর্থ হবেন বলেই মনে হয়, যেহেতু সে বয়ঃজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করবে, অতীতের মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি তার থাকবে গভীর শ্রদ্ধা এবং সে সকল নতুন মতবাদে আতংকবোধ করবে।

www.pathagar.com

ফলে আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি বিজ্ঞান হওয়াতে অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো রাষ্ট্র খোলা মনের মানুষ পছন্দ করে। কারণ এরা সাগ্রহে বিস্ফোরক সামগ্রী তৈরি করবে, আবার কোনো কোনো রাষ্ট্র পছন্দ করে যে এদের তরুণরা হবে রক্ষণশীল। এরা অতীতের মহান ঐতিহ্য বহন করবে। বাইজানটাইনেরা ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাপারে সামান্য ছাড় দিয়ে পাশ্চাত্যের সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হত অথচ তারা পুরনোকে আঁকড়ে থাকার নীতি বেছে নেয় এবং তুর্কিদের হাতে প্রচণ্ড মার খায়। ব্রিটিশ নৌশক্তিও একবার অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। বৈনাশিক ও বিশৃঙ্খল চরিত্রের তরুণদের কথা শুনবে নাকি নেলসনকে অনুসরণ করে সেকেলে প্রমাণিত হবে? দ্বিতীয় বিকল্পটিই তারা গ্রহণ করে। পূর্বসূরিদের মহান ঐতিহ্য অনুসরণ করতে গিয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হলেও। এ ব্যাপারে যারা সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল তারা এ রকমই বলে থাকেন।

আমাদের সময়ের একটা বিরাট দ্বন্দ্ব এখানে যে, ক্ষমতার উৎস, বিশেষ করে সরকারি ক্ষমতার উৎস বিজ্ঞানকে নির্ভর করতে হয় অনুসন্ধানীদের বিশৃঙ্খল মানসিক অবস্থার ওপর। বৈজ্ঞানিক মন সংশয়বাদীও নয়, বিচারবিযুক্তবাদীও নয়। সংশয়বাদীরা মনে করেন সত্য আবিষ্কার সম্ভব নয়, পক্ষান্তরে বিচারবিযুক্তবাদীরা মনে করেন সত্য ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানসেবীরা মনে করেন সত্য আবিষ্কার সম্ভব, যদিও এখনো আবিষ্কৃত হয় নি; অন্তত তিনি যে বিষয়ে গবেষণা করছেন তার সত্যতা যাচাই সম্পূর্ণ হয়নি।এমনকি সত্য আবিষ্কার সম্ভব বলাও প্রকৃত বিজ্ঞানী যা বিশ্বাস করেন তার চেয়ে বেশি বলা। কারণ বিজ্ঞানী কখনো তার আবিষ্কারকে চূড়ান্ত গণ্য করেন না, সত্যের কাছাকাছি মনে করেন এবং ভবিষ্যতে আরো সংশোধিত হতে পারে বলে বিশ্বাস করেন। কিছুই চূড়ান্ত নয়, বৈজ্ঞানিক আদর্শের এটিই হল শেষ কথা। সুতরাং বিশ্বাস পরীক্ষামূলক এবং বিচার সাপেক্ষ। কিন্তু যেহেতু সত্য বেরিয়ে আসে তার নিজের গবেষণা থেকে অতএব তা ব্যক্তিগত, সামষ্টিক নয়। বিজ্ঞানীর বিশ্বাস নির্ভর করে তার নিজস্ব বিশ্বাস ও অনুমানের ওপর। নাগরিকদের কী বিশ্বাস করা উচিত এবং সমাজ কী কল্যাণকর বলে মনে করে তার ওপর নির্ভর করে না। বৈজ্ঞানিক আদর্শের সঙ্গে বিজ্ঞানের সরকারি ব্যবহার বিরোধপূর্ণ। এই বিরোধ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে পারে। কারণ বৈজ্ঞানিক কৌশল নাগরিকের মনে গোঁড়ামি গেঁথে দেওয়ার কাজে ব্যবহার বিচিত্র কিছু নয়। এবং বিজ্ঞানের এই অপব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে। এই দুর্ঘটনা এড়াতে হলে যেসব ছাত্রের বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ ঝোঁক রয়েছে তাদের নাগরিক তৈরির প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। এবং এদের থাকবে স্বাধীন চিন্তার সুযোগ। যারা পরীক্ষায় ভালো করবেন তাদের নামের শেষে L. T কথাটা যুক্ত করার অধিকার থাকবে। যাতে বোঝা যায় এদের অবাধে চিন্তা করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। L. T. = Licensed to Think। এরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্বোধ গণ্য করলে দোষ ধরা যাবে না।

একটু জোর দিয়ে বলা যায় যে, সত্যের সমগ্র ধারণার সঙ্গে নাগরিকত্বের আদর্শের সমঝোতা সহজ কাজ নয়। প্রয়োগবাদীদের মতো হয়তো বলা হবে প্রথাগত আকারের সত্যের ধারণার কোনো বৈধতা নেই, এবং যা বিশ্বাস করা সুবিধাজনক তাই সত্য। ঘটনা যদি তাই হয় তা হলে সংসদে বিল পাস করে সত্য নির্ধারণ করা অনেক ভালো। লেই হান্ট দেখেছেন প্রিন্স রিজেন্টকে স্থূলকায় বলে বিশ্বাস করা ঠিক নয়, কারণ এজন্যে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। এতে ধরে নিতে হয় যে প্রিন্স রিজেন্ট হাল্কা-পাতলা ছিলেন। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদীদের দর্শন গ্রহণ করা একটু কঠিন বটে। অথচ এক্ষেত্রে পরিষ্কারই বোঝা

www.pathagar.com

যাচ্ছে যে প্রিন্স রিজেন্ট স্থূলকায় ছিলেন। আমি নিজে অবশ্য উক্ত সিদ্ধান্ত এড়ানোর জন্যে অনেক যুক্তি তর্ক খাড়া করতে পারি। 'স্থূল' একটি আপেক্ষিক শব্দ। মনে পড়ছে, ক্রাইস্ট কলেজের প্রয়াত মাস্টারকে। যিনি কোনোমতেই কৃশকায় ছিলেন না, একবার এক ভোজন সভায় দুজন বিখ্যাত লোকের মাঝখানে বসেন এবং মন্তব্য করেন যে তার নিজেকে কৃশকায় মনে হচ্ছে। উন্নত জাতের কিছু শূকরের সঙ্গে তুলনা করলে হয়তো প্রিন্স রিজেন্টকে কৃশকায় বলেই মনে হবে। সুতরাং লেই হান্টের অভিমত যথাযথ হওয়ার জন্য বলতে হবে যে প্রিন্স রিজেন্ট স্থূলতমদের এক শতাংশের একজন ছিলেন। তা হলে বলা যায়, 'প্রিন্স রিজেন্টের ওজন তাঁর উচ্চতার তুলনায়, এক শতাংশ ব্যতিরেকে, সবাইকে ছাড়িয়ে যায়।' এই বিবৃতি অনেকের কাছে অবাস্তব মনে হতে পারে। তা হলে এক শতাংশের স্থলে দু'শতাংশ ধরা হোক। এটা মনে করা যাবে না যে উক্ত প্রস্তাবনা সত্য, কারণ এটা বিশ্বাস করা অসুবিধাজনক, কিংবা শাস্তি পেতে হবে বলে এটা মিথ্যা। আমি একশ বছর আগের উদাহরণ বেছে নিয়েছি এজন্যে যে এতে কোনো রাজনৈতিক উন্মাদনা জাগবে না। কিন্তু বর্তমানের অনেক প্রস্তাবনা বিজ্ঞানমনস্ক কোনো ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবেন না। আবার জেলে যাওয়ার ভয়ে উচ্চারণও করবেন না। এই জগতের প্রত্যেক সরকার অবাঞ্ছিত সত্য (তাদের বিবেচনায়) গোপন করার জন্যে সম্ভব সকল কৌশল প্রয়োগ করেন এবং জনগণের জন্যে অকল্যাণকর (তাদের বিবেচনায়) জ্ঞান যারা প্রচার করেন তাদের নানাভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়। দেশদ্রোহিতামূলক জ্ঞানকে গণ্য করা হয় সবচেয়ে আপত্তিজনক, তারপর আসে এমন কিছু যা শ্লীলতাবর্জিত বলে গণ্য হয়ে থাকে। আমি এ 'অপরাধ' দুটির কোনো উদাহরণ দেব না, কারণ তা হলে আমাকেই হয়তো আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে।

এইসব কারণেই নাগরিক তৈরির শিক্ষা বিপজ্জনক। তবু সামাজিক সংহতি তৈরির উপযোগী শিক্ষার পক্ষে ভূরি-ভূরি যুক্তি রয়েছে।

সভ্য জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে সহযোগিতার ওপর, শিল্পায়ন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাবে। উদাহরণত চীনের সমৃদ্ধি অর্জনের সকল উপায়-উপকরণ রয়েছে, আরো রয়েছে একটা সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। তবে তাদের উচিত একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। স্পেন ও পর্তুগাল থেকে মুক্ত হবার পরও লাতিন আমেরিকা নিজেদের বিশৃঙ্খল চরিত্রের জন্যে উন্নতি করতে পারে নি। পশ্চাৎপদ রয়ে গেছে। কিছু কিছু লক্ষণ থেকে অনুমান করতে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকার উদাহরণ অনুসরণের জন্য তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে একটা বড় বিপদ এখানে যে এই দেশের অধিবাসীদের একটা বিরাট অংশের নাগরিকত্ববোধ বলে কিছু নেই। এটা ঘটছে শিক্ষা ব্যবস্থায় নাগরিকত্বের ওপর জোর দেওয়া হয় নি বলে নয়; বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোটা শিক্ষাযন্ত্র, স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত, নাগরিক তৈরির জন্যেই ব্যস্ত। কিন্তু শিক্ষার সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। ঐতিহ্যের জন্যে কিংবা তাদের নিকট-উত্তরসূরিরা ইউরোপীয় বলে তাদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ কাজ করে না। অথচ ইউরোপীয়দের মধ্যে এই বোধ খুবই প্রবল। এই বোধ যদি তাদের মধ্যে না জাগে তা হলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। দেশের ভেতর সুসঙ্গতি ছাড়াও আন্তর্জাতিক সুসঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাছাড়া গোটা মানব বংশ যে একটি সামবায়িক শক্তি এই বোধ জাগানো দরকার। আমাদের এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতাকে যদি টিকে থাকতে হয় তা হলে এই সুসঙ্গতিকে নির্বিকল্প জ্ঞান করতে হবে। আমি মনে করি আমাদের টিকে থাকার স্বার্থে ন্যূনতম শর্ত হিসেবে দরকার বিশ্বরাষ্ট্র গঠন। অতঃপর বিশ্বব্যাপী একটা অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থার কাজ

www.pathagar.com

হবে সকলকে বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য শেখানো। কোনো সন্দেহ নেই যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা দু'এক শতাব্দী ব্যক্তির স্বাধীনতা হয়তো ব্যাহত করবে কিন্তু এই ব্যবস্থার বিকল্প যদি হয় বিশৃঙ্খলা এবং সভ্যতার মৃত্যু, তা হলে ঐ মূল্যটুকু দিলে আখেরে লাভই হবে। আধুনিক জাতিসমূহ রাজনৈতিক এবং অর্থনেতিক কাঠামোর দিক থেকে অনেক সংহত, অতীতকালে এতটা সংহতি ছিল না। এই সম্প্রদায়গুলোকে যদি সফল হতে হয় তা হলে ব্যক্তি–নর ও ব্যক্তি–নারীর নাগরিকত্ববোধ উন্নত করতে হবে। বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য কোনোমতেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের মতো বাজে ব্যাপার হবে না। কারণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের অর্থ যুদ্ধের প্রতি সমর্থন দান। তবে এটা বুদ্ধিগত এবং নান্দনিক প্রেরণা কাটছাঁট করতে পারে। তথাপি আমি মনে করি নিকট-ভবিষ্যতের সবচেয়ে জরুরি কাজ হবে সকলের মধ্যে বিশ্ব নাগরিকতাবোধ জাগিয়ে তোলা। একবার এই বিশ্ব একক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন ব্যক্তি–সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের সুযোগ পাওয়া যাবে। তার আগে আমাদের সমগ্র সভ্যতা বিপদগ্রস্ত থাকবে।

আমি মনে করি ব্যক্তির শিক্ষা নাগরিকের শিক্ষার চেয়ে সুন্দর। তবে সমস্যাটা যদি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করি, এবং বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবি, তা হলে বলতেই হবে নাগরিকত্বের শিক্ষা পাওয়া উচিত সবার আগে স্থান।

www.pathagar.com

শিক্ষার নঞর্থক তত্ত্ব

আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষার তিনটি পৃথক তত্ত্ব রয়েছে; এবং বর্তমানকালে তিনটি তত্ত্বেরই প্রবক্তা খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথম তত্ত্বটি অনুসারে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হল ক্রমোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা, আর উক্ত সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন প্রভাব দূর করা। দ্বিতীয়টি অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য প্রতিটি ব্যক্তিকে সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা এবং ব্যক্তির দক্ষতার সর্বোচ্চ বিকাশ। তৃতীয়টি অনুসারে, শিক্ষার লক্ষ্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়, গোটা সম্প্রদায় এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে কেজো নাগরিক তৈরি করা। এই তত্ত্বগুলোর মধ্যে প্রথমটি একেবারে নতুন, পক্ষান্তরে তৃতীয়টি প্রাচীনতম। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। এই তত্ত্ব দুটি একটি ক্ষেত্রে একেবারে অভিন্ন: শিক্ষা সদর্থক অবদান রাখতে পারে। পক্ষান্তরে প্রথম তত্ত্বের নিহিত অর্থ হল শিক্ষা একেবারে নঞর্থক। প্রকৃত শিক্ষাদর্শ কিন্তু একান্তভাবে এর কোনো একটি দ্বারা চলে না। চালু সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় এই তত্ত্বগুলোর কোনো-না-কোনো উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি মনে করি এই তত্ত্বগুলোর কোনোটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এই তত্ত্বগুলোর যা-কিছু ভালো তা উপযুক্ত অনুপাতে গ্রহণ করলেই কেবল সঠিক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিজের অভিমত হিসেবে বলতে পারি যদিও প্রথম তত্ত্বে সত্যের ভাগটা অধিক এবং এই তত্ত্ব নঞর্থক, তবু এতে পুরো সত্য নেই। শিক্ষা বিষয়ে প্রগতিশীল চিন্তায় নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব খুব বেশি। নঞর্থক দৃষ্টি স্বাধীনতার মূল নীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রুশোর সময় থেকে এটা উদারনৈতিক চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এদিকে মজার ব্যাপার হল রাজনৈতিক উদারতত্ত্ব বাধ্যতামূলক শিক্ষায় আস্থাশীল, পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রীরা শিক্ষার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কম্যুনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গিও কিন্তু অনুরূপ। তথাপি এই বিশ্বাসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে উদারতন্ত্রের, এবং এতে সত্য ও মিথ্যার পরিমাণ সমান। অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাধীনতায় বিশ্বাসেও যেমন সত্য ও মিথ্যার পরিমাণ সমান।

এই সাম্প্রতিককালেও এ ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন তোলেননি যে, শিক্ষার কাজ হল শিশুদের উচিত জীবনযাপনের জন্য উপযোগী করে তোলা। তাদের শেখাতে হবে নৈতিক আপ্তবাক্য, তাদের কঠোর শ্রম প্রদানে অভ্যস্ত করতে হবে এবং সামাজিক অবস্থানের অনুপাতে তাদের কিছুটা জ্ঞান দিতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তা রূঢ়, বস্তুত এটা ঘোড়া প্রশিক্ষণের পদ্ধতি থেকে আলাদা কোনো ঘটনা নয়। ঘোড়ার জন্য চাবুক যা করে লাঠি শিশুর জন্য তাই করবে। অস্বীকার করার জো নেই যে এই ব্যবস্থা কঠোর হলেও এটা লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়। একটা সংখ্যালঘু শ্রেণীই শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্দশা ডেকে

www.pathagar.com

এনেছে, কিন্তু ঐ সংখ্যালঘুর ভেতর নির্দিষ্ট কিছু অভ্যাস তৈরি হয়। অভ্যাসগুলো হল আত্ম-শৃঙ্খলা, সামাজিক সাযুজ্য, নেতৃপদ গ্রহণের যোগ্যতা, এবং কঠোরতার অভ্যাসও গড়েছে, যে অভ্যাস মানুষের প্রয়োজন বিবেচনার মধ্যে আনে নি। ড. কিট এবং তাঁর মতো পণ্ডিতদের অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকেরা আমাদের ইংল্যান্ডকে তো এই বানিয়েছে এবং আমাদের সভ্যতার আশীর্বাদ অশিক্ষিত, অসভ্য ভারত ও আফ্রিকায় সরবরাহ করেছে। এই কৃতিত্বকে আমি খাটো করে দেখতে চাই না, এ কথাও বলা যাবে না যে, এত কম পরিশ্রম করে অন্য কোনো পদ্ধতিতে এই সাফল্য অর্জন সম্ভব ছিল। এই পদ্ধতিতে স্পার্টান কঠোরতা এবং বুদ্ধিগত সংশয়ে সম্পূর্ণ অপারগতার জন্য সৃষ্ট মানুষগুলো যে গুণাগুণ অর্জন করে তার চাহিদা পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের রাজকীয় শ্রেণীর মধ্যে খুব বেশি। যুবা বয়সে তারা যে কঠোর শাসনের মধ্যে ছিল তা পরবর্তী প্রজন্মের ওপর চাপিয়ে দিতে সমর্থ হয়। তারা এই উপলব্ধি এড়িয়ে চলতেও সমর্থ হয় যে তাদের শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি এবং আবেগকে অনাহারে রাখে ইচ্ছাশক্তি সবল করার জন্য। আমেরিকায় অনুরূপ ফলাফল শুদ্ধাচার (Puritanism) অর্জন করেছিল। অবশ্য সেটা ছিল শুদ্ধাচারের সুদিন।

রোমান্টিক আন্দোলন মূলত ছিল আবেগের নামে ইচ্ছাশক্তির ওপর অযথা গুরুত্ব আরোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে রোমান্টিক আন্দোলন কিছুটা সাফল্য লাভ করে, কিন্তু শিক্ষা কর্তারা কর্তৃত্ব খাটানোর নীতিতে ছিলেন অবিচল। অতএব তারা রোমান্টিকদের বিনয়নম্র আচরণ গ্রাহ্য করেন নি। আমাদের এই যুগেই কেবল জীবন সম্পর্কে রোমান্টিকদের দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষাতত্ত্বের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। কিন্তু অর্থনীতিতে যেমন অবাধ বাণিজ্যনীতি পরিকল্পিত অর্থনীতির জন্য পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও অবাধনীতি শেষ কথা নয়। বর্তমান অধ্যায়ে আমি এ নীতির পক্ষে কিছু বলব, অতঃপর নীতিটির সীমাবদ্ধতা বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

শিক্ষায় সর্বাধিক স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি অত্যন্ত প্রবল। প্রথমেই বলতে হয় স্বাধীনতার অবর্তমানে বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে ছোটদের বিরোধ বাধে এবং এর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া খুব গভীর হয়। এই জিনিসটা নিকট অতীতেও অনেকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কোনো শিশুকে কিছু করতে বাধ্য করা হলে সে প্রতিক্রিয়া জানায় ঘৃণা প্রকাশ করে। আর যদি সে স্বাধীনভাবে ঘৃণা প্রকাশ করতে না পারে, তবে সেটা তার নিজের ভেতরে আন্দোলিত হয়; এবং তার প্রতিক্রিয়া অবচেতনে চলে যেতে পারে, ফলে সারাজীবন তাকে অদ্ভুত ফল ভোগ করতে হয়। ঘৃণার বস্তু হিসেবে পিতার স্থান লাভ করে রাষ্ট্র, গির্জা কিংবা বিদেশী কোনো রাষ্ট্র, ফলে মানুষ অবস্থানুসারে নৈরাজ্যবাদী, নাস্তিক কিংবা সমরবাদীতে পরিণত হয়। আবার নির্যাতনকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি ঘৃণা পরবর্তী প্রজন্মের ওপর চাপানোর প্রবণতা কাজ করে। অর্থাৎ নির্যাতিত শিশু সাবালক হবার পর অন্য শিশুদের নির্যাতনের বাসনা পোষণ করতে পারে। কিংবা ফল দাঁড়াতে পারে সার্বিক বিষণ্নতা, এবং প্রীতিকর সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক অসম্ভব হয়ে পড়ে। একদিন আমি স্কুলে মধ্যম আকৃতির একটি ছেলেকে একটি ছোট ছেলের প্রতি অসদাচরণ করতে দেখেছি। আমি প্রতিবাদ করায় সে জবাব দেয়: 'বড়রা আমাকে আঘাত করে, অতএব আমি ছোটদের আঘাত করি। এটাই ন্যায়।' এই একটি বাক্যে সে গোটা মানবেতিহাসের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেছে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষার ক্ষতিকর আরো একটি দিক হল এতে মৌলিক চিন্তাশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে আগ্রহ বিনষ্ট হয়। জ্ঞানতৃষ্ণা ছোটদের ভেতরে স্বাভাবিকভাবে কাজ করে। কিন্তু এই স্বাভাবিক তৃষ্ণা এক সময় বিনষ্ট হয়। কারণ তাদের আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত শিখতে

www.pathagar.com

কিংবা হজম করতে বাধ্য করা হয়। যদি শিশুদের জোর করে খাওয়ানো হয় তা হলে তাদের মধ্যে খাদ্যের প্রতি অভক্তি জন্মে। অনুরূপভাবে তাদের জোর করে শেখাতে গেলে তারা জ্ঞান ব্যাপারটার প্রতিই বিতৃষ্ণ হয়। তারা চিন্তামগ্ন হয়, কিন্তু দৌড়-ঝাঁপ বা চিৎকার করার মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়। তারা চিন্তামগ্ন হয় বড়দের খুশি করার জন্য। অতএব তাদের এতে স্বাভাবিক কৌতূহল কাজ করে না। স্বতঃস্ফূর্ততা হত্যা করা হলে শৈল্পিক ব্যাপারে ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। যে ছেলেকে সাহিত্য, চিত্রশিল্প কিংবা সঙ্গীত সম্পর্কে অতিরিক্ত পাঠ দেওয়া হয়, কিংবা পাঠ দেওয়া হয় আত্মপ্রকাশ নয়, সংশোধনের জন্য সে জীবনের শৈল্পিক দিক সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে আগ্রহ হারাতে শুরু করে। এমনকি একটা সাধারণ পাম্প মেশিন সম্পর্কে তাকে অতিরিক্ত বোঝাতে গেলে তার ঐ পাম্প মেশিন-সম্পর্কিত আদি উৎসাহ আর থাকবে না। যদি কোনো ছেলেকে পড়ার সময় পানি তোলার পাম্প-এর কার্যপ্রণালী বিষয়ে পাঠ দেওয়া হয় তা হলে সে উক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। অথচ বাড়িতে যদি কোনো পাম্প মেশিন থেকে থাকে, এবং আপনি ছেলেকে যদি ঐ পাম্প মেশিন ধরতে নিষেধ করেন, তা হলে সে তার অবসর সময় ব্যয় করবে ঐ পাম্পের কার্যপ্রণালী জানার জন্য। আসলে পড়াশুনা ব্যাপারটা বিদ্যার্থীর ইচ্ছাধীন করে অনেক বিপদ এড়ানো যায়। ইচ্ছাধীন ব্যাপার হলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষক যা শেখান ছাত্ররা তা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তাদের অনুপ্রেরণা নষ্ট হয় না, কারণ তারা স্বেচ্ছায় শেখে, তাদের মনে এমন কোনো ঘৃণাও গেঁথে যায় না যা তাদের সারাজীবন কষ্ট দেবে। বাকস্বাধীনতা, বিনয়ী না-হওয়ার স্বাধীনতা এবং যৌন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি আরো জোরালো। তবে এসব বিষয়ে আমি পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করব।

এইসব কারণেই সংস্কারপন্থী শিক্ষাবিদগণ শিক্ষায় স্বাধীনতার পক্ষপাতী হন। অবশ্য আমি মনে করি বিদ্যালয়ে স্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই একথা ঠিক নয়। এই নীতির সীমাবদ্ধতা অনেক, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একটা সুস্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটা ধরা যাক। শুরুতেই বলব ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সন্তানদের অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। অভিভাবকরা পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যকর বলে যুক্তি দেখান। আসলে এটা অজুহাত; অতি পরিচ্ছন্নতার মূল কারণ স্নবারি। আপনি যদি দু'টি ছেলেকে দেখেন, একজন পরিচ্ছন্ন, অপরজন নোংরা, তা হলে আপনি ধরে নেন যে পরিচ্ছন্ন জনের অভিভাবকের আয় অনেক বেশি। এবং নোংরা জনের অভিভাবক অত্যন্ত দরিদ্র। এ-জন্যই স্নবের দল তাদের সন্তানদের খুবই পরিচ্ছন্ন রাখে। এটা সন্তানের প্রতি ঘৃণ্য অত্যাচার। এতে তাদের সময়ও ব্যয় হয় অনেক, অনেক ভালো কাজ করার সুযোগ তারা পায় না। স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করলে একটি ছেলের উচিত দিনে দু'বার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া। ঘুম থেকে ওঠার পর একবার এবং রাতে শুতে যাবার আগে একবার। মাঝখানের বিরাট সময়টা তারা বৃহত্তর পৃথিবী আবিষ্কার করার জন্য ধুলায়-কাদায় খেলা করবে। কাদায় কাপড় নোংরা হবে, কাদামাখা হাত মুখে লাগবে। এ ধরনের মুক্ত আনন্দ থেকে শিশুদের বঞ্চিত করলে তারা অনুপ্রেরণা ও প্রবর্তনা হারায়, অনুসন্ধানের প্রেরণা থাকে না, পেশীশক্তি ব্যবহারের অভ্যাস গড়তে পারে না। আবার, নোংরা হওয়া মূল্যবান হলেও সকাল ও সন্ধেবেলা পরিচ্ছন্ন হওয়া জরুরি। শিশুরা পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য এতটুকু সময় দিতে রাজিও হবে। অন্যথায় তাদের পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য বাধ্য করতে সামান্য বল

www.pathagar.com

প্রয়োগ করার দরকার হতে পারে। আমরা যদি কোনো প্রকার আচ্ছাদন ব্যবহার না করতাম, উদোম ন্যাংটো থাকতাম এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসী হতাম, তা হলে দেহটা শীতল করার জন্য কিছু সময় জলাশয়ে কাটাতাম এবং তাতেই দেহ পরিচ্ছন্ন থাকত। সন্দেহ নেই, Pithecanthropus erectus এই নিয়মেই চলেছে। কিন্তু আমরা পোশাক পরিধান করি এবং বাস করি পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, অতএব স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে আমাদের যতটা পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার তা আমরা থাকি না। সুতরাং আমাদের পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে পাঠ নেওয়ার দরকার হয়। দাঁত মাজার ব্যাপারেও একই কথা খাটে। আমরা যদি দূর অতীতের পূর্বসূরিদের মতো আহার্য হিসেবে কাঁচা খাবার গ্রহণ করতাম, তা হলে আমাদের দাঁত মাজার দরকার হত না। কিন্তু আমরা যেহেতু রন্ধনশিল্প আবিষ্কার করেছি কৃত্রিম খাবার গ্রহণের জন্য, অতএব আমাদের একটা কৃত্রিম অভ্যাস তৈরি করে নিতে হবে। অর্থাৎ আমাদের দাঁত মাজতেই হবে। শিখতেই হবে টুথ-ব্রাশের সঠিক ব্যবহার। 'প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়ার' নীতিকে যদি স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয় তা হলে আমাদের ব্যাপারটা পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের বর্জন করতে হবে বস্ত্র এবং ফুটানো খাদ্য। কিন্তু আমরা যদি এতদূর যেতে না চাই, প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয় মনে করি তা হলে ছেলেদের কোনো কোনো অভ্যাস তৈরি করার জন্য চাপ দিতেই হবে। যেহেতু ছেলেরা এগুলো নিজের গরজে আয়ত্ত করবে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রথানুগত শিক্ষা যদিও স্বাধীনতা অনেকাংশে খর্ব করে, তবু স্বাস্থ্যের খাতিরে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা কবুল করতে হবে।

সময়নিষ্ঠা বড় কোনো গুণ নয়। তবে এই গুণ ছেলেদের থাকা দরকার। আর স্বাধীন শিক্ষা পদ্ধতির আওতায় তারা এই গুণ অর্জন করবে না। সামাজিক সহযোগিতার জন্য সময়নিষ্ঠা একান্ত জরুরি। আত্মার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক, রহস্যবাদীর অন্তর্দৃষ্টি কিংবা আধ্যাত্মিক নীতিবাগীশের কোনো ব্যাপারের সঙ্গে সময়নিষ্ঠতার অবশ্য কোনো সম্পর্ক নেই। যদি কোনো সাধু পুরুষকে আপনি মাতাল অবস্থায় দেখেন তা হলে আপনি বিস্মিতই হবেন, কিন্তু তিনি যদি কোনো অনুষ্ঠানে দেরি করে উপস্থিত হন তা হলে কিছু মনে করবেন না। অথচ সমাজ জীবনে সময়নিষ্ঠতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মোটরচালক বা পোস্টম্যানের দৈবের অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। তার নিজেকেই গাড়ি চালাতে হবে কিংবা চিঠি বিলি করতে হবে। সময়নিষ্ঠতার অবর্তমানে যেকোনো অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়তে পারে। আবার মুক্ত পরিবেশে সময়নিষ্ঠতা গড়ে তোলা যায় না। যে লোক খেয়ালখুশিমতো চলে তার পক্ষে সময়নিষ্ঠ হওয়া সম্ভব নয়। এবং এই কারণেই হয়তো তারা বড় কিছু করতে পারে না। আমরা সবাই জানি নিউটন সময়মতো আহার্য গ্রহণ করতেন না। তার খাবার পোষা কুকুরের পেটে চলে যেত এবং তিনি তা জানতেও পারতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্বাধিক সফল হতে হলে একাগ্রতা থাকতে হবে, আর যাদের কাজে ততটা দক্ষতা দরকার হয় না তারা যদি সময়নিষ্ঠ না হয় তবে তারা নিজেদের ক্ষতিই করে বসে। অতএব তরুণদের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক জীবন যাপনের স্বার্থেই এই অভ্যাস থাকা দরকার। অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি, কবি, সংগীতকার কিংবা বিশুদ্ধ গণিতবিদ হলে একজনকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়া চলে। কিন্তু মানবতার ৯৩ শতাংশকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া চলে না, তাদের খেয়ালখুশিমতো চলতে দেওয়া যায় না, এক ধরনের শৃঙ্খলা তাদের মেনে নিতেই হবে। ধরা হয় মহৎ বর্বররা খিদে পেলেই শুধু শিকারে বের হতেন, শহরতলির লোকদের মতো সময় করে, ধরুন, ৮টা ৩০ মিনিটে

www.pathagar.com

বের হতেন না। অতএব শহরতলির লোকদের যে শিক্ষার দরকার, মহৎ বর্বরদের তার দরকার হয় নি।

আরো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুরূপ আলোচনা দরকার। বিষয়টি হল সাধুতা; শব্দটিকে আমি হালকাভাবে নিচ্ছি না; এতে আমি বোঝাচ্ছি অপরের সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা। সাধুতা মানুষের স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। বিশৃঙ্খল চরিত্রের লোকেরা বিপদের ভয়মুক্ত হলেই অপরের সম্পদ অপহরণ করে। এমনকি নিয়মনিষ্ঠ লোকেরাও সুযোগ পেলেই চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে। তবে সে এটা শিখেছে যে চুরি করা নিরাপদ মনে হলেও সব সময় নিরাপদ নয়। অনেক আধুনিক মানুষ এ বিষয়ে বিভ্রান্ত চিন্তা করে। ছেচড়া চুরি (kleptomania) সম্পর্কে একবার জানার পর তারা ধরে নেয় সকল প্রকার চুরিই ছেচড়া চুরি। এটা একটা বিরাট ভুল। ছেচড়া চুরি এমন একটা ব্যাপার যেখানে চোর বিনা প্রয়োজনেও কোনো কিছু চুরি করে বসে। এমন পরিস্থিতিতেও চুরি করে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ। অর্থাৎ, ধরা পড়তে পারে জেনেও চুরি করে। ব্যাপারটার গভীর মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। ছেচড়া চোর নিশ্চেতনভাবে শৌখিন সামগ্রী চুরি করে, কিংবা এমন সামগ্রী চুরি করে যার যৌন-তাৎপর্য রয়েছে। শাস্তির ব্যবস্থা রেখে ছেচড়া চুরি দূর করা যাবে না। মনস্তাত্ত্বিক বোঝাবুঝির ভেতর হয়তো কিছু একটা করা যায়। সাধারণ চুরি কিন্তু অযৌক্তিক কোনো ঘটনা নয়। এবং যেহেতু যৌক্তিক তাই চৌর্যবৃত্তি সামাজিক জরিমানার ব্যবস্থা রেখে প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে। পিতামাতার খবরদারিমুক্ত একদল ছেলের মধ্যে যদি কেউ চুরি করে তবে সে অন্যান্যের হাতে প্রচণ্ড মার খাবে। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা এই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে যে এ ব্যাপারে শাস্তির কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এতে আত্মপ্রবঞ্চনাই করা হবে। কোনো সন্দেহই নেই যে, ছেলেরা যদি ফৌজদারি আইন তৈরি করে তবে তা হবে বড়দের প্রণীত আইনের চেয়ে কঠোর। সুতরাং চোরের স্বার্থে চৌর্যবৃত্তির ঘটনা বড়দের মোকাবেলা করতে হবে এবং এমনভাবে করতে হবে যাতে ছেলেরা যেন উক্ত চোরের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে না পারে। অপরের সম্পদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা সৃষ্টি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (Conditioned reflex) ব্যতিরকে সম্ভব নয়। যার পক্ষে চুরি করা সম্ভব সে চুরি করতে প্রলুব্ধ হবেই, এবং চুরি করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়বে।

আমি মনে করি স্বাধীনতার প্রবক্তাগণ আরো একটা বিষয়ে ভুল করেন। তারা তরুণদের জীবনে রুটিন বেঁধে চলার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। তবে ঐ রুটিন অপরিবর্তনীয়, অনড় এবং শর্তহীন হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। খ্রিস্টমাস দিবস এবং ছুটির দিনগুলোতে নিশ্চয় রুটিন মেনে চলার দরকার হবে না। মোটের ওপর রুটিনের পরিবর্তন শিশুকেই প্রত্যাশা করতে হবে। অনিশ্চিত জীবন সব সময়ই অত্যন্ত পরিশ্রান্তিকর, বিশেষত কম বয়সীদের জন্য। দিনের পর দিন কী ঘটছে তা কমবেশি জানতে পেরে শিশুরা নিরাপত্তা বোধ করে। শিশু চায় তার জগৎ নিরাপদ হোক, আইনের শাসন চালু থাক। অভিযানপ্রিয়তা এবং দুঃসাহস অত্যন্ত ভালো গুণ, কিন্তু এই গুণগুলো অর্জনের জন্য একজনকে নিরাপত্তার ভেতর বাস করতে হবে।

রুটিনের পক্ষে আরো একটা কথা বলা যায়। শিশুরা নিজের কাজ নিজেরাই সব সময় নির্বাচন করবে এটা তাদের কাছে ক্লান্তিকর, এমনকি অস্বস্তিকর লাগে। তারা সব সময়ই উদ্যোগী হয়ে কাজ করবে এটা তাদের মোটেই কাম্য নয়। তারা বন্ধুভাবাপন্ন বয়স্কদের তৈরি করা একটা কাঠামোর মধ্যেই কেবল নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। বড়দের মতো শিশুরাও দুরূহ কোনো কার্য সমাধা করে কৃতিত্বের আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু এই কৃতিত্ব

www.pathagar.com

অর্জনের জন্য দরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা। কম শিশুই সহায়তা ও উৎসাহ ছাড়া এটা করতে পারে। নিজেকে সব সময় সঠিকভাবে পরিচালনা করার সামর্থ্য অত্যন্ত মূল্যবান গুণ। তরুণেরা এই গুণ সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়, অনড় শৃঙ্খলা আরোপ করে কিংবা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে এই গুণ অর্জন করা যায় না। যুদ্ধের সময় সৈন্যরা যে ধরনের শৃঙ্খলা মেনে চলে সে ধরনের অনড় শৃঙ্খলা যে কোনো ব্যক্তিকে অসমর্থ করে তোলে। বস্তুত সে বাইরের প্রেরণা ও নির্দেশ ছাড়া কোনো কাজে সমর্থ হয় না। পক্ষান্তরে শৈশবে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলে শিশুর পক্ষে মৌহূর্তিক আবেগ উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। কোনো একটা বিষয়ে পূর্ণ মনঃসংযোগে সে সমর্থ হয় না, কিংবা নির্মল আনন্দে মত্ত হয়ে অবসন্ন হয় এবং আর কোনো কাজ করতে পারে না। ইচ্ছাশক্তিকে সবল করার জন্য দরকার নির্দিষ্ট অনুপাতে স্বাধীনতা এবং শৃঙ্খলা, কোনো একটা মাত্রায় বেশি হলে অনিষ্ট অনিবার্য।

শৃঙ্খলার বাঞ্ছনীয় মাত্রা হল শিশুকে প্রশিক্ষিত করার জন্য তার ইচ্ছার সহযোগিতা লাভ করতে হবে। অবশ্য তার সকল আবেগই বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যে শিশু সব সময় বন্ধুভাবাপন্ন বয়স্কদের মধ্যে বাস করে সে বরং নিজেকে বোকা ভাবে, আর তাদের উপদেশ-নির্দেশ পেলে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞবোধ করে। তবে যিনি উপদেশ দেবেন শিশুর কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে হবে। তাছাড়া শিশুর বিশ্বাস থাকতে হবে উপদেশদাতা তার কল্যাণ চান। অর্থাৎ উপদেশদাতা নিজের সুবিধার জন্য কিংবা ক্ষমতা খাটানোর জন্য উপদেশ দেবেন না। ক্রীড়াবিদগণ নিয়ম অনুসারেই শৃঙ্খলা মেনে চলেন এবং যে তরুণ বুদ্ধিজীবী হিসেবে যশ কুড়াতে চায় তার সফল হওয়ার বাসনা ঐ ক্রীড়াবিদের মতোই তীব্র, ফলে সে প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য সব সময়ই প্রস্তুত থাকে। তবে এমন একটা আবহের বিষয়ে ভাবা যাক, যেখানে শৃঙ্খলা মাত্রই অকল্যাণকর গণ্য করা হয়, সেখানে তরুণদের মনে হতে পারে না যে সাফল্য অর্জনের জন্য নিজ থেকে এ ধরনের শৃঙ্খলা মেনে চলার দরকার আছে। তরুণদের সম্মুখে দুরূহ সফল আদর্শ তুলে ধরতে হবে, নতুবা তারা উচ্ছৃঙ্খল ও অযোগ্য হয়ে পড়বে। তবে যেখানে স্বাধীনতা অবাধ ও সার্বভৌম সেখানে কারো মনে এ বিষয়টা জাগবে না।

সৎ প্ররোচনা বর্জন করে কর্তৃত্ব ব্যবহার করতে গেলে তা অকেজো হয়ে পড়বে যদি সঠিক লোকের নিয়ন্ত্রণে শিশুকে ন্যস্ত করা না হয়। উদাহরণত দয়ার ব্যাপারটা ধরা যেতে পারে। আজ্ঞা বা শাস্তি দয়ামায়া সৃষ্টি করতে পারে না, তবে নিশ্চয় অতি নির্দয়তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারে। দয়া-মায়ার স্বভাব গঠনের জন্য দরকার সহজাত সুখ, আর দরকার বয়স্কদের দিক থেকে দয়ালু আচরণ। আমি মনে করি নেহাৎ নৈতিক বিধান হিসেবে দয়া-মায়া শেখাতে গেলে কোনো কাজ হবে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল যে ধরনের শৃঙ্খলা চালু থাক না কেন এর সঙ্গে ন্যূনতম আবেগগত নিয়ন্ত্রণ যুক্ত করা যেতে পারে, তবে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে চলবে না। কারণ শিশু যদি মনে করে তার কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তা হলে তার চরিত্রে অবাঞ্ছিত উপাদান ঢুকে যাবে। আর ঐ উপাদানের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করবে শিশুর চরিত্রের দৃঢ়তার ওপর। শিশু যদি দৃঢ়চিত্ত হয় তবে সে ঘ্যানঘেনে স্বভাবের ভান করবে। অতএব শৃঙ্খলা ছাড়া যেমন চলবে না, তেমনি মার্জিত, রুচিশীল যোগ্য মানুষ গড়ার স্বার্থে শৃঙ্খলা যতটা সম্ভব কাটছাঁট করতে হবে।

গোটা প্রশ্নের মূল হল শিক্ষাদান। আমি কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি যে, প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান সম্ভব, আরো সম্ভব উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি তৈরি এবং

www.pathagar.com

পাঠ্যক্রমে কোনো বাধ্যবাধকতা না রেখেই তা সম্ভব। তবে এটা করতে হলে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে। বয়স্কদের জ্ঞানানুসন্ধান এবং বুদ্ধিবৃত্তি চর্চায় আন্তরিক আগ্রহ থাকতে হবে। শিক্ষকদের হতে হবে সহানুভূতিশীল, তাদের চলতে হবে বুদ্ধি খাটিয়ে, তাছাড়া থাকতে হবে দক্ষতা। আর দরকার এমন পরিবেশ যেখানে কোনো শিশু যদি ক্লাস রুমে হট্টগোল করে তবে তাকে ডেকে বাইরে এনে বলা চলবে, যাও, কোথাও গিয়ে খেলা করো। সাধারণ স্কুলগুলোর এই শর্তগুলো পূরণ করতে দীর্ঘ সময় লাগবে, কাজেই বর্তমান অবস্থায় ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অনেকে বলেন শিশুকে মুক্ত থাকতে দিলে সে নিজেই পড়তে ও লিখতে শিখবে, কারণ সে নিশ্চয় তার প্রতিবেশীর চেয়ে হীন হতে চাইবে না। তাছাড়া বাধ্যবাধকতা না থাকলে জ্ঞান অর্জনে খুব বেশি হলে এক বছর কি দুবছর বিলম্ব হয়। আমার তো মনে হয়, যেখানে এই জগতের সবাই লিখতে ও পড়তে শিখছে সেখানে প্রতিটি ছেলে হীনমন্যতাবোধ এড়াতে চাইবে। উপরন্তু হীনমন্যতাবোধ জন্মে অজ্ঞানতা থেকে। কিন্তু যেখানে সবাই বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে চলে সেখানে কেউ হীনমন্যতাবোধে ভুগবে না; আর প্রতিটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হবে অধিকতর অজ্ঞ। খুব কম ছেলেরই নামতা শেখার আন্তরিক আগ্রহ রয়েছে। প্রতিবেশীরা যদি নামতা শিখতে বাধ্য হয় তা হলে লজ্জায় পড়ে তারা হয়তো মনে করবে তাদেরও শেখা উচিত। কিন্তু যদি এমন হয় যে কেউ নামতা শিখতে বাধ্য নয়, তা হলে দেখা যাবে গুটিকয়েক পণ্ডিতই শুধু জানেন ছয় বার নয়–এ কত হয়।

বাস্তব জ্ঞান অর্জন অধিকাংশ শিশুর কাছে আনন্দদায়ক ব্যাপার। যদি তারা কোনো খামার বাড়িতে বাস করে তবে তারা খামারের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করবে, এবং খামারের কাজ পুরো শিখে যাবে। কিন্তু বিমূর্ত জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ খুব কম লোকেরই থাকে, অথচ বিমূর্ত জ্ঞান সভ্য সমাজ গঠন সম্ভব করে তোলে। সুতরাং সভ্য সমাজ সংরক্ষণের জন্য কিছু কিছু শিষ্টাচার শিখে নিতে হবে যা স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে থাকে না। হয়তো বাধ্যবাধকতার বদলে মিষ্টকথা ব্যবহার বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, তবে ব্যাপারটা পুরোপুরি প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। শিক্ষা শুধু স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করবে এই ধারণাও গ্রহণ করা যায় না। অন্তত যিনি আধুনিক সমাজের জটিলতা উপলব্ধি করতে পারেন তার পক্ষে এই ধারণা গ্রহণ করা একান্তই অসম্ভব। অবশ্য বলা সম্ভব যে জীবনে জটিলতা রাখা ঠিক হয় নি, অতীতের সরল জীবনে ফিরে যাওয়া উচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অতীতে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়ার ভেতর জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ অনাহারে মারা যাবে। এই বিকল্প এতটা আতঙ্কজনক যে আমরা বাস্তবে আধুনিক শিল্প জগতের গোটা জটিল পদ্ধতির কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে পড়েছি। আর এজন্যই আমাদের সন্তানদের এই জগতের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার নঞর্থক তত্ত্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকলেও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের কথা ভেবে এটি পুরো গ্রহণ করা যাবে না। আর এই সমস্যাগুলোর জন্য অধিকতর সদর্থক তত্ত্বের দরকার হবে।

www.pathagar.com

শিক্ষা ও বংশগতি

একটি পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষ বা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য জন্মের পর থেকেই প্রতিবেশ ও তার জীবসত্তার মিথস্ক্রিয়ার ভেতর গঠিত হয়। আমি এই ঘোষণাকে যতদূর সম্ভব সাদামাটা ও বিতর্কহীন রাখতে চেষ্টা করেছি। কারণ কোনো বিষয় খুব বেশি নিশ্চিত হলে তা অধিকতর বিতর্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মানব চরিত্র গঠনে বংশগতি এবং প্রতিবেশের অবদানের অনুপাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত বিভিন্ন। প্রজননশাস্ত্রবিদদের স্বাভাবিক ঝোঁক হল বংশগতির ওপর জোর দেওয়া, মনোবিজ্ঞানীরা প্রতিবেশের ওপর জোর দেন। যাহোক, এই প্রশ্নের কিন্তু আরো একটা দিক রয়েছে। সেটি বৈজ্ঞানিক নয়, রাজনৈতিক। রক্ষণশীল এবং সাম্রাজ্যবাদীরা বংশগতির ওপর জোর দেন, কারণ তারা শ্বেতজাতি। চরমপন্থীরা জোর দেন শিক্ষার ওপর, কারণ এতে বর্ণবিভেদ উপেক্ষা করার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দিকটা একযোগে প্রজননশাস্ত্রবিদ ও মনোবিজ্ঞানীদের উপেক্ষা করে। হজবেন প্রজননশাস্ত্রবিদ হয়েও সুপ্রজননবিদ্যার পক্ষে বলার মতো কিছু খুঁজে পান নি। পক্ষান্তরে গডার্ড এবং টারম্যানের মতো সরকারি মনোবিজ্ঞানীরা বংশগতির ওপর অত্যন্ত জোর দেন। এই মতবাদীদলের মার্কিনি সদস্যরা সব সময়ই নীরবে নর্ডিকদের শ্রেষ্ঠতা মেনে নয়। আবার এদের মধ্যেকার চূড়ান্ত রক্ষণশীলরাও মনে করেন উত্তর ক্যারোলাইনা এবং কেন্টাকির পার্বত্য মানুষেরা, যারা ইংরেজ ও স্কটিশদের বিশুদ্ধ উত্তরসূরি, অভিবাসিত ইহুদিদের চেয়ে কম বুদ্ধিসম্পন্ন।

বিতর্কটা যেহেতু গভীর এবং সুবিস্তৃত অতএব আমরা নিঃসংশয় কয়েকটা বিষয় ধরে অগ্রসর হব। শিক্ষায় দৃঢ় বিশ্বাসীরাও অস্বীকার করেন না যে শিশুরা মানব সন্তান, অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে তাদের অধিকতর শিক্ষিত করা যায়। তারা এটাও অস্বীকার করেন না যে, শ্বেতজাতির সন্তানেরা শ্বেতকায় হয়ে থাকে, কৃষ্ণকায়দের গর্ভে কৃষ্ণকায় সন্তানই জন্মলাভ করে। বংশগতির ধ্বজাধারীরা অস্বীকার করেন না যে, প্রতিশ্রুতিশীল একটি শিশুকে encephalitis lethargica ধ্বংস করতে দিতে পারে, আরো অস্বীকার করেন না যে কাউকে শৈশবে অহিফেন সেবন করতে দিলে তার বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হবে। অথচ অনেক অজ্ঞ, মূর্খ মাতা তাই করে থাকেন। এই মতগুলোর ব্যাপারে আমরা অভিন্ন মত পোষণ করছি, তবে খুব বেশি দূর অগ্রসর হচ্ছি না।

এই প্রশ্নটা যখন বৈজ্ঞানিকভাবে বিবেচনা করা হয় তখন একটা অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ পিতামাতার মাধ্যমেই বংশগত উপাদান সঞ্চারিত হয়, আর এই পিতামাতাও তো পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের আচরণের অনুরূপতার জন্য দু'টি কারণ সমানভাবে

www.pathagar.com

দায়ী। একটি কারণ হল অনুকরণ। সন্তানেরা পিতামাতার অনুকরণ করে থাকে। দ্বিতীয় কারণটি হল বংশগতি। এই কারণে এতিমখানার শিশুরা মূল্যবান উপাদান। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের পিতামাতার সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা যথেষ্ট নয়। যমজ সন্তান পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত উপাদান অত্যন্ত প্রবল[১], কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যমজ সন্তানেরা তো অভিন্ন পরিবেশে বাস করে। আমরা আশা করব যে ভবিষ্যতে কোনো কোটিপতি বিজ্ঞানী একটা সংস্থা গঠন করবেন যেখানে যমজ সন্তান জন্মের পর-পরই একে অপরের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, এবং তাদের লালন-পালন করা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে। আমি মনে করি না যে কোনো সম্রাজ্ঞী যদি যমজ সন্তানের জন্ম দেন এবং ঐ যমজ সন্তানের একজনকে যদি রাজপ্রাসাদে ও অপর জনকে দরিদ্রের পর্ণ কুটিরে বড় হওয়ার সুযোগ ঘটে তবে তাদের মানসিকতা অভিন্ন হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে যেহেতু পর্যাপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় নি অতএব আমি দাবি করছি না যে আমার অভিমত যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত। এক সময় বিশ্বাস করা হত, একজনের শিরায় রাজরক্ত থাকলে তার আচার-আচরণে প্রিন্সলি ভাবটা প্রকাশ পাবেই। হেরোডটাস লিখেছেন যে, সাইরাস জন্মের পর বারো বছর বয়স পর্যন্ত দরিদ্র কৃষক পরিবারে লালিত-পালিত হন, এবং তার রাজোচিত আচরণের জন্যই তাকে তার পিতামহ শনাক্ত করতে পারেন। অবশ্য নর্ডিক শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসী একজন ব্যক্তিও এই গল্প বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না।

বংশগতির ক্ষমতা যেমন বাড়িয়ে দেখা হয়েছে, তেমনি বাড়িয়ে দেখা হয়েছে শিক্ষার ক্ষমতা। ড. জন বি. ওয়াটসন আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেন যে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে যে-কোনো ছেলেকে ইচ্ছেমতো একজন মোৎসার্ট কিংবা একজন নিউটনে পরিণত করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আমাদের বলেন নি বা বলতে পারেন নি যে, এই শিক্ষাটা কোন ধরনের হবে। শিক্ষা সর্বশক্তিমান, এই তত্ত্বের তিনি অবশ্য উদ্ভাবক নন। উদাহরণত আমরা Political Justice গ্রন্থের প্রণেতা এবং কবি শেলির শ্বশুর গডউইনের কথা ভাবতে পারি। এ বিষয়ে তাঁর ঘোষণা চূড়ান্ত: 'এটা অসম্ভব নয় যে, যদি দেখা যায় একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মাথার খুলির সমর্থতা অনেক বেশি, অন্তত একজন বোকা লোকের চেয়ে অনেক বেশি, তা হলে নিরন্তর বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা করে মাথার খুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এখানে মনে রাখতে হবে শিশুর মাথার খুলি অত্যন্ত নমনীয়, এবং অসাধারণ মেধাবী লোক কীভাবে কম বয়সেই ভবিষ্যৎ বৈশিষ্ট্যের অনেকটা অর্জন করে।' 'ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তফাত হয় এ জন্য যে তাদের মতামত ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে গঠিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে একই নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করলে দু'জন ছেলে বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হবে।' ড. ওয়াটসনও এর থেকে ভিন্ন কিছু বলেন নি।

শিক্ষা সর্বশক্তিমান, এই অভিমতের বিপক্ষে অনেক যুক্তি রয়েছে। গডউইন যে মনে করেন চিন্তার অভ্যাস মাথার খুলির আকার প্রসারিত করবে, তা কোনো আধুনিক মানুষ মানতে চাইবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মস্তিষ্কের আকৃতির সম্পর্ক রয়েছে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। জড়বুদ্ধির জন্য অনেক সময় দায়ী জন্মগতভাবে মস্তিষ্কের বিকৃত গঠন। ড. ওয়াটসনও নিশ্চয় মনে করেন না যে জড়বুদ্ধির জন্য দায়ী অনুপযুক্ত শিক্ষা। অপর দিকে গণনায় পারঙ্গম[২] শিশুদের কথা ধরা যেতে পারে; আমরা ভাবতেই পারি না যে শুধু পরিবেশের কারণে কয়েকজন সহোদর বালক প্রশিক্ষণ ছাড়াই বিরাট সংখ্যার ঘনমূল মাথায়

১. দেখুন, Lange, Crime as Destiny. মিসেস জে.বি.এস হ্যালডেন কর্তৃক অনূদিত।

২. তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য হলিংওয়ার্থের Gifted Children বইটির ২১০ থেকে ২১৬ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

www.pathagar.com

রাখতে পারবে যা গড় মেধার বালকদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে একটি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বালক এবং একটি বিচক্ষণ বালক জন্মগত কারণে সাধারণ বালকদের থেকে আলাদা, তবু এটা অসম্ভাব্য বলেই মনে হয় যে জন্মগত কারণে ব্যতিক্রম মেধার আর কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবৈজ্ঞানিক কোনো কিছু কবুল করা বিপজ্জনক বটে, তবু আমি মনে করি বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের একটু মূল্য দেওয়া উচিত। এই শিক্ষকরা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন যে, সব ছাত্র মেধার দিক থেকে সমান নয়। তাদের মধ্যে সহজাত সমর্থতায় তফাৎ রয়েছে। এবং সত্যিই নির্ণয় করা কঠিন তফাৎটার জন্য কতটা বংশগতি দায়ী, কতটা প্রতিবেশ। এই কাজটি অসম্ভব না হলেও দুরূহ। তবে আমি এটুকু নিশ্চিত যে বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যে মেধার প্রভেদ তার জন্য অনেকটা দায়ী জন্মসূত্রে লব্ধ বৈশিষ্ট্য।

যাহোক, গডউইন এবং ড. জন বাটলার ওয়াটসনের হাতে একটা যুক্তি রয়েছে যা দিয়ে তারা তাদের তত্ত্ব প্রমাণ করতে চান। যুক্তিটা হল মানুষের কোনো সহজাত প্রবৃত্তি নেই। অতএব শিশুর মনের অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য নেই। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের যুক্তি ব্যবহার করে ড. ওয়াটসনকে জবাব দেওয়া যায়; পাভলভ দাবি করেন যে তাঁর কুকুরেরা হেপ্লোক্রোটিস কথিত চার রকমের মেজাজ প্রদর্শন করে এবং বিভিন্ন রকমের স্নায়বিক বৈকল্যে ভোগে। জবাবে ড. ওয়াটসন হয়তো বলবেন, মেজাজের এই ভিন্নতা এমন সব কারণে ঘটে, যা পাভলভ জানেন না এবং সকল কুকুর অভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং আমাদের তাঁর তাত্ত্বিক যুক্তিগুলো অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে।

যুক্তির খাতিরে স্বীকার করা যাক সকল নবজাতকের জন্য শর্তহীন সাড়া (যা প্রবৃত্তির স্থান দখল করেছে) অভিন্ন। তাতে কি প্রমাণিত হয় যে জন্মগতভাবে বিভিন্ন মানসিক শক্তি কিংবা মানসিকতা নিয়ে শিশুর জন্ম হয় না? শর্তসাপেক্ষ সাড়া থেকে আমরা কী বুঝি? কেউ কেউ খুবই দ্রুত শেখে, কেউ কেউ বাহ্যিক উদ্দীপক বস্তু দ্রুত ও যথার্থ শনাক্ত করতে পারে, বিভিন্ন উদ্দীপকের মধ্যে পার্থক্য অতি তুচ্ছ হলেও। আমরা যদি স্বীকার করেও নিই যে শিক্ষা বস্তুত শর্তসাপেক্ষ সাড়া (এটি মোটেই বিতর্কহীন নয়), তবু এটা মেনে নেওয়া যায় না যে সব শিশুকেই সমান শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব। বংশগতির বিপক্ষে শিক্ষার কট্টর প্রবক্তাদের তত্ত্বের ভিত্তি খুব মজবুত নয়। হতে পারে, তাদের পর্যবেক্ষণ অনেকটা মজবুত।

কিন্তু যদিও মানুষে মানুষে জন্মগত প্রভেদের গুরুত্ব অস্বীকার যাবে না, তবে সুপ্রজননবিদদের ব্যবহারিক অনুমান একেবারে অবৈজ্ঞানিক। কেউ জানেন না সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয় গুণাবলী সৃষ্টিকারী কোন কোন উপাদান কৌলিক, কিংবা উক্ত উপাদানের কোনগুলো প্রবল ও প্রচ্ছন্ন। সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয় গুণাবলী কোনগুলো সে সম্পর্কে সাধারণ ঐকমত্য নেই। সীমিত পর্যবেক্ষণ থেকে আমি ভাবতে পারি যে, চিত্রশিল্পের চমৎকারিত্ব এবং পাটিগণিতে অদক্ষতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। এই যদি অবস্থা হয় তা হলে সুপ্রজননবিদদের এ সম্পর্কে কী করা উচিত? সে কি একদল চিত্রকর তৈরি করবে, যারা পাটিগণিত বোঝে না? কিংবা তৈরি করবে একদল হিসাবরক্ষণবিদ, যারা চিত্র শিল্প সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। স্বীকৃত মেধা পরীক্ষা স্বীয় ক্ষেত্রে নিশ্চয় মূল্যবান, কিন্তু মেধা পরীক্ষা দ্বারা নৈতিক কিংবা শৈল্পিক গুণাবলী বিচার করা সম্ভব হয় না। কোনো প্রকার ব্যবহারিক সুপ্রজননবিদ্যাগত জরিপের জন্য নৈতিক কিংবা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যথেষ্ট নয়। সম্ভবত কেবল দুর্বলচিত্তদের দোষমুক্ত করার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো অযাচিত :

কৃষ্ণাঙ্গরা জন্মগতভাবেই শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে হীন; ইউরোপ কিংবা আমেরিকার চেয়ে এশিয়ার লোকেরা হীন; ৪৫ ডিগ্রি অক্ষাংশের উত্তরে যাদের জন্ম তারা জন্মগতভাবেই

www.pathagar.com

অক্ষাংশের দক্ষিণের লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর; যার পিতার আয় ১০০০ পাউন্ডের উপরে সে ১০০০ পাউন্ডের নিচের আয়ের পিতার ছেলের চেয়ে উন্নত।

উপর্যুক্ত প্রস্তাবগুলো অধিকাংশ সুপ্রজননবিদ্যাবিশারদ বিশ্বাস করেন, এর প্রথম তিনটি প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইন প্রভাবিত করে।

সমর্থতা বা দক্ষতার বিষয়টা যদি বিবেচনা করতে হয় বৈজ্ঞানিকভাবে, তা হলে বিস্তর প্রাথমিক কাজ আগে সম্পন্ন করতে হবে। প্রথমেই শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল নয় এমন জরিপযোগ্য মানসিক গুণাবলী আবিষ্কার করার দরকার করবে। মেধা পরীক্ষার কাজ এটাই, কিন্তু তারা এ কাজটি খুব বেশি হলে বৈচিত্র্যহীন সমাজে করে থাকে। টাকা-পয়সা নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে, সে প্রশ্নগুলোর উত্তর গ্রামের ছেলেদের চেয়ে শহরের ছেলেরা দ্রুত দিতে পারবে। কবিতায় অন্ত্যমিলের প্রশ্নের জবাব কবিতার ছাত্ররা অন্য ছাত্রদের চেয়ে ভালো জানে। বিভিন্ন পটভূমি থেকে আসা ছেলেদের তুলনা করার জন্য মেধা পরীক্ষা প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে তা বিপথগামী হয়ে পড়ে; আবার অনুরূপ প্রয়োগ দ্বারাই বংশগতিতে বিশ্বাসী অনেকে সুফল লাভ করেন। মানসিক অনুরূপতা থাকা সত্ত্বেও শিশুরা যতদিন পিতামাতার কাছে থাকে ততদিন কৌলিক ও শিক্ষাগত উপাদান পৃথক করা সম্ভব নয়। যদি গোটা জনগোষ্ঠীর মেধা পরীক্ষা করা যায় তা হলে এক সময় এতিমখানা থেকে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। যদি দেখা যায় একটি এতিমখানার ছেলেদের সঙ্গে তাদের পিতামাতার মেধার পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, তা হলে সেটা হবে বংশগতির পক্ষে বিরাট সাক্ষী। তবে এ পর্যন্ত অনুরূপ অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয়নি।

মানসিক বংশগতির বিধান খুঁজতে হলে দেখতে হবে নির্বাচন যেন প্রাঞ্জল, সুনিশ্চিত এবং পরিমাপযোগ্য হয়। একজন হয়তো একটা চূড়ান্ত অর্থহীন বাক্য উচ্চারণ করে ছেলেদের পুনরাবৃত্তি করার জন্য আদেশ দিতে পারেন। দীর্ঘ একটি বাক্যের কতগুলো শব্দ ছেলেরা শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারে তা মনের গুণ পরিমাপক, যদিও এটা খুব বাঞ্ছনীয় গুণ নয়। আপনারা সবাই জানেন, মেকলের এই গুণটি ছিল সর্বোচ্চ স্তরের, প্রায় অবিশ্বাস্য সে স্তর; তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর পিতা কিংবা মাতার এই গুণটি ছিল কি-না তা আমরা জানতে পারি নি। স্কুলের প্রতিটি ছেলেকে যদি প্রতি বছর তাদের জন্মদিনে অনুরূপ পরীক্ষা করা যায় তা হলে আমরা হয়তো চল্লিশ বছরের মধ্যে মানসিক বংশগতি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য লাভ করতে পারি।

তবে এধরনের পরিসংখ্যান পদ্ধতি মেন্ডেলপন্থীদের সন্তুষ্ট করতে পারবে না। মেন্ডেলপন্থীরা চান বংশগতির নির্দিষ্ট একটি জিন বা একদল জিনকে বিচ্ছিন্ন করতে। মানসিক উপাদান এতটা জটিল যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা এ কাজটি করতে পারব বলে মনে হয় না। তবে এটা সম্ভব যে মনের কোনো কোনো উপাদান বিচ্ছিন্ন করা সহজতর হবে। গাণিতিক এবং সাংগীতিক দক্ষতা এক্ষেত্রে খুবই উপযুক্ত বলে মনে হয়। এই উভয় ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত তথ্য বিরল বটে, তবে যেখানে আছে সেখানে গড় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি আছে। উভয় ক্ষেত্র পারিবারিক বলে মনে হয় তবে কতটা শিক্ষার জন্য তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। উদাহরণত, মোৎসার্টের পিতা ছিলেন সংগীতজ্ঞ, কিন্তু তাঁর পিতা তাঁকে সংগীত সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে-সঙ্গে সাংগীতিক দক্ষতাও দিয়ে যান। আমি যতদূর জানি, সংগীত কিংবা গণিতের বড় কোনো প্রতিভা এতিমখানা থেকে আসে নি, ফলে বংশগতি পরীক্ষার এই পদ্ধতি আমাদের কোনো কাজে আসে না।

গ্যালটন ও তাঁর অনুসারিগণ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে দক্ষতা বংশধারা থেকে আসে, কিন্তু এই ধারণা কোনোমতেই বৈজ্ঞানিক নয়, অবশ্য তাদের তত্ত্বে সত্যের ভাগ

www.pathagar.com

কিছুটা থাকতে পারে। পিতামাতার প্রভাবমুক্ত হওয়ার উপায় উদ্ভাবন না হওয়া পর্যন্ত, গোটা বিষয়টা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যাবে না।

ব্যবহারিক শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টার অর্থ অত্যন্ত প্রাঞ্জল। প্রত্যাশা করতে হবে যে, ছাত্রদের মধ্যে কিছু সামর্থ্যের তফাৎ থাকবেই, যার কারণ প্রতিবেশের প্রভাব নয়। যদি কোনো প্রতিভা আবিষ্কৃত হয় তা হলে সে প্রতিভাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কোনো ছাত্র বা ছাত্রগোষ্ঠীর জাত, সামাজিক অবস্থান কিংবা তাদের পিতামাতার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব দিয়ে ঐ ছাত্র বা ছাত্রগোষ্ঠীর মেধার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কোনো ধারণা গঠন উচিত হবে না। বংশানুক্রমিক দক্ষতার ব্যাপারে তদন্ত করে দেখতে পারি, সে সুযোগ আমাদের রয়েছে, এ বিষয়টা বৈজ্ঞানিকভাবে চর্চার পদ্ধতি উদ্ভাবনও কঠিন নয়; তবে উক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবনের পর অন্তত এক প্রজন্ম অপেক্ষা করতে হবে সুফল পাওয়ার জন্য। ইত্যবসরে আমাদের একমাত্র বৈজ্ঞানিক অবস্থান হবে এটা স্বীকার করা যে, স্বকীয় দক্ষতা এবং বংশগতির ধারায় তা লাভ করার বিধান সম্পর্কে আমরা এ পর্যন্ত কিছুই জানতে পারি নি।

www.pathagar.com

আবেগ ও শৃঙ্খলা

সব কালেই শিক্ষার দ্বৈত লক্ষ্য ছিল : সদাচরণ সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান এবং প্রশিক্ষিত করা। একটি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির জন্য সদাচরণ সম্পর্কিত ধারণার হেরফের হয়। মধ্যযুগে, যখন ধাপবিশিষ্ট সংগঠন ছিল (ক্রীতদাস পর্যায় থেকে শুরু করে ঈশ্বর পর্যন্ত) তখন আনুগত্যকে প্রধান গুণ গণ্য করা হয়েছে। বাচ্চাদের বলা হত পিতামাতাকে মান্য করার জন্য, সমাজের বড়দের শ্রদ্ধা করার জন্য, পুরোহিতদের উপস্থিতিতে ভীতি বোধ করার জন্য, আর জমিদারের সমানে তো নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিতে হবে। মুক্ত-স্বাধীন একমাত্র সম্রাট ও পোপ। আর যেহেতু ঐ সময়ের নৈতিকতা মুক্ত মানুষদের প্রতি কোনো দাবি রাখত না, অতএব তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে সময় কাটিয়েছে। আধুনিক মানুষ ত্রয়োদশ শতকের মানুষ থেকে লক্ষ্য এবং উপায় এই উভয় ক্ষেত্রেই আলাদা। গণতন্ত্র আনুগত্যের স্থানে বসিয়েছে সহযোগিতা, যূথবদ্ধতাকে বসিয়েছে শ্রদ্ধার আসনে। যে গোষ্ঠীর জন্য যূথবদ্ধতা কাজ করবে তা পরিণত হয়েছে জাতিতে, এই জাতি সেকালে গির্জার সর্বজনীনতার জন্য গুরুত্ব হারিয়েছিল। ইতোমধ্যে প্রচার নীতি প্রতাপশালী না হয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাজের নীতি গ্রহণ করেছে, তাছাড়া যুবকদের মধ্যে সঠিক আবেগ সৃষ্টির জন্য কাজ করছে। বরং এটিকে প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে ধরেছে। ছেলেদের ওপর প্রভাব থাকার দরুন গির্জাসঙ্গীত, স্কুলগীতিকা এবং পতাকা কড়া আবেগাপ্লুত মানুষদের পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করে। এই সব প্রভাবের বিরুদ্ধে যুক্তি কোনো প্রকার ক্ষমতা খাটাতে পারে না।

রাজনৈতিক ধারণা প্রাথমিক শিক্ষার ওপর কী প্রভাব রাখে তা খুব স্পষ্ট নয়, এবং এ ব্যাপারে অনেক শিক্ষার্থী সচেতন থাকেন না। অতএব বর্তমান পর্যায়ে আচরণ সম্পর্কিত শিক্ষা বিষয়ে বিবেচনা করব সমাজকাঠামো থেকে দূরত্ব বজায় রেখে। শিশু কিংবা প্রাণীকে নির্দিষ্ট আচরণ রপ্ত করার শিক্ষা যখন দেওয়া হয় তখন দু'টি পৃথক উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। একদিকে আমরা পুরস্কার এবং শাস্তির ব্যবস্থা রেখে একটি শিশু কিংবা জন্তুকে দিয়ে কোনো একটি কাজ করাতে পারি কিংবা করা থেকে বিরত রাখতে পারি; অথবা আমরা শিশু বা জন্তুর আবেগ এমনভাবে গড়ে তুলতে পারি যাতে সে বাঞ্ছনীয় কাজগুলোই করে।

পুরস্কার ও শাস্তি বিজ্ঞতার সঙ্গে বিতরণ করে অবাঞ্ছনীয় আচরণ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

স্বভাবতই পুরস্কার ও শাস্তির একটা রূপই থাকবে, তা হলো প্রশংসা করা এবং দোষারোপ করা। এই উপায়ে দুর্বল ছেলেরা শারীরিক সাহস অর্জন করতে পারে, আর যে

www.pathagar.com

ছেলেরা ব্যথা পেলে অতিরিক্ত কাতর হয় তারা অর্জন করবে স্টয়িকসুলভ ধৈর্য। শিষ্টাচার শৈশবে শেখানো না গেলে বয়ঃসন্ধিকালে চোখ রাঙিয়ে শেখানো যেতে পারে। একজন ভালো থাকে, শিষ্ট হিসেবে নাম কুড়ায় এজন্য যে, অন্যথায় দুর্নাম কুড়াতে হয়। দুর্নাম কুড়ানোর ভয়টাই এখানে প্রধানত কাজ করে। যাদের শৈশবে শেখানো হয় সঙ্গীদের অসন্তুটির কারণ হবে না, অসন্তুষ্টি জিনিসটা ভয় করে চলবে, তারাও এমন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করতে পারে যে যুদ্ধ সম্পর্কে তারা কিছু জানে না। বোকার দল অবজ্ঞা করবে, এই ভয়েই তারা মৃত্যু বেছে নেবে। ইংলিশ পাবলিক স্কুলগুলো এই পদ্ধতিটির সম্পূর্ণতাসাধন করেছে। তাছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিকে অনেকাংশে অসাড় করেছে গোষ্ঠীর সামনে বুদ্ধির মর্যাদা খাটো করে। একেই বলে বালককে পুরুষালি করা।

ফলে সামাজিক শক্তি হিসেবে Conditioning-এর আচরণবাদী পদ্ধতি খুবই শক্তিশালী এবং সফল। এটা মানুষকে দিয়ে এমন কাজ করাতে পারে, স্বাভাবিকভাবে যা তারা করত না। তবু এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

ফ্রয়েডের জন্যই আমরা প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে এই সীমাবদ্ধতাগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছি। অবশ্য মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অনেকে স্বজ্ঞার আশীর্বাদে বহু আগে এই সীমাবদ্ধতাগুলো সম্পর্কে অনুমান করতে পেরেছিলেন। আমাদের লক্ষ্যের জন্য মনঃসমীক্ষণের আবশ্যিক আবিষ্কার এইগুলো: মানুষের প্রবৃত্তিগত কোনো ব্যাপার যদি জোর করে দমন করা হয় তবে তা মুছে যায় না বা মরে যায় না। বরং জায়গা নেয় অন্তরালে বা ভূতলে, আর এক সময় প্রকাশিত হয় নতুন কোনো পথে, যে পথ সংস্কার রুদ্ধ করে নি। কিন্তু দেখা যায় নতুন পথে যা প্রকাশিত হয় তা সমধিক ক্ষতিকর। অবদমন না করলে হয়তো কম ক্ষতি হত। তাছাড়া এই যে বিচ্যুতি, এতে আবেগগত অসুবিধার সৃষ্টি হয়, উপরন্তু শক্তিক্ষয় হয় অযথা। সুতরাং প্রকাশ্য আচরণ নয়, আবেগের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। চরিত্র গঠনে Conditioning-এর প্রবক্তারা এ ব্যাপারে যতটুকু মনোযোগ দেন তার চেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার।

উপরন্তু কতকগুলো অবাঞ্ছিত অভ্যাস দূর করতে গেলে পুরস্কার ও শাস্তির বিধান দিয়ে কাজ হয় না। একটা কু-অভ্যাস হল বিছানায় পেচ্ছাব করা। বয়সের একটা সীমানা পেরোনোর পরও যদি এই বদ্ অভ্যাস থেকে যায়, তা হলে শাস্তি প্রদান করে কোনো কাজ হবে না। বরং অভ্যাস আরো বদ্ধমূল হতে পারে। এ ব্যাপারটা যদিও বহুকাল আগেই মনোবিজ্ঞানীরা জেনে গেছেন, কিন্তু স্কুলের শিক্ষকরা এটা এখনো জানেন না। তারা এই অভ্যাসের জন্য ছাত্রদের এখনো শাস্তি দিয়ে যাচ্ছেন। এই নির্বোধ শিক্ষকরা লক্ষ করার চেষ্টাও করেন না যে শাস্তি দিয়ে বদ অভ্যাস সংস্কার করা যায় না। বেশি বয়সের ছেলের মধ্যে এই অভ্যাস থেকে যাওয়ার কারণ অবেচতনে গভীর মনস্তাত্ত্বিক তোলপাড়। অতএব কোনো প্রকার আরোগ্যের বাসনা পোষণ করলে আগে অবচেতন থেকে তা বের করে আনতে হবে।

অন্যান্য ছোটখাটো ব্যাপারেও একই মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা কাজ করে। স্নায়বিক বৈকল্যের ক্ষেত্রে এটা বর্তমানে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে। উদাহরণত অধিকাংশ ছেলের মধ্যে ছেচড়া চুরির (Kleptomania) অভ্যাস থাকে, অথচ প্রকৃত চুরির অভ্যাস নেই। ছেচড়া চুরির অভ্যাস শাস্তি দিয়ে দূর করা যাবে না। এই অভ্যাসের পেছনে কী মনস্তাত্ত্বিক কারণ কাজ করছে তা নির্ণয় এবং দূর করার চেষ্টা করতে হবে। আবেগগত কারণে আমরা সবাই কম বেশি স্নায়বিক বৈকল্যে ভুগি, অথচ এটা প্রায়ই স্বীকার করা হয় না। একজন মানুষকে

www.pathagar.com

তখনই মানসিকভাবে সুস্থ বলা হয় যখন দেখা যায় যে সে তার সমকালীনদের মতো প্রকৃতস্থ; কিন্তু গড় মানুষের মধ্যে যে কর্মশৈলী কাজ করে এবং তার মতামত গঠন ও কার্যধারা নির্ধারণে ভূমিকা রাখে তা একেবারেই অদ্ভুত। এতটা অদ্ভুত যে প্রকৃত সুস্থ জগতে তাদের মানসিকভাবে অসুস্থ গণ্য করা হবে। যে পদ্ধতি সমাজবিরোধী আবেগ এড়িয়ে যায় তা দিয়ে সৎ সামাজিক আচরণ গঠন বিপজ্জনক। এই আবেগগুলো প্রকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে, উক্ত আবেগগুলোর শক্তি কেবল বাড়তেই থাকবে এবং এক সময় দেখা দেবে নির্দয়তা এবং এটা তখন দমন করা কঠিন হবে। যাদের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল তাদের মধ্যে এই আবেগ অপরাধের রূপ নেবে কিংবা শাস্তিযোগ্য আচরণের জন্ম দেবে। সবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষের কাছে এই আবেগ অধিকতর অবাঞ্ছনীয় রূপ পরিগ্রহ করে। সে নিজের গৃহে অত্যাচারী, ব্যবসা-বাণিজ্যে নির্দয়, রাজনীতিতে দাঙ্গাবাজ এবং সামাজিক নৈতিকতার ক্ষেত্রে নির্যাতনপ্রবণ হতে পারে; আবার এই সব গুণাবলীর জন্য অনুরূপ ত্রুটিপূর্ণ চরিত্রের অপর একজন লোক তাকে ভক্তি করবে; স্বীয় যোগ্যতা এবং প্রাপ্ত সুযোগ অনুসারে একটি নগর, একটি জাতি কিংবা একটা যুগের মধ্যে ব্যাপক ঘৃণা ও দুর্দশা ছড়িয়ে সে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভেতর মৃত্যুবরণ করবে। মোটকথা সঠিক আচরণ আর মন্দ আবেগ যুক্ত করে কেউ মানবতার সুখের জন্য অবদান রাখতে পারে না। বাঞ্ছনীয় আচরণের রূপরেখা হিসেবে যদি এটাকেই ধরি তা হলে চরিত্রগঠনের শিক্ষার মধ্যে আরো অনেক কিছু থাকতে হবে।

এইসব বিবেচনা এবং শিশুদের সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় চরিত্র গঠনের আচরণবাদী পদ্ধতি একটি অপূর্ণ পদ্ধতি, এটি সম্পূর্ণ করার জন্য একেবারে আলাদা একটি পদ্ধতি যোগ করতে হবে।

শিশুদের এমন পরিবেশে রাখতে হবে যাতে কেবল বাঞ্ছনীয় আবেগসমূহই প্রকাশ পায়, তাঁর অবাঞ্ছনীয় আবেগগুলো প্রায় থাকে না। কতক শিশু (এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি) সব সময় হাসি-খুশি থাকে, অনেকে আবার সব সময় বিষণ্ন; অনেক শিশুকে সহজেই সন্তুষ্ট করা যায়। অনেক শিশুকে সন্তুষ্ট করা খুবই কঠিন কাজ, তার নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাতে না পারলে সে সন্তুষ্ট হবে না। অনেকের মানুষের প্রতি আস্থা সহজেই জন্মে, অনেকে মানুষ সম্পর্কে আতংক বোধ করে, মানুষের প্রতি তাদের সহজাত সন্দেহ থেকে যায়। সুতরাং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে শিশুরা প্রধানত আবেগগত সেই মনোভাবই গঠন করবে যা তাদের শৈশবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে সুখী করবে, তারা সফল হবে, তাদের সমাজের জন্য দরকারি বলে বিবেচনা করা হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মনোবিজ্ঞান নির্ধারণ করতে পারে কী ধরনের পরিবেশে থাকলে শিশুদের মধ্যে সঠিক আবেগের সৃষ্টি হবে। তাছাড়া শিশুদের বুদ্ধির সঙ্গে মমত্ববন্ধনে আবদ্ধ করলে সুফল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি সঠিকভাবে আরোপ করলে চরিত্রের ওপর সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পুরস্কার ও শাস্তির পদ্ধতি আরোপ করে এতটা সুফল লাভের আশা করা যায় না।

শিশুদের জন্য সঠিক আবেগগত পরিবেশ একটা পলকা (delicate) ব্যাপার, এবং বয়সের বিভিন্ন স্তরে তা বিভিন্ন হতে বাধ্য। গোটা শৈশবে শিশুকে নিরাপদ বোধ করতে হবে। অবশ্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োজনীয়তা কমে আসতে থাকে। এর জন্য দরকার মমতা এবং তাদের সুখকর কাজের মধ্যে রাখা। বয়স্কদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক হবে খেলাধুলার, আবেগাপ্লুত আদরের নয়। একটি শিশুর অন্যান্য শিশুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকবে। সর্বোপরি নির্মাণ, অনুসন্ধান এবং বুদ্ধিগত ও শৈল্পিক কার্যক্রমের অবাধ সুযোগ থাকতে হবে। বয়স্করা শিশুদের মধ্যে মমতা দ্বারা নিরাপত্তা বোধ জাগিয়ে তুলবে, তবে এটা

www.pathagar.com

করতে গিয়ে যেন তাদের স্বাধীনতা খাটো করা না-হয়। শিশুদের খেলাধুলা করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর শিশুরা শুধু নিজেদের মধ্যে খেলা করবে না। পিতামাতার সঙ্গেও খেলা করবে, পিতামাতার সঙ্গে শিশুর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য এটা আবশ্যক।

আজকের দিনে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে শিশুদের স্বাধীনতা দেওয়া একটু কঠিন হয়ে পড়েছে বৈকি। আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে বলি না, কেন বলি না তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে। তবে আমি নির্দিষ্ট ধরনের স্বাধীনতার পক্ষে বলে থাকি, অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তি তা আবার পছন্দ করেন না, এমনকি সহ্যও করেন না। জ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করার জন্য শিশুদের ওপর জোর খাটানো ঠিক হবে না। কোনো বয়স্ক ব্যক্তিকে যদি কোনো শিশু বোকা মনে করে, তবে তাকে বোকা মনে করতে দিতে হবে। আমরা শিশুদের আমাদের বোকা মনে করতে বন্ধ করতে পারি না। তেমন কোনো উপায়ের কথা অন্তত আমার জানা নেই, যাতে শিশুদের বয়স্কদের বোকা মনে করা বন্ধ করা যায়। তাদের নিষেধ করলেই যে তারা আমাদের বোকা মনে করা থেকে বিরত হবে এমন ভরসা করা যায় না। শিশুদের পণ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না-এজন্য নয় যে পণ করা বাঞ্ছনীয়। শিশুদের ভাবতে দিতে হবে যে একটা কাজ করণীয় বলে তা করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। সকল প্রকার সেক্স ট্যাবু থেকে শিশুদের মুক্ত রাখতে হবে। এবং সেক্স সম্পর্কিত তাদের কথাবার্তা বয়স্কদের কাছে অরুচিকর মনে হলেও তাদের বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। তারা যদি ধর্ম, রাজনীতি কিংবা নৈতিকতা সম্পর্কে কোনো মতামত পেশ করে তবে তাদের সঙ্গে সদর্থক তর্ক করা যেতে পারে। বয়স্করা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা উপস্থাপন করতে পারেন, কিন্তু কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

এ রকম পরিবেশে শিশুরা হবে নির্ভয় এবং প্রকৃত সুখী। অতিরিক্ত আদর করে, শিশুদের ওপর অতিরিক্ত দাবি চাপিয়ে দিলে তারা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়। সঠিক পরিবেশে তারা স্বাধীনভাবে বুদ্ধি খাটাতে পারবে, মানুষ সম্পর্কে তাদের মনোভাব হবে দয়ালু। কারণ সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি কখনো ক্রুর হতে পারে না। ঈপ্সিত পরিবেশে গড়ে ওঠা মানুষ সমাজের জটিলতা দূর করবে, যুদ্ধ, নির্যাতন, অর্থনৈতিক অন্যায় অনেকটা লাঘব করবে, বাক্ স্বাধীনতা এবং মুক্ত অনুসন্ধানের আতংক দূর করবে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নৈতিক বিধির ঘটাবে আধুনিকায়ন। ড. ওয়াটসন, যিনি মানব চরিত্রের জন্মগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, স্বীকার করেছেন যে দেহের কোনো অঙ্গ চেপে ধরলে শিশুরা ক্ষুব্ধ হয়। এই সহজাত আবেগই স্বাধীনতাপ্রিয়তার ভিত্তি। যে ব্যক্তির জিহ্বা আইন কিংবা ট্যাবু দ্বারা সংকুচিত করা হয়েছে, তাকে স্বাধীনভাবে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না, যে ব্যক্তির কলম সেন্সর প্রথা দ্বারা আটকে দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তির ভালোবাসাবোধ সংকুচিত করা হয়েছে এই বিধান রচনা করে যে স্নেহ-মমতার চেয়ে হিংসা উত্তম, যে ব্যক্তির শৈশব শুষ্ক নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ, যৌবনে যে ব্যক্তির মাথায় গোঁড়ামি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি এই পৃথিবীকে ভালো চোখে দেখতে পারে না, সে মানুষ ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠবে, একজন বিপ্লবী, সমরবাদীতে পরিণত হবে; কিংবা পরিণত হবে একজন নির্যাতনকারী কট্টর নীতিবাগীশে। উন্নততর জগৎ তৈরির অনুকূল মানুষ গড়া আবেগপ্রধান মনোবিজ্ঞানের সমস্যা। আর সমস্যাটা এমন মানুষ তৈরি করা যার বুদ্ধি মুক্ত, এবং সে সুখী। এই সমস্যা বিজ্ঞানের ক্ষমতা অতিক্রম করে নি; ক্ষমতা নয়, ইচ্ছাশক্তির অভাবের জন্য এটা হচ্ছে না।

www.pathagar.com

গৃহ বনাম পাঠশালা

শিশুর শিক্ষা তার গৃহের নিভৃত কোণেই হওয়া উচিত, এই অভিমত এখন সেকেলে হয়ে গেছে, যদিও লক ও রুসোর রচনাদিতে গৃহকোণে শিক্ষার পক্ষে বলা হয়েছে। আলেকজান্ডার, হ্যানিবল এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ক্ষেত্রে গৃহকোণে শিক্ষার নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল। তবে এই পদ্ধতি অনুসরণ কেবলমাত্র ধনীদের পক্ষেই সম্ভব। আর শুধু এই কারণেই এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু গৃহ ও স্কুলের মধ্যেকার দাবির অনুপাত এবং কোন বয়সে শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত তা নিয়ে সংগত বিতর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে সুস্থ বাদানুবাদ চলতেও পারে।

ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সরকারগুলোর অভিমত হল শ্রমজীবী শ্রেণীর সন্তানেরা ছয় বছর থেকে তেরো কিংবা চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে যাবে। অধিকতর সমর্থ শ্রমজীবী শ্রেণীর কয়েক শতাংশ ছেলেদের উৎসাহিত করা হয় উক্ত বয়স অতিক্রম করেও পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। ছাত্রবৃত্তির আকারে এই উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ধনী লোকের পুত্র-কন্যারা স্বাভাবিক নিয়মে চৌদ্দ বছরের পরও লেখাপড়া চালিয়ে যায়। কোন বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষা বাঞ্ছনীয় এ ব্যাপারে কোনো সর্ববাদীসম্মত অভিমত নেই। এ বিষয়েও এক মত হতে পারা যায় নি যে সাধারণ স্কুল ভালো না বোর্ডিং স্কুল। তবে এ ব্যাপারে বোধ হয় দ্বিমত নেই যে 'সুগৃহ' নামক একটা কিছুর অস্তিত রয়েছে, এবং 'সুগৃহ' যে কোনো বোর্ডিং স্কুলের চেয়ে উত্তম। তবে কতকগুলো গৃহ যে 'সুগৃহ' নয়, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করা চলে না। আমার কাছে প্রশ্নটা জটিল। কারণ এখানে উভয় পক্ষে কথা বলার সুযোগ রয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে প্রশ্নটার দুটি দিক রয়েছে। কোন বয়সে স্কুল শুরু হবে বা হওয়া উচিত? সাধারণ স্কুল না বোর্ডিং স্কুল ভালো? আমরা এই প্রশ্নগুলো নিয়ে এখন আলোচনা করব।

কোন বয়সে স্কুল শুরু হওয়া উচিত? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে গৃহের ওপর। গৃহও নয়, গৃহের ভূ-সংস্থানের ওপর। তবে কোনোমতেই নৈতিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রের ওপর নয়। যে ছেলে গ্রামের খামারবাড়িতে থাকে সে তো মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে, বনে-অরণ্যে ঘুরেফিরে পর্যবেক্ষণ করতে পারে জীবজানোয়ার, খামারে বসে দেখতে পারে খড় শুকানো, ধান কাটা, শস্য মাড়ানো, হাল ধরতে পারে, তার পর সময় হলে স্কুলে যাবে। শহুরে ছেলেদের ব্যাপারটা আলাদা। তাদের পিতামাতারা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষুদ্র পরিসরে বাস করে। এই ছেলেদের জন্য স্কুল খুবই জরুরি, স্কুলে গেলেই সে মুক্ত বোধ করবে। তাদের গতিবিধি হবে মুক্ত, হট্টগোলের স্বাধীনতা পাবে, আর পারবে স্বাধীনভাবে সঙ্গী বেছে নিতে।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে আমি অনেক রোগতত্ত্ববিশারদের সঙ্গে কথা বলেছি, দেখেছি তারা নার্সারি স্কুলের ঘোরবিরোধী। তারা মনে করেন নার্সারি স্কুলগুলো ধরে নিয়েছে প্রতিটি স্কুলের পাঠ্যক্রম সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। আসলে নার্সারি স্কুলের উচিত এমন পাঠ্যক্রম রাখা যাতে ছেলেরা মজা বোধ করতে পারে। তাছাড়া তাদের সার্বক্ষণিক তদারকির ভেতর রাখা ঠিক হবে না। গৃহে তাদের কিন্তু তদারকির মধ্যেই থাকতে হয়। স্বাধীন চলাফেরার সুযোগ মোটে মেলে না।

শহরে ছেলেদের মধ্যে যাদের পিতামাতারা ধনাঢ্য নয়, তাদের কিছু বাস্তবিক ও মনস্তাত্ত্বিক দাবি রয়েছে যা গৃহের নিভৃত কোণে মেটানো সম্ভব নয়। এই দাবিগুলোর প্রধান হল আলো ও বাতাস। মার্গারেট ম্যাকমিলান লক্ষ করেছেন তাঁর নার্সারি স্কুলে যারা প্রথম ভর্তি হতে আসে তাদের একটা বিরাট অংশ রিকেট রোগে পীড়িত, এবং কিছুদিন খোলা আলো–বাতাসে থাকার পর আরোগ্য লাভ করে। দ্বিতীয় প্রয়োজন হল উপযুক্ত খাবার। এটা খুব ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়, এবং তত্ত্বগতভাবে হয়তো গৃহে ভালো খাবার সরবরাহ করা যায়, বাস্তবে কিন্তু একেবারেই সম্ভব নয়। কারণ সুষম খাদ্য বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব এবং অহেতুক রক্ষণশীলতা। তৃতীয় প্রয়োজন একটু পরিসরের। শিশুদের লম্ফ–জম্ফ ও খেলাধুলা করার সুযোগ থাকা দরকার। দরিদ্র ছেলেরা রাস্তায় খেলাধুলা করতে পারে, কিন্তু অন্যদের নিষেধ করা হয়। সে যাই হোক, রাস্তা কিন্তু খেলাধুলার জন্য উপযুক্ত জায়গা নয়। চতুর্থ প্রয়োজন হল হট্টগোল করার সুযোগ। ছেলেরা একটু হট্টগোল করবেই, এতে বাধা দিতে নেই; ছেলেদের হট্টগোলে বাধা দিলে নির্দয়তাই প্রকাশ পাবে। কিন্তু একটি বাড়িতে যদি একাধিক শিশু থাকে এবং তারা একযোগে হট্টগোল শুরু করে দেয় তা হলে বড়দের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। পঞ্চম প্রয়োজন হল সঙ্গী হিসেবে সমবয়সীদের পাওয়া। এই প্রয়োজন শুরু হয় দ্বিতীয় বর্ষের শেষ দিকে, তারপর থেকে প্রয়োজনটা দ্রুত বাড়তে থাকে। ষষ্ঠ প্রয়োজন হল পিতামাতার নিরন্তর আদর থেকে অব্যাহতি। ধনাঢ্য পিতামাতার সন্তানদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্রের ব্যাপারটা আলাদা। দরিদ্র পিতামাতার জীবিকার সন্ধানে এবং সাংসারিক কাজকর্মে এতটা ব্যস্ত থাকতে হয় যে তারা সন্তানের প্রতি নজরই দিতে পারেন না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পিতামাতারাও সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত নজর দিয়ে তাদের ক্ষতিসাধন করে। সপ্তম প্রয়োজন হল উপযুক্ত পরিবেশ, যেখানে আমোদ–প্রমোদের যথার্থ সুযোগ এবং উপকরণ রয়েছে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কাচ–পাথর ইত্যাদির মতো আজেবাজে জিনিস যেন শিশুর নাগালের মধ্যে না থাকে। শিশুর ছয় বছর বয়স পর্যন্ত যদি এই প্রয়োজনগুলো মেটানো না হয় তা হলে তারা রুগ্ন, উদ্যমহীন এবং দুর্বল মনের অধিকারী হবে।

বড় শহরে শিশুদের যত্নের ভেতর রাখার সমস্যা সম্পর্কে আধুনিক রাষ্ট্রের কোনো সচেতনতা নেই। তবে ভিয়েনার পৌরসভা একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এটি একটি স্থাপত্যশিল্পগত প্রশ্ন। শহরের দরিদ্র এলাকায় অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করা উচিত খোলা চত্বরের তিন দিক ঘিরে। দক্ষিণ দিকটা খোলা থাকবে সূর্যালোক প্রবেশের জন্য। মাঝখানের খোলা জায়গা নির্দিষ্ট থাকবে শিশুদের জন্য। এখানে ছেলেরা বড়দের তত্ত্বাবধানে খেলা করবে, আহার্য গ্রহণ করবে, তারপর ঘুমানোর জন্য পিতামাতার কাছে ফিরে যাবে। এতে মায়েরা নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় পাবে, শিশুরাও অত্যন্ত উপকৃত হবে। কিন্তু স্বতন্ত্র বাড়ি এটা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে রেখেছে। বিশেষত এই প্রতিবন্ধক ইংলন্ডে খুব বেশি। অন্যান্য দেশের চেয়ে ইংলন্ডে স্থাপত্যশিল্পের ওপর খবরদারি খুব বেশি করা হয়।

www.pathagar.com

হয়তো ধনী লোকেরা তাদের সন্তানদের গোষ্ঠী মালিকানার মাঠে খেলতে দেবে না। কিন্তু দিনের একটা অংশ মুক্তস্বাধীন থাকা, ইচ্ছেমতো একটু খেলাধুলা করা দরিদ্র ছেলেদের যেমন দরকার ধনী ছেলেদেরও তেমন দরকার। শহরের একটা বাড়ি, তা যত সুন্দরই হোক না কেন, শিশুর সুস্থ মানসিক ও শারীরিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে পারে না। উচ্চ মূল্য দিয়ে উচ্চ সমাজে মেশা যায়, কিন্তু যে কোনো শ্রেণীর জন্য কোনো-না-কোনো ধরনের নার্সারি স্কুল অত্যাবশ্যক।

যাকে আমরা প্রাক-বিদ্যালয় সময়কাল বলি তা নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি। শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বোর্ডিং স্কুলের পক্ষে যুক্তিগুলো আরো জোরালো হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে জোরালো যুক্তিটি হল আবাসিক স্কুল দেশের সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা এবং পরিবেশে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পক্ষান্তরে সাধারণ স্কুল অধিকাংশ ছেলের জন্য শহরে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আরো একটি যুক্তি, এই যুক্তিটা অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাটলেও সব ক্ষেত্রে খাটে না। গৃহে থাকলে শিশুকে অযথা স্নায়ুর চাপে ভুগতে হয়। হয়তো পিতামাতা বাড়িতে ঝগড়া-বচসায় লিপ্ত হলো, হয়তো মাতা শিশুর জন্য অতিরিক্ত উদ্বেগাকুল, হয়তো পিতার মধ্যে দয়ার ভাগটা কম; হয়তো অন্য ভাই বা বোনকে অতিরিক্ত স্নেহ করা হয়, এতে যাকে বা যাদের কম ভালবাসা হয় তাদের মধ্যে হিংসার উদ্রেক করে। পিতামাতার মধ্যে একজন অন্যায়ভাবে স্নেহশীল হতে পারেন। আসলে বাড়ি খুব বেশি আবেগ-কাতর। শিশুদের দরকার শান্ত, নির্ঝাঞ্ঝাট জীবন-যাপন, আমোদপ্রমোদপূর্ণ জীবন; তাদের যেন তীব্র, তীক্ষ্ণ কোনো আবেগ স্পর্শ না করে। আবার পিতামাতার বিজ্ঞ আদর-সোহাগ শিশুর জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এতে তার মধ্যে নিরাপত্তাবোধ জাগবে, মানবসন্তান হিসেবেও সে নিজের মূল্য বুঝবে। তবে এই পরস্পরবিরোধী যুক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ কাজ নয়।

গৃহ বনাম স্কুল প্রশ্ন নিয়ে বিমূর্তভাবে যুক্তি অবতারণা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আদর্শ গৃহের সঙ্গে স্কুলের তুলনা করলে, ভারসাম্য একদিকে ঝুঁকে পড়বে; আদর্শ স্কুলের সঙ্গে প্রকৃত বাড়ির তুলনা করলে ভারসাম্য অপর দিকে ঝুঁকবে। আমার কাছে এটা নিঃসন্দেহ ব্যাপার বলেই মনে হয় যে আদর্শ গৃহের চেয়ে আদর্শ স্কুল অনেক ভালো, অন্তত শহুরে বাড়ির চেয়ে স্কুল অনেক ভালো। কারণ এখানে আলো-বাতাস বিস্তর মেলে, চলাফেরার স্বাধীনতাও অনেক বেশি, এবং সমবয়সী অনেক সঙ্গী সহজে পাওয়া যায়। তাই বলে কিন্তু প্রকৃত স্কুল প্রকৃত বাড়ির চেয়ে উন্নত নয়। অধিকাংশ পিতামাতা সন্তানের জন্য মায়া-মমতা অনুভব করেন। আর এটাই তারা সন্তানদের যে ক্ষতি করেন তা একটা সীমার মধ্যে বেঁধে রাখে। কিন্তু শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ ছেলেদের জন্য কোনো প্রকার মায়া-মমতা অনুভব করেন না। খুব বেশি হলে তারা গোটা সমাজের জন্য কিছু করেন, একান্তভাবে শিশুদের জন্য ভাবেন না। তাছাড়া রাজনীতিকদের মতো কিছু পাওয়ার আশায় হৈ চৈ করেন। বর্তমানে তরুণদের মানসিক গঠনের জন্য গৃহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ভূমিকা নির্ভেজাল কল্যাণকর নয়। কিন্তু রাষ্ট্র ছেলেদের এককভাবে কর্তৃত্ব গ্রহণ করলে যে ভূমিকা পালন করবে তার চেয়ে ঢের ভালো। গৃহ শিশুকে স্নেহ-মমতার অভিজ্ঞতা যোগায়, গৃহে সে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করে বলে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে সক্ষম হয়, একই সঙ্গে নর ও নারীর সঙ্গ পায়। সর্বোপরি, পূর্ণবয়স্কদের জীবন-যাপনের রীতিনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করতে পারে। বস্তুত, স্কুলের কৃত্রিম সারল্যের সংশোধক হিসেবে গৃহ প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখে।

www.pathagar.com

গৃহের আর একটি গুণ এই যে, গৃহ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বৈচিত্র্য রক্ষা করে। আমরা সবাই যদি এক রকম হতাম, তা হলে আমলা ও পরিসংখ্যানবিদদের হয়তো খুবই সুবিধা হত, কিন্তু জীবন হত নিষ্প্রাণ, আর সমাজটা হত অপ্রগতিশীল। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্য দায়ী স্বতন্ত্র বাড়ি। বড় বেশি পার্থক্য সামাজিক সংহতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে, কিন্তু সহযোগিতার জন্য কিছুটা পার্থক্য আবশ্যক। একটা অর্কেস্ট্রার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভার লোকের দরকার করে, তাদের রুচিরও কিছু পার্থক্য থাকা আবশ্যক; সবাই যদি ট্রমবন চালনার জন্য জেদ ধরেন, তা হলে অর্কেস্ট্রা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। সামাজিক সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন ধরনের রুচি এবং ঝোঁক–বিশিষ্ট লোকের আবশ্যকতা রয়েছে। এখন যদি শিশুকে একইভাবে লালন–পালন করা হয়, একই পরিবেশে বড় হয়ে উঠতে দেওয়া হয় তা হলে ভিন্ন ভিন্ন রুচির মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এজন্যই শিশুদের পিতামাতার কাছেও থাকা দরকার। বিভিন্ন পিতামাতার মেজাজ ও রুচি নিশ্চয় বিভিন্ন হবে। আর এটা প্লেতোর তত্ত্বের বিপক্ষে সব চেয়ে জোরালো যুক্তি। প্লেতো প্রস্তাব করেছিলেন যে সব শিশুই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে লালিত–পালিত হবে।

বর্তমান পৃথিবীতে পরিবারের বাইরে দু'টি প্রতিষ্ঠান তরুণদের কল্যাণের কথা ভাবে। একটি হল রাষ্ট্র, অপরটি গির্জা। ইংল্যান্ডের শ্রমজীবী শ্রেণীর শিশুদের দুই-তৃতীয়াংশের দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্র। বাকি অংশের দেখাশোনা করে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন। প্রধানত অ্যাংলিক্যান ও রোমান ক্যাথলিক গির্জাগুলো। ধনী ব্যক্তিদের সন্তানেরা প্রধানত অ্যাংলিক্যান আবহে শিক্ষা লাভ করে। অধিকাংশ 'ভালো' বালিকা বিদ্যালয়গুলো অ্যাংলো–ক্যাথলিকদের দ্বারা পরিচালিত। ফলে উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের শিক্ষার ওপর ধর্মের প্রভাব বেড়েই চলেছে।

গির্জা ও রাষ্ট্রের কিছু ত্রুটি রয়েছে, এবং এই ত্রুটিগুলো শিক্ষার ওপর বাজে প্রভাব ফেলছে। ত্রুটিগুলো সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে শুধু এইটুকু বলা যায়, গির্জা ও রাষ্ট্র কতকগুলো প্রস্তাবানার প্রতি সম্মতি প্রত্যাশা করে, যে প্রস্তাবনাগুলো যে কোনো সুস্থ ব্যক্তি নাকচ করে দেবেন। তাছাড়া গির্জাগুলো যে নৈতিকতার ধ্বনি তুলে ধরে, সেটা নৈতিকতা নয়, নির্জলা নির্দয়তা। অদ্ভুত প্রস্তাবনাগুলোর কয়েকটি: রোমান ক্যাথলিক গির্জা দাবি করে যে, একজন পুরোহিত লাতিন ভাষায় কথা বলে এক খণ্ড রুটিকে খ্রিষ্ট–র দেহ এবং রক্তে পরিণত করতে পারেন, পক্ষান্তরে, বৃটিশ রাষ্ট্র মনে করে তার সাম্রাজ্য উপনিবেশগুলোর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। তরুণদের এইসব আজগুবি কথা বিশ্বাস করানোর জন্য দরকার হল তাদের নির্বোধ রাখা এবং তাদের শেখানো যে কোনো–কোনো ক্ষেত্রে তারা যেন তাদের যুক্তি–ক্ষমতা প্রয়োগ না করে। এবার নির্দয় নৈতিকতার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। রোমান ক্যাথলিক চার্চ দাবি করে যে, কোনো মহিলা উপদংশ–আক্রান্ত পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হলেও গর্ভপাত করা যাবে না, উপদংশ–আক্রান্ত সন্তান জন্মলাভ করতে দিতে হবে। এতে শিশু পৃথিবীতে কিছুকাল দুর্ভোগ পোহানোর পর অনন্তকাল নরকের সীমান্ত অঞ্চলে বাস করবে (ধরে নিতে হয় উক্ত শিশুর পিতামাতা ক্যাথলিক নয়)। বৃটিশ রাষ্ট্রের বিবেচনায় ওয়েস্টমিনস্টার–এর কয়েকজন বয়ঃবৃদ্ধ ভদ্রলোক যদি কোনো ইংরেজকে একজন অ–ইংরেজকে হত্যা করতে বলে তবে তার তাই করা উচিত। শুধু তাই নয়, এটাকে তার দায়িত্ব মনে করতে হবে। এইসব উদাহরণ থেকে অন্তত এতটুকু বোঝা যায় যে গির্জা ও রাষ্ট্র হল বুদ্ধিবৃত্তি এবং সদ্‌গুণের ক্ষমাহীন শত্রু।

অতএব বিকল্পের ব্যবস্থা না করে শিক্ষার ওপর গৃহের প্রভাব হ্রাস করলে বিপজ্জনক ফল দাঁড়াবে। আবার যদি পৃথিবীটাকে আমরা এমনভাবে গড়তে পারি যে পৃথিবী হবে ধর্মতত্ত্বের প্রভাবমুক্ত, তা হলে সম্ভবত তরুণদের কাছে গৃহের মূল্য অনেক কমে যাবে। এবং তারা

www.pathagar.com

পিতামাতার প্রভাবের আওতার বাইরে থাকার জন্য অধিকতর সুখী এবং বুদ্ধিমান হবে। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়া ছাড়া সর্বত্র প্রগতির পথে অগ্রসর হতে হবে গির্জা ও রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে। আর এই দু'টির প্রভাব বৃদ্ধির কারণ ঘটলে আমাদের আতংকিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

শিশুদের পিতামাতা থেকে সরিয়ে এনে লালন-পালনের জন্য রাষ্ট্রের অধীনে ন্যস্ত করা উচিত হবে কিনা তা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। এটা আমরা বিবেচনা করবো শুধু শিশুদের কথা ভেবে নয়, পিতামাতার কথা ভেবেও এটা আমাদের বিবেচনা করে দেখা দরকার। পিতামাতার অনুভূতি শিশুর আচরণ গভীরভাবে প্রভাবিত করে, এবং উক্ত প্রভাব শুধু নারী নয়, পুরুষের ওপরও কাজ করে। আমাদের সামনে এমন কোনো তথ্য নেই যে বিচার করে দেখতে পারি এই প্রভাব নিরাকরণ করলে নর ও নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী দাঁড়ায়। তবে এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি তাদের চরিত্রে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেবে। এটাও সম্ভাব্য যে উক্ত পরিস্থিতিতে অধিকাংশ মহিলা সন্তানের বাসনা পোষণ করবেন না, এবং সন্তানের লালন-পালন পেশাদার লোকের হাতে চলে যাবে, এমনকি এটা সিভিল সার্ভিসের অঙ্গে পরিণত হতে পারে। আরো সম্ভাব্য যে নর-নারীর সম্পর্ক তুচ্ছ হয়ে পড়বে, বৈবাহিক অনুরাগ আর থাকবে না। মানুষ আর কঠোর শ্রম দিতে উৎসাহ বোধ করবে না, যেহেতু বর্তমানে পুরুষের কাজের প্রেরণা প্রধানত আসে পরিবার ভরণ-পোষণের তাগিদ থেকে। হঠাৎ করে পরিবার যাতে বিপদে না পড়ে তার জন্যই লোকেরা জীবন বিমা খাতে ব্যয় করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। পরিবার না থাকলে একজন লোক নিশ্চয় তার মৃত্যুর পর কী হবে তা নিয়ে চিন্তা করবে না। সম্ভবত সমাজের ওপর এক ধরনের অসাড়তা নেমে আসবে, যেমন মৌমাছির চাকে অসাড়তা নেমে আসে রানী মৌমাছি অন্যত্র চলে গেলে। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতাই কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এখনো আমরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি নি।

আবার এর বিপরীত দিক সম্পর্কেও অনেক কথা বলা যায়। অধিকারসূচক (possesive) আবেগ মাত্রেই বিপজ্জনক। সন্তানের প্রতি পিতামাতার অধিকার সূচক আবেগও কম বিপজ্জনক নয়। সন্তানের প্রতি পিতামাতার অনুভূতি অত্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও প্রতিযোগিতামূলক; অনেক লোক নিঃসন্তান অবস্থায় দিন-রাত জনসেবা করে বেড়ায়, আর সন্তান হবার সঙ্গে সঙ্গে সংসার সমুদ্রে ডুবে যায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি আসক্তি আসে প্রধানত পরিবার-চেতনা থেকে। প্লেতো, কমুনিস্ট এবং অন্যান্যরা ঠিকই বলেছেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা ঠিক নয়। পিতামাতার অনুভূতির ভালো ও প্রয়োজনীয় দিকটা স্কুল কিংবা অসাধারণ ব্যক্তির মাধ্যমেও শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়। এটা করা গেলে সুনিশ্চিত নৈতিক অগ্রগতি লাভ করা হবে। আমার মতে পরার্থবাদের উৎস হল পিতামাতার অনুভূতি, আর অনেক নিঃসন্তান মহিলাকে দেখে বোঝা যায় একে সর্বজনীন করলে অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হবে। আর হয়তো একে অধিকার সূচক আবেগ থেকে মুক্ত করা গেলে পৃথিবীতে হিংস্রতা অনেকাংশে দূরীভূত হবে, মানুষও হয়তো সর্বজনীন কল্যাণের জন্য ভাবতে শুরু করবে। এসবই কল্পনা, তবে অসার কল্পনা নয়, এ কথাটা আমাদের মনে থাকা খুবই জরুরি।

গৃহ বনাম স্কুল সমস্যাটা একটা স্তর পর্যন্ত মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন না করে সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে সমাধা করা যায়। তবে এই স্তর অতিক্রম করার সময় আমরা মানব মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতার সম্মুখীন হই। আমরা জানি না আমাদের অনুভূতির কতোটা সহজাত, কিংবা জানি না আমাদের বর্তমান অনুভূতি পরিবর্তন করলে তা কতটা তেজস্বী বা সক্রিয় শক্তিসম্পন্ন হবে। আমরা আশা করব রাশিয়া আমাদের এতদসংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করবে; ইত্যবসরে একমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত মুলতবি রাখা।

www.pathagar.com

অভিজাতশ্রেণী, গণতন্ত্রী এবং আমলাবাহিনী

রাষ্ট্র প্রথম গঠিত হবার পর থেকেই পরিবার ও রাষ্ট্র পরস্পরবিরোধী শক্তি হিসেবে কাজ করছে, ব্যতিক্রম থেকে গেছে একমাত্র রাজকীয় পরিবারে, সেখানে এই দুটি মিলেমিশে আছে। ফলে এরকম ধারণা বিস্তার লাভ করেছে যে জাতি হল একটা বিরাট পরিবার, সার্বভৌম রাজা বা রানী উক্ত পরিবারের প্রধান। এই ধারণা প্রাধান্য লাভ করে চিন ও জাপানে, মেক্সিকো এবং পেরুতে, তাছাড়া 'নৃপতি স্বর্গীয়' এই বোধ যেখানে প্রবল সেখানে উক্ত ধারণা কতকাংশে কাজ করেছে। উক্ত উপায়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনও করা যায়; যে অনুভূতি মানুষকে রাজভক্ত করেছে তা ছিল অংশত ধর্মভক্তি, অংশত পরিবার প্রধানের প্রতি শ্রদ্ধা। নৈর্ব্যক্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গ্রিক ও রোমকরা, বিশেষত রোমকরা; জ্যেষ্ঠ ব্রুটাস যে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য স্বীয় পুত্রকে বিসর্জন দেন তাকে বলা যেতে পারে জননীতির ধর্ম। প্রাচ্যে এই ধর্ম সাম্প্রতিককালের সৃষ্টি এবং ইউরোপীয় প্রভাবের দরুন তা সম্ভব হয়েছে। কনফুশিয়াস পিতামাতার প্রতি সন্তানের যোগ্য আচরণ বা পিতামাতার সেবাকে আইনের ওপর স্থান দিয়েছেন। এবং একটি ছেলে তার অপরাধী পিতাকে পুলিশের কাছে তুলে দেয় বলে উক্ত ছেলের তীব্র নিন্দা করেছেন। জাপানিদের দেশপ্রেমে পরিবার–প্রধানের প্রতি ভক্তির সুপ্রাচীন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যদি বুদ্ধিবাদের প্রভাবে এই অনুভূতির অবক্ষয় ঘটে তা হলে আশংকা করা চলে জাপানের রাজতন্ত্র বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা টিকবে কি–না। তাছাড়া অসম্ভব নয় যে সেখানে পরিবর্তে রুশ ধরনের সরকার কায়েম হবে। চিনে পুরনো পরিবার অনুভূতির জায়গায় আধুনিক দেশপ্রেম চালু করার নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টা চলছে কুয়োমিনটাং পার্টিকে ঘিরে, আর সান ইয়াৎ সেনকে ভক্তি করা হচ্ছে প্রবল ধর্মীয় আবেগ সহকারে। ভারতে ইংরেজদের প্রতি তীব্র ঘৃণা থেকে আধুনিক দেশপ্রেম গড়ে উঠছে। কিন্তু এই দেশগুলোতে রোমক ঐতিহ্য না থাকার দরুন, দেশপ্রেম বলতে আমরা যা বুঝি, তা কিছুটা বিকট ও বহিরাগত রয়ে গেছে।

আধুনিককালে বৃটিশ উচ্চ শ্রেণীতে যে অনুভূতি তা অনেকটা রোমক ঐতিহ্যের কাছাকাছি। অন্যত্র ফরাসি বিপ্লবের আগ পর্যন্ত রাষ্ট্র ছিল রাজতন্ত্রের নামান্তর। প্রথম চার্লসের মুণ্ডুপাত করার পর ইংল্যান্ডে মানুষের মনে রাষ্ট্র এবং রাজতন্ত্র একেবারে আলাদা হয়ে যায়। ১৬৮৮ থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত সময়কালে ইংল্যান্ড ছিল অভিজাতদের প্রজাতন্ত্র। তখন শাসক পরিবারের জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সহজাত বাস্তবিক জ্ঞান ছিল; আর এটাই ছিল সোনালী যুগের রোমকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তারা জনগণের অভাব–অভিযোগ সম্পর্কে নিয়মিত খবর রাখতেন। এতে আমি বোঝাচ্ছি না যে ইংল্যান্ড বা রোমের অভিজাত

www.pathagar.com

শ্রেণী স্বীয় স্বার্থ ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিমূর্তি কনিষ্ঠ ব্রুটাস একটি পৌরসভাকে ৬০ শতাংশ সুদের হারে ঋণ দেয়। কিন্তু উক্ত পৌরসভা সুদ প্রদানে ব্যর্থ হলে তিনি প্রাইভেট বাহিনী গঠন করে উক্ত পৌরসভা অবরোধ করেন। ইংরেজ অভিজাত শ্রেণী জনগণকে বঞ্চিত করার জন্য সংসদের উভয় কক্ষের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কাজে লাগায়। আর প্রকৃত কাজটা করে Enclosoure Acts-এর মাধ্যমে। সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা উক্ত অ্যাক্ট পাশ করিয়ে নেয়। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণী রাষ্ট্রকে তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছে। আজকের ব্যাপক গণতান্ত্রিক যুগে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই এটা করা সম্ভব হবে না।

প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী শিক্ষা মাধ্যম থাকে। ইংরেজ অলিগার্কির জন্য ছিল পাবলিক স্কুল। আর এই স্কুলগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হবে ঈটন–এর। অতঃপর হ্যারো, উনচেস্টার এবং রাগবির নাম করা যায়। এই স্কুলগুলোর মাধ্যমে অষ্টাদশ শতকের অভিজাতদের মানসিকতা দাঁড়ায় সারা উনিশ শতকের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীদের। শাসনতন্ত্রে সুগভীর পরিবর্তন আনয়ন করার পরও এর ব্যত্যয় হয়নি। ইংল্যান্ডে এখনো পাবলিক স্কুল রয়েছে, এবং এখনো সচ্ছল ভদ্রলোকেরা এই স্কুলগুলোকে তাদের ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে গণ্য করেন। সুতরাং আমাদের জাতীয় জীবনে এই স্কুলগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার আবশ্যকতা এখনো ফুরায় নি।

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রিপারেটরি এবং পাবলিক স্কুলগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য: এই স্কুলগুলো খুব অল্প বয়সের ছেলেদের বাড়ির বাইরে বের করে আনে, নারীকুলের প্রভাবমুক্ত হয়, জ্যেষ্ঠদের অন্যায় আচরণ থেকে আত্মরক্ষার কোনো ব্যবস্থা থাকে না, সমবয়সীদের সম্ভাব্য শত্রুতা তাকে মোকাবেলা করতে হয়, মমতার বাসনা নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হয়। প্রথমে সে খুবই অসুখী বোধ করবে, কিন্তু ধীরে–ধীরে, যদি তার অনুভূতি ও বুদ্ধি সাধারণ মানের একটু উপরে না হয়, তা হলে সে 'বর্ম পরিধান' শিখে নেয় এবং নিজেকে কঠিন চরিত্রের বলে জাহির করে। স্কুলে সে সব কিছুর বিনিময়ে শুধু ক্ষমতা ও গৌরবের পেছনে ছোটে; যদি সে ভালো ক্রীড়াবিদ হতে পারে তা হলে প্রচুর সম্মান পাবে, যা পরবর্তীকালে খুবই বিখ্যাত হতে না পারলে আর জুটবে না। স্কুল জীবনের শেষ দিকে কনিষ্ঠতর ছাত্রদের শ্রদ্ধা লাভ এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব খাটানোর অধিকারের জন্য এক সময়ের অসুখী অবস্থার কথা ভুলে যাবে। আর চল্লিশ বছর বয়সের সময় পেছনে তাকিয়ে সে দেখবে যে তার জীবনের সবচেয়ে সুখী সময় কেটেছে স্কুলে। অথচ তার সুখ এসেছে বা এসেছিল অতি তুচ্ছ গুণের জন্য। ফলে পরবর্তীকালে সে অনুরূপ আনন্দ লাভের সুযোগ অন্বেষণ করবে; সে চাইবে জনগণকে শাসন করার জন্য, সে চাইবে জনগণ তাকে ঈশ্বরতুল্য মনে করুক। এজন্যই তারা অসভ্য লোকদের কাছে যায়, অন্তত যাদের অসভ্য জ্ঞান করে তাদের কাছে যায়, সে গড়ে সাম্রাজ্য, স্বদেশী সংস্কৃতি বিদেশে ছড়ায়। অন্ধকারে পশ্চিমী আলোক বহন করে নিয়ে যাওয়া তার প্রধান কর্তব্যকর্ম হিসেবে স্থির করে। যদি 'নেটিভরা' তাকে স্কুল জীবনের কনিষ্ঠতর ছাত্রদের মতো সমীহ করে তা হলে সবই ঠিকঠাক চলে। সে তা হলে দয়ার সাগর ও অপার ক্ষমাশীল, ন্যায়পরায়ণ, কঠোর পরিশ্রমী, একাকিত্ব এবং অস্বাচ্ছন্দ্য ব্যাপারে স্টয়িকসুলভ উদাসীন। স্কুল জীবনে তাকে যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে হয়েছে এখানে তার চেয়ে বেশি বোধ করতে হয়।

কিন্তু যদি 'নেটিভরা' তাকে শ্রদ্ধা করতে ব্যর্থ হয় তা হলে সে বিরূপ মূর্তি ধারণ করে। বর্বরদের সঙ্গে সে সফল হয় সাহস ও ধৈর্যের সাহায্যে, তাছাড়া তার তুলনায় বর্বরদের

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠতা নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু ভিন্ সভ্যতার সাহচর্যে এলে, যেমন প্রাচ্যের সভ্যতা, তার অবস্থা দাঁড়ায় করুণ ও হাস্যকর। আমি প্রাচ্যে এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা পাবলিক স্কুলের উজ্জ্বল নক্ষত্র বলে নিজেদের মনে করে। এতে আমি ইংরেজ হিসেবে লজ্জা বোধ করেছি। আমার দেশবাসী লাল-মুখো, পানাসক্ত, কাজের সময়ে শোষণকারী, পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ, তাছাড়া জানেই না যে প্রাচ্য সভ্যতা নামক কোনো জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে। আমার এই স্বদেশবাসী যদি এমন লোকের সাহচর্যে আসেন যারা শুধু এটাই জানেন না স্বীয় সভ্যতার কী কী বিষয় তাদের জানা দরকার, বরং পাশ্চাত্য সভ্যতার পাবলিক স্কুলের লোকদের চেয়ে অনেক বেশি জানে, তবু এই অসভ্য মূর্খের দল তাদের সামরিক শক্তি দিয়ে কেনা ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণ বজায় রাখবে, আর তাদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য যুদ্ধ জাহাজের বন্দুকগুলো ব্যবহার করে খুশিই হবে। এই ঘৃণ্য বর্বরতার জবাব জাপানিরা দিয়েছে আমাদের কায়দা রপ্ত করে, অবশিষ্ট প্রাচ্য এখন নিষ্ঠার সঙ্গে জাপানের উদাহরণ অনুসরণ করছে। অতএব বলা যায় সাম্রাজ্যবাদের ইঞ্জিন হিসেবে পাবলিক স্কুলগুলো ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

এই ব্যর্থতার কারণ অংশত বুদ্ধিগত, অংশত মনস্তাত্ত্বিক। বুদ্ধিগত দিকটা নিয়ে আগে আলোচনা করা যাক। পাবলিক স্কুলগুলোর মেজাজই হল বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অবজ্ঞা, বিশেষ করে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রতি। শিক্ষকদের প্রধানত নির্বাচন করা হয় তাদের ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্য; তাদের মান্য করে চলতে হবে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক বিধান। আর এগুলোই বুদ্ধিমান লোকদের কাছে দুঃসহ লাগে। শিক্ষকদের দায়িত্ব হল ছাত্রদের সব সময় কাজে ব্যস্ত রাখা, যাতে তারা যৌন অপরাধ না করতে পারে, কিংবা গভীর কোনো চিন্তায় মনোনিবেশ করার ফুরসৎ না পায়। চালাকদের স্বাধীন চিন্তায় নিরুৎসাহিত করাও শিক্ষকদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপরন্তু শিক্ষকদের এটা দেখা দায়িত্ব যে ছাত্ররা যেন বাকি জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। আমাদের পাবলিক স্কুলগুলোর অনেক ত্রুটির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা গেল। পাবলিক স্কুলগুলোর প্রচেষ্টাই হল এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যে ব্যবস্থা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে কিছুতেই সমর্থন করা চলে না।

প্রিপারেটরি এবং পাবলিক স্কুলগুলোর মনস্তাত্ত্বিক ত্রুটির কারণ দুটি। এখানে ছেলেদের নারীসঙ্গ লাভের সুযোগ দেওয়া হয় না, তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়; আর তাদের ওপর প্রথাগত, সেকেলে নৈতিক বিধান চাপানো হয়। ছেলেরা প্রথমত মাতা, ভগ্নি এমনকি সেবিকাদের স্নেহ-আদর পায় না; এই পরিস্থিতিতে মাতারা পরিণত হয় উপাসনার বস্তুতে। বয়ঃসন্ধিকাল উত্তীর্ণ হলে তারা হস্তমৈথুন কিংবা সমকামিতা কিংবা উভয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এদের অনেকেই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে তারা পাপাচার অভ্যাসে পরিণত করেছে। তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতে হয়, যেহেতু কর্তৃপক্ষ যৌন ব্যাপারে বিচ্যুতিকে আতংকের চোখে দেখেন। এই অদ্ভুত অবস্থা মাতার ভাবমূর্তি বাড়িয়ে এমন রমণীতে পরিণত করে যে কেবল স্নেহশীল, এবং কামজ ব্যাপারটা তার মধ্যে একেবারে অনুপস্থিত। এ ধরনের অনুভূতি প্রায়শই সুখী বিবাহ অসম্ভব করে তোলে। এবং যদি কোনো রমণীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়ে ওঠে তবে তার প্রতি বরং ঘৃণাই জন্মে। এই মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অসুখী হলে, অসুখী ব্যক্তির মধ্যে নির্দয়তার ঝোঁক দেখা দেয়, এবং ক্ষমতাকেই সুখের অনন্য উৎস হিসেবে ভাবতে শুরু করে। যৌন অতৃপ্তি সাম্রাজ্যবাদীর মানসিকতা আরো কঠোর করে তোলে।

www.pathagar.com

ইংলিশ পাবলিক স্কুলগুলোর ত্রুটিগুলো হয়তো আভিজাতিক শিক্ষা থেকে পৃথক নয়, তবে যেখানে বংশানুক্রিম সামাজিক প্রতিপত্তিভোগী শ্রেণী রয়েছে সেখানে এই ত্রুটিগুলো থাকবেই। এই শ্রেণীর প্রধান লক্ষ্যই হবে অধিনায়কত্ব লাভ; অতএব এই শ্রেণী বুদ্ধি বা অনুভূতি নয়, চর্চা করবে ইচ্ছাশক্তির। অতীতে ধনসম্পদের জন্য অভিজাত লোকেরা বিলাসী জীবন কাটিয়ে প্রায়ই অকঠোর হয়ে পড়তেন কিংবা উদার মতামত বিকাশের জন্য নমনীয় হতেন। এই বিপদগুলো থেকে মুক্ত হওয়া না গেলে অভিজাত শ্রেণী বেশি দিন টিকবে না। সুতরাং পাবলিক স্কুলগুলোর ভালো ও মন্দ উভয় দিক অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষায় থাকা দরকার। আভিজাত্য বর্তমানে সেকেলে হয়ে পড়েছে, এবং ইংল্যান্ড অভিজাতদের রক্ষা করে উদ্ভটত্বের পরিচয় দিচ্ছে। এই টিকে থাকাকে তুলনা করা চলে সেই প্রাণীর সঙ্গে যে প্রাণী অসম্পূর্ণভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং জননীর পেটের থলির মধ্যে বাস করে। শুধু এই কারণে এক শো বছর আগে ঈটন স্কুলের যে গুরুত্ব ছিল এখন আর তা নেই। আজকের আধুনিক জগতে যে শিক্ষাই স্থান লাভ করুক না কেন কোনোক্রমেই আভিজাতিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্থান হওয়া উচিত নয়।

নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক শিক্ষারও ত্রুটি রয়েছে। এবং তা অভিজাততন্ত্রের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। গণতন্ত্রের দুটি দিক রয়েছে। যখন এটি বলে, 'আমি তোমার মতোই ভালো,' তখন উন্নতিসাধক; যখন বলে, 'তুমি আমার চেয়ে ভালো নও,' তখন সেটা নিষ্পেষণকারী, এবং তা অসাধারণ মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আরো সঠিকভাবে ব্যাপারটা উপস্থাপন করা যায়: আত্মসম্মান জাগালে গণতন্ত্র ভালো বা কল্যাণকর, গোষ্ঠী যদি অসাধারণ ব্যক্তিদের নির্যাতনে উদ্বুদ্ধ করে তা হলে গণতন্ত্র মন্দ বা অকল্যাণকর। এ ধরনের নির্যাতন অভিজাতদের স্কুলেও চলে। অসাধারণ মেধাবী ছাত্রদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। গণতন্ত্রের আওতার মধ্যেই এই নির্যাতন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক রূপ লাভ করে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের চার দেয়াল ছাড়িয়ে বৃহত্তর জগতে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ জীবনের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল খামখেয়ালি লোকদের প্রতি সহনশীলতা, আর অভিজাততন্ত্র সহনশীলতা চর্চা করে থাকে। বায়রন ও শেলিকে সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্রের অধীনে তাদের আরো অনেক বেশি নির্যাতন সহ্য করতে হত। উপরন্তু আভিজাতিক আত্ম-সম্মানের জন্য তারা সামাজিক নির্যাতন কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে পেরেছেন।

যাহোক, এটাই কিন্তু গণতন্ত্রের প্রধান শিক্ষাগত ত্রুটি নয়। আমেরিকায় গণতান্ত্রিক অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র বলে সেখানে এমন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা দুরূহ যা চালাক ছেলেদের প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতে পারে। এ ব্যাপারে সম্প্রতিকালে সামান্য কিছু করা হয়েছে, তবে প্রধানত গণতন্ত্রের বিরোধীরাই এটা করেছেন। এটা তো পরিষ্কার যে কিছু ছেলে অন্যান্য ছেলের চেয়ে বেশি মেধাবী, আর সমধিক মেধাবী ছেলেদের যদি সুখী হতে হয় এবং সমাজের কল্যাণের জন্য যদি তাদের কাজে লাগাতে হয় তবে তাদের গড় ছেলেদের থেকে আলাদাভাবে যত্নের ভেতর তৈরি করতে হবে। কিছু লোককে অন্যান্য লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মনে করা অভিজাততন্ত্রের ত্রুটি নয়। শ্রেষ্ঠতাকে বংশানুক্রমিক মনে করা ত্রুটি। গণতন্ত্রের ত্রুটি এখানে যে, কিছু লোককে শ্রেষ্ঠ গণ্য করলে গোষ্ঠী ক্ষুব্ধ হয়। এবং এই ক্ষোভকে ন্যায়সংগত গণ্য করে। এই গোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় অনেক কাজ সমাধা করতে হলে যে ধরনের যোগ্যতা থাকা দরকার তা অধিকাংশ লোকের নেই। কাজগুলো করার জন্য অসাধারণ ব্যক্তি নির্বাচনের উপায় উদ্ভাবন খুবই জরুরি। আর নির্বাচনের জন্য জরিপটা

www.pathagar.com

তরুণদের মধ্যেই চালাতে হবে। বারো বছরের বালক নির্বাচন করলে আরো ভালো। এদের দ্রুত উন্নতির সুযোগ করে দিতে হবে। শ্রেষ্ঠ ছেলেদের নির্বাচন করা অগণতান্ত্রিক, এই ধারণা থেকে মেধার বিরাট অপচয় হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমরা পুনরায় আলোচনা করব, অতএব এখানে আর অধিক কিছু বলা ঠিক হবে না। এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখব যে গণতান্ত্রিক সরকার নয়, বন্য গণতন্ত্র সকল অসুবিধার উৎস। রাজনৈতিকভাবে ফ্রান্স আমেরিকার মতোই গণতান্ত্রিক, কিন্তু এখানে মেধাবী ছেলেদের বিশেষ যত্নের ভেতর পালন করতে কোনো অসুবিধা হয় না। কারণ এখানে বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক মেধাকে শ্রদ্ধা করা হয়। একজন কৃতিত্বের অধিকারী হলেই শুধু তাকে শ্রদ্ধা করা হয়। মেধা বিকাশের পর্যায়েও একজন মর্যাদা পেয়ে থাকে।

যুদ্ধের আগে মানুষের মনের ওপর হাত ছিল, সেই হাত এখন অদৃশ্য। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শিল্পোন্নত সমাজে মূল ক্ষমতার কিছু কিছু আসন থাকে, এই আসনগুলো ধনিক শ্রেণীর দখলে না থাকলে, আমলাদের দখলে চলে যায়। এই আমলাদের ওপর জনগণের ভাসা-ভাসা নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই নিয়ে থাকে। তা হলে দেখা যাচ্ছে অভিজাততন্ত্র এবং ধনিকতন্ত্রের বাস্তবিক বিকল্প হল আমলাতন্ত্র। অন্যায় সুবিধা ভোগ দূর করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করা হলেও ক্ষমতার ভাগাভাগিতে বৈষম্য থেকেই যাবে। উপযুক্ত ব্যক্তিরাই এই ক্ষমতা লাভ করবে। অবশ্য এই ধনিকতন্ত্র এবং নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের মতো এই ক্ষমতা দায়িত্বহীন হবে না। এই ক্ষমতার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ থাকবে গণতন্ত্রের হাতে। আর ক্ষমতা ব্যবহারের উপযুক্ত লোক গণতান্ত্রিক বা আভিজাতিক কোনো ধরনের শিক্ষাই তৈরি করতে পারবে না। অগণতান্ত্রিক উপাদান গড় দক্ষতা ও জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। এই উপাদানের (অর্থাৎ ব্যতিক্রম ছেলের) অবস্থান তার পিতার সামাজিক মর্যাদার ওপর নির্ভর করে না, স্বীয় যোগ্যতা তার ভরসা। আর এই ছেলেদের হাতে যেহেতু চূড়ান্ত ক্ষমতা, অতএব তাদের নেতৃত্ব প্রদানের বিশেষ ঝোঁক থাকার দরকার করে না। তাদের শুধু দরকার করে সুস্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাদের চেয়ে বুদ্ধিমত্তায় হীন লোকদের বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণগুলো ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা।

এটা পরিষ্কার যে আধুনিক উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির জন্য সমাজ যতই সুগঠিত হয়, আমলাদের গুরুত্ব ততই বাড়তে থাকে। অতএব বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রের জন্য ভবিষ্যৎ আমলাদের সঠিক শিক্ষাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য দরকার, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্তাগণ ছেলেদের স্বকীয় মেধার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন, আর দরকার মেধা শনাক্ত করার উপায় উদ্ভাবন। অধিকতর মেধাবীদের জন্য বিশেষ ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে পারে। তাছাড়া এমন শিক্ষাক্রম তৈরি করতে হবে যাতে ছেলেরা প্রশস্ত, উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয় এবং তারা বিশেষ জ্ঞান লাভ করে। অনুমান করে বলা হয় যে কেজো জ্ঞান সংস্কৃতির পুষ্টি সাধনে অসমর্থ। আর সংস্কৃতি কোনো কাজে লাগে না। এটা একটা বিভ্রম মাত্র। মনে করা হয় যে, পেলোপোনেসিয়ার যুদ্ধের জ্ঞান মানুষকে সংস্কৃতিবান করে, পক্ষান্তরে রুশ বিপ্লবের ইতিহাসজ্ঞান কদর্য এবং নিন্দনীয়। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল কেজো জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে না, সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আমলাদের শিক্ষা হবে বিশেষ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার উপযোগী। তবে এটা কিছুতেই সুস্থ শিক্ষা হবে না যতদিন কোনো জ্ঞান প্রথানুগ বলে বিশেষ মর্যাদা পাবে, কোনো কোনো জ্ঞান মোটেই গুরুত্ব পাবে না, যেহেতু এই জ্ঞান অসার পণ্ডিতদের আয়ত্তের মধ্যে নেই। রেনেসাঁর সময়ে সাহিত্য মূলত লাতিন ও গ্রিক ভাষায় রচিত হয়েছে। এখন আর হয় না। এটা

www.pathagar.com

অধিকাংশ ইংলিশ স্কুল শিক্ষকের জানা নেই, আর বৃটিশ সরকার এখনো ক্লাসিকস-এ ব্যুৎপন্নদের ভেতর থেকে সিভিল সার্ভেন্ট নির্বাচন করে থাকে। অথচ ফরাসি কিংবা জার্মান ভাষার জ্ঞান থাকলে তা অনেক বেশি কাজে লাগতো, তার সাংস্কৃতিক মূল্যও হত অনেক বেশি। সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রথানুগ ধারণার অনুদারতার জন্যই সাধারণ লোকের সংস্কৃতি বাজে ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত সংস্কৃতি হল বিশ্ব নাগরিক হওয়া, একটি খণ্ডিত স্থানকালের নয়; সমাজকে সমগ্রভাবে বুঝতে এটা সাহায্য করে, গোষ্ঠীর লক্ষ্য নির্ণয়ে সাহায্য মেলে, অতীত ও ভবিষ্যতের আলোকে বর্তমানকে দেখতে সাহায্য পাওয়া যায়। যাদের দায়িত্ব ক্ষমতার সুব্যবহার, তাদের কাছে এটা বিস্তারিত তথ্যের মতোই মূল্যবান। মানুষকে কাজের প্রয়োজনে লাগাতে হলে তাকে বিজ্ঞ করে গড়ে তুলতে হবে, আর প্রজ্ঞার আবশ্যিক অঙ্গ হল খোলা মন।

www.pathagar.com

গোষ্ঠীপ্রভাব ও শিক্ষা

ব্যক্তির ওপর শৈশব ও কৈশোরে গোষ্ঠীর প্রভাব চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। চরিত্র গঠনে যে নানা ধরনের ব্যর্থতা আসে তার জন্য দায়ী শিশু যে দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করে সেই দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। অন্যান্য ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তির রুচির সঙ্গে গোষ্ঠীর রুচির দ্বন্দ্ব। একটা বিষয়ে সতর্ক হতে হবে, শিক্ষায় যেন গোষ্ঠীর প্রভাব মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, আর গোষ্ঠীর প্রভাব যেন ক্ষতিকর না হয়ে হিতকর হয়।

অধিকাংশ তরুণ দুই ধরনের গোষ্ঠীর মুখোমুখি হয়। গোষ্ঠী দু'টিকে বলা যেতে পারে বৃহৎ গোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। বৃহৎ গোষ্ঠী কেবল তরুণদের দ্বারা গঠিত হয় না, শিশুর গোটা সমাজ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। শিশুর গৃহই এটা স্থির করে, তবে গৃহ ও স্কুলের মধ্যে সুনিশ্চিত দ্বন্দ্ব থাকলে ব্যতিক্রম হয়। যেমন ঘটে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসিত লোকদের সন্তানদের ক্ষেত্রে। একটা ছেলে বা মেয়ে যে সময়টা স্কুলে কাটায় সে সময়ে স্কুল ছাত্রদের দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চেয়ে বৃহৎ গোষ্ঠী কম মূল্যবান। কয়েকজন লোকের অভ্যাস অনুরূপ হলে তাদের মধ্যে গোষ্ঠী অনুভূতি বিকশিত হয়, আর তা প্রকাশ পায় সহজাত আচরণে। স্কুলের একটি নতুন ছেলেকে কিছুদিন নতজানু হয়ে চলতে হয়, কারণ সে এখনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নি। যারা ইতোমধ্যেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারা নতুন ছেলেদের সন্দেহের চোখেও দেখে। আবার নতুন ছেলের মধ্যে যদি নতুনত্ব কিছুই না থাকে, তা হলে তাকে অবিলম্বে গোষ্ঠীভুক্ত করে নেওয়া হয়। নতুন ছেলেটি তখন গোষ্ঠীর অন্যান্যের মতোই চলতে-ফিরতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আর ছেলেটি ভিন্ন চরিত্রের হলে দুটি ব্যাপারের যে-কোনো একটি ঘটতে পারে; সে গোষ্ঠীর নেতৃপদ লাভ করতে পারে, কিংবা সে নির্যাতনের স্থায়ী শিকারে পরিণত হতে পারে। গুটিকয় মাত্র ছেলে সৎ স্বভাবের সঙ্গে ব্যতিক্রম স্বভাব যুক্ত করে ঈটনের উন্মাদ শেলি'র মতো সনদ-প্রাপ্ত পাগলে পরিণত হয়।

স্বাভাবিক চরিত্রের লোক স্কুল জীবনে সহজাত বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার জন্য কী করা উচিত। আর পরবর্তীকালে সম্মানজনক জীবন-যাপনের জন্য এই উপলব্ধি খুব কাজে লাগে। একটি ক্লাবের কোনো সদস্য যদি এমন কিছু করে যা সঠিক নয়, তা হলে একজন লোকের শৈশব থেকে মনে থাকবে অদ্ভুত বালকদের প্রতি কী আচরণ করা হয়। এবং পরবর্তীকালে বড়দের জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করবে বটে তবে শৈশবে রপ্ত করা আচরণ সবটা কাটিয়ে উঠতে পারবে না। একজন লোক অনৈতিক কাজ করতে পারেন, জেনেশুনে আইনবিরোধী কাজ করতে পারেন; তিনি হতে পারেন

www.pathagar.com

বোধবুদ্ধিহীন, কিংবা বর্বর; উপযুক্ত সময়ে রুক্ষ; তবে সে নিশ্চয় এমন কাজ করবে না যার জন্য ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরা তাকে উপেক্ষা করবে। অবাঞ্ছিত কাজের ধরন অবশ্য নির্ভর করে দেশ, বয়স এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক কাঠামোর ওপর। তবে প্রত্যেক দেশে, সকল যুগে, সকল সামাজিক শ্রেণীতে এ জিনিসটা থেকে যায়।

প্রত্যেক নারী-পুরুষের গোষ্ঠী সম্পর্কে বদ্ধমূল আতংক রয়েছে। স্কুল জীবনেই এই ভীতিটা মনের মধ্যে গেঁথে যায়। অতএব এটা নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পরিণত হয় যে, ছাত্রদের সেই কাজের জন্যই শুধু শাস্তি প্রদান করা যাবে যে কাজের অভ্যাস তাদের আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু এটি একটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ। ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য স্বাভাবিক বিধিমালা মহিমান্বিত কিছু নয়। তাছাড়া গোষ্ঠী সাধারণত ছাত্রদের এমন কাজের জন্য শাস্তি দিয়ে থাকে যে কাজ তার ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত। যেমন, একটি ছেলের মুখে হয়তো বাজে জন্মাদাগ আছে, হয়তো একজনের নিঃশ্বাস নির্মল নয়, এই ছেলেদের স্কুলে অনেক কষ্ট পেতে হয়। এই ছেলেরা যে রীতিমতো ক্ষমার্হ তা একশো ছেলের মধ্যে এক জনেরও মনে হবে না। অথচ এই পরিস্থিতিকে অনিবার্য মনে করা চলে না। আমি মনে করি ছেলেদের ক্ষমাশীল হতে শেখানো যায়। তবে কাজটা দুরূহ বটে। তাছাড়া যে স্কুল-শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে 'তেজী' ভাবটা খুব পছন্দ করেন তিনি এ ব্যাপারে কিছু করবেন বলে মনে হয় না।

ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে না-হলেও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরো গুরুতর ব্যাপার হল যেখানে বৃহৎ গোষ্ঠী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বিরোধী। উদাহরণত, প্রধানত অ-ইহুদির স্কুলে ইহুদিদের দুরবস্থার কথা ধরা যায়। অত্যন্ত উদার সমাজেও অধিকাংশ ইহুদি শৈশবে নির্যাতনের শিকার হতেন, আর এই নির্যাতন, অবমাননার কথা জীবনে ভুলতে পারতেন না, এবং এটা তাদের জীবন ও সমাজ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত করত। একটি ছেলেকে স্বগৃহে ইহুদি হওয়ার জন্য গর্বিত বোধ করা শেখানো যেতে পারে; সে এটা জানতেও পারে যে ইহুদি সভ্যতা পশ্চিমের অধিকাংশ সভ্যতার চেয়ে প্রাচীনতম। উপরন্তু সভ্যতায় সংখ্যানুপাতে ইহুদিদের অবদান অ-ইহুদিদের চেয়ে অনেক বেশি। তথাপি, যখন সে শোনে, অপর বালকেরা উচ্চস্বরে বিদ্রূপ করে বলে 'Sheeny!' কিংবা 'ike!' তখন তার পক্ষে ইহুদি হিসেবে গর্ব বোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এতে স্বগৃহ ও স্কুল-এর বিরোধ তার মনে গেঁথে যায়। এতে তার স্নায়ুর ওপর গভীর চাপ পড়ে, তার মনে সহজাত ভীতি জন্মে। ইহুদি জাতীয়তাবাদ ছাড়াও এই পরিস্থিতির দু'টি প্রচলিত প্রতিক্রিয়া রয়েছে, একটা বৈপ্লবিক, অপরটি মোসাহেবি। এই প্রতিক্রিয়ার চূড়ান্ত দু'টি উদাহরণ হলেন কার্ল মার্ক্স ও ডিসরেলি। মার্ক্স চালু সমাজ ব্যবস্থার প্রতি যে ঘৃণা বোধ করতেন, তিনি ইহুদি না হলে তা বোধ করতেন কি-না সন্দেহ। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত বুদ্ধিমান ছিলেন বলে ঘৃণাটা অ-ইহুদিদের প্রতি নিবদ্ধ না-করে পুঁজিবাদীদের প্রতি নিবদ্ধ করেন। এবং যেহেতু পুঁজিবাদীরা মূলত ঘৃণ্যই ছিলেন, অতএব সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি বাস্তব তত্ত্ব উদ্ভাবনে সমর্থ হন। ডিসরেলি জাতিগতভাবে ইহুদি হলেও ধর্মের দিক থেকে ছিলেন খ্রিস্টান; তিনি পরিস্থিতিটা অন্যভাবে মোকাবেলা করেন। আন্তরিকভাবেই তিনি অভিজাততন্ত্রের চমৎকারিত্ব এবং রাজতন্ত্রের ভাবগাম্ভীর্য পছন্দ করতেন। এই দুটি তন্ত্রে তিনি স্থায়িত্ব বোধ করতেন। বোধ করতেন নির্যাতন থেকে নিরাপদ। তাছাড়া বোধ করতেন সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের শিকারমুক্ত। শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠীর প্রতি ভীতি থেকে কার্ল মার্ক্স হন বিপ্লবী, ডিসরেলি অবলম্বন করেন রক্ষামূলক অনুকরণ। সাধারণ দক্ষতা খাটিয়ে তিনি গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতৃত্ব লাভ করেন, গর্বিত অভিজাততন্ত্রের নেতা হন, তাছাড়া পরিণত হন রাজতন্ত্রের প্রিয়পাত্রে। তাঁর

www.pathagar.com

মূলমন্ত্র প্রকাশ পেয়েছে হাউস অব কমন্সে জীবনের প্রথম বক্তৃতা প্রদানের পর। তাঁকে বক্তৃতা শেষ করতে দেওয়া হয়নি। হাস্য-বিদ্রূপ করে তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হয়। তিনি হাসি মুখে জবাব দেন; 'একটা সময় আসবে যখন আপনারা আমার বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।' অনুরূপ পরিস্থিতিতে জন্মসূত্রে অভিজাত জ্যেষ্ঠ পিট-এর প্রতিক্রিয়া ছিল একেবারে আলাদা। একদিন হাউস অব কমন্সে এই বলে বক্তৃতা শুরু করেন: 'Sugar, sir—। এতে হাউসে গুঞ্জন ও চাপা হাসি শুরু হয়। চারদিকে একবার তাকিয়ে আরো উচ্চস্বরে তিনি পুনরাবৃত্তি করেন; 'Sugar, Sir—। আবার গুঞ্জন, চাপা হাসি শুরু হয়। তৃতীয় বার তিনি ক্রোধ প্রকাশ করে বজ্রস্বরে পুনরাবৃত্তি করেন: 'Sugar, Sir—। এবার কোনো প্রকার গুঞ্জন কিংবা চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল না।

একটি ছেলের সুখ্যাতি কিংবা কুখ্যাতি উভয়ই হতে পারে যদি সে গোষ্ঠীর কাছে পাওয়া লজ্জা মুছে ফেলতে সচেষ্ট হয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে জারজ সন্তানেরা উদাহরণ হিসেবে আসতে পারে। কিং লিয়ার নাটকের এডমান্ড নিজে অবৈধ সন্তান হওয়ার দরুন স্বাভাবিক লোকদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। আমি সাহস করে বলতে পারি উইলিয়াম দ্য কনকার স্বীয় জন্মকলঙ্ক মুছে ফেলতে ইচ্ছুক না হলে অনুরূপ কাজে প্রেরণা বোধ করতেন না।

এতক্ষণ আমরা অস্বাভাবিক ব্যক্তি বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্ট ব্যক্তির ওপর খুবই সাধারণ গোষ্ঠীর প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমরা শৈশবে যে ধরনের গোষ্ঠীর মোকাবেলা করেছি আজকের দিনের গোষ্ঠী তার চেয়ে দুষ্ট ও নির্দয়। ক্রোপটকিন যে অভিজাত স্কুলে পড়তেন সে স্কুলে জার (Czar)-এর প্রিয়পাত্ররা শিক্ষালাভ করতেন। ক্রোপটকিন উক্ত স্কুলের কিছু চমকপ্রদ বিবরণ রেখে গেছেন। উদাহরণত,

> '...উপরের শ্রেণীর ছাত্ররা যা ইচ্ছে তাই করেছে; এই গত শীতেই দেখেছি তাদের প্রিয় কৌতুক ছিল রাতে একটা কক্ষে নিরীহ ছেলেদের জড়ো করা এবং তাদের সার্কাসের ঘোড়ার মতো চারদিকে ঘুরতে আদেশ করা; নিজেরা ভারতীয় রাবারের চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে তাদের ওপর চড়াও হত; বড়োই নির্দয় ছিল কশাঘাত। সে সময়ের নৈতিক উপলব্ধি এবং ছেলেদের উল্লিখিত উপায়ে নির্যাতনের পর তারা যে অসভ্য ভাষায় কথা বলত সে সম্পর্কে কিছু না বলাই ভালো।'

প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের চরিত্রের ওপর স্কুল গোষ্ঠীর প্রভাবকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। এখানে উদাহরণ হিসেবে নেপোলিয়নকে স্মরণ করা যায়। নেপোলিয়ন পড়াশুনা করেন ব্রিয়েনের অভিজাত সামরিক কলেজে, ঐ স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র ছিল ধনাঢ্য এবং উচ্চ পরিবারের। ফ্রান্স রাজনৈতিক কারণে করসিকাকে কিছু ছাড় দেয় বলে নেপোলিয়ন ঐ কলেজে পড়ার সুযোগ পান। একই কারণে করসিকার বেশ কয়েকজন যুবক ব্রিয়েনে বিনা খরচে পড়ার সুযোগ লাভ করেন। নেপোলিয়নের পরিবার ছিল বৃহৎ, আর তার মাতা ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র। তিনি সম্রাট হবার পর সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে আবিষ্কার করা হয় যে নেপোলিয়ন ঘিবেলাইন পরিবারের প্রতিভূ। কলেজে তিনি কম দামের সাদাসিধে পোশাক পড়তেন, অন্য যুবকেরা পড়ত জাঁকালো পোশাক। তাকে কলেজে কোনো প্রকার দামই দেওয়া হত না, তিনি সবার অবজ্ঞা কুড়াতেন। অতঃপর বিপ্লব সূচিত হলে তিনি রাতারাতি বিপ্লবের শুভানুধ্যায়ী হন। বিপ্লবের প্রতি শুভকামনার কারণ হয়তো এই যে ব্রিয়েনে তার সাথীদের গ্লানির ভেতর দিন যাপন করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি সম্রাট হবার পর হিংস্রভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। যে লোক এক সময় তাকে অবজ্ঞা করেছে

www.pathagar.com

এখন সে লোক তাকে অভিবাদন জানাতে চাইলেও তার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ সেই যে, স্নবারি যে তার শেষজীবনের ক্ষমতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করে তার উৎস শৈশবের গ্লানিকর জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা। নেপোলিয়নের মাতার জীবনে গ্লানিকর কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাই তিনি পুত্রের কৃতিত্বকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতেন। তাছাড়া তিনি পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের বেতনের একটা বড় অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতেন। কারণ তিনি জানতেন তার পুত্রের গৌরববরবি একদিন অস্ত যাবে।

মহান সম্রাটদের মধ্যে দু'চারজনের গোষ্ঠীর চাপ সহ্য করতে হয়নি। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট। আলেকজান্ডার সব সময়ই সবার উপরে ছিলেন। কোনো সময়ই কেউ তার সমকক্ষ ছিল না। তার কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার জন্য এটি অংশত দায়ী বলে মনে হয়। স্কুলের নতুন ছাত্রদের মতো বিনয়বশত কোনো প্রকার বড়ো চিন্তা থেকে তিনি বিরত হতেন না। আলেকজান্ডার যে দিগ্বিজয়ী বীর হবেন এতে কোনো সন্দেহ ছিল না। আলেকজান্ডার দেখেছেন তার সময়ের যে কারো চেয়ে তার নিজের যোগ্যতা অনেক বেশি, অতএব তার নিজেকে ঈশ্বরতুল্য ভাবা অমূলক ছিল না। তিনি নিজের নিকটতম বন্ধুর অধিকারও স্বীকার করতেন না। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে তিনি যে পারমেনিও এবং ক্লোইটাসকে হত্যা করেন তা অত্যাচারী শাসকের নির্দয় কাজ বলেই মনে হবে। তবে ব্যাপারটার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব। আলেকজান্ডার কখনো গোষ্ঠীতন্ত্রের শিকারে পরিণত হন নি। ফলে তার মধ্যে ধৈর্যের অভাব থাকাটাই স্বাভাবিক।

উপরের উদাহরণগুলো তুলে ধরার কারণ একটিই। দেখানোর চেষ্টা করেছি যে চরিত্র গঠনে স্কুল গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদি কোনো ব্যক্তি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক হন তা হলে তাকে তিনি যে গোষ্ঠী তৈরি করবেন তার চরিত্র সম্পর্কে অধিক ভাবতে হবে। অপরাপর উপাদান নিয়ে কম ভাবলেও চলবে। প্রতিষ্ঠাতা নিজে যদি দয়ালু এবং সহনশীল হন, স্কুল গোষ্ঠীকে নির্দয় ও অসহিষ্ণু হবার অনুমতি দেন, তা হলে ছেলেরা মেধা থাকা সত্ত্বেও বেদনাদায়ক পরিস্থিতির শিকার হবে। আমি মনে করি, অনেক আধুনিক স্কুলে হস্তক্ষেপ না-করার নীতি এতটা কঠোরভাবে পালন করা হয় যে সেখানে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব সহজেই হতে পারে। ছেলেদের কাজে-কর্মে বয়স্করা যদি মোটেই হস্তক্ষেপ না-করেন তা হলে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেরা অন্যান্যের ওপর অত্যাচার চালাবে, ফলে স্বাধীনতা প্রদান করাই শুধু হবে, তার সুফল মিলবে না। শারীরিকভাবে সকল ছেলেরা অন্যায় রাজত্ব কায়েম করবে। অবশ্য প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বয়স্কদের অন্যায় আচরণ ঠেকানো দুষ্কর। যদি প্রবীণরা বয়স্ক ছেলেদের ওপর বল প্রয়োগ করে তা হলে তারা অপেক্ষাকৃত কম বয়স্কদের ওপর বলপ্রয়োগ করবে। আসলে দরকারি কাজটি হবে এটা দেখা যে গোষ্ঠীর চাপ যেন সম্ভাব্য নিম্ন পর্যায়ে থাকে। শারীরিক শক্তির আধিপত্যও যেন প্রবল না হয়। ছেলেমেয়েদের সমবয়সীদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের নিয়মগুলো যদিও শেখা দরকার, কিন্তু তাদের গোষ্ঠীর অতি চাপের সম্মুখীন হওয়া ঠিক হবে না। গোষ্ঠীর চাপ বিচার করতে হবে দুটি দিক থেকে; প্রথমত চাপের তীব্রতা, দ্বিতীয়ত চাপের ধরন। যদি চাপ খুব তীব্র হয়, তা হলে যে ব্যক্তি তৈরি হয় সে দুর্বলচিত্ত ও গতানুগতিক চরিত্রের না হয়ে পারে না। নগণ্য ব্যতিক্রম থাকতে পারে, তবে ব্যতিক্রম ধর্তব্য নয়। গোষ্ঠীর নৈতিক জ্ঞান সুন্দর হলেও এটা বড়োই দুঃখজনক। Tom Brown's Schooldays পুস্তকে পাই : একটি ছেলেকে প্রার্থনা করার জন্য লাথি মারা হলো। এই পুস্তকের প্রতিক্রিয়া ছিল গভীর। আমার সমকালের একজনকে জানি, সে প্রার্থনা 'না' করার জন্য লাথি খেয়েছিল। আমি দুঃখের সঙ্গে

www.pathagar.com

জানাচ্ছি যে, ঐ লোক সারাজীবন নাস্তিক থেকে যান এবং নাস্তিক হিসেবে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফলে দেখা যাচ্ছে গোষ্ঠীর খবরদারির অত্যন্ত ভালো দিক থাকলেও, খবরদারিটা বেশি হলে তা অবাঞ্ছনীয় হয়ে দাঁড়ায়। হস্তক্ষেপ অতিরিক্ত হলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিনিষ্ট হয়, এবং সভ্যতা সংগঠনে দরকারি বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য প্রভৃতির প্রতি উৎসাহ তৈরিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। আবার, অস্বীকার করার যো নেই, গোষ্ঠীর পরস্পরের ভেতর প্রতিযোগিতার অনেক ভালো দিক রয়েছে। এতে শারীরিক বল বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ পাওয়া যায়, মনের পরিধি প্রসারিত হয়, নীচু ভাবটা দূর করার প্রেরণা মেলে। অতএব দেখা যাচ্ছে, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গোষ্ঠীর লক্ষ্য মঙ্গলজনক হলে প্রতিযোগিতা খুবই ভালো। আর যদি ক্রোপটকিন বর্ণিত ছেলেদের মতো হয় তা হলে সর্বনাশ। অসাধারণ মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ স্কুল থাকার অন্যতম সুবিধা এখানে যে, এসব স্কুলের গোষ্ঠীর অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব এবং বিজ্ঞান, কলা ও সাহিত্যচর্চার প্রতি কম শত্রুভাবাপন্ন হবে। তবু একেবারে সাধারণ ছেলেমেয়েদের বেলায়ও উপযুক্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে তাদের সহনশীল ও দয়ালু করা যায়। তাছাড়া নাটকের মতো সামষ্টিক উদ্যোগেও তাদের উৎসাহী করে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রে যূথচর প্রবৃত্তি সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করে, এবং মোটেই উগ্রতা প্রদর্শন করে না।

অত্যন্ত সবল চরিত্রের লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ কারণে গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন, এবং তার শিক্ষাগত মূল্য থাকবে। এতে একজনের ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং সে আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে। যদি গোষ্ঠী তাকে দুর্ভোগের শিকারে পরিণত না করে, তা হলে ব্যক্তির বিদ্রোহ মঙ্গলজনক হয়; কিন্তু গোষ্ঠী যদি তাকে অসুখী করে তোলে তা হলে সে নতজানু চরিত্রের হয়ে পড়বে এবং তার চরিত্রের চমৎকারিত্ব হারিয়ে ফেলবে। আবার তার মধ্যে ধ্বংসাত্মক ক্রোধ জন্ম নিতে পারে। আর এই ক্রোধ হয়তো জগতের বিরাট ক্ষতি করে বসবে। এ ক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যেতে পারে।

স্কুলের বাইরের বৃহত্তর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, অগতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিভাবকেরা এমন হতবুদ্ধিকর অবস্থার মুখোমুখি হন যে, তাদের অনেকের পক্ষেই হতবুদ্ধিকর অবস্থা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। যদি তারা তাদের সন্তানদের এমন স্কুলে পাঠান যেখানে অগতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি উৎসাহিত করা হয় কিংবা খুব বেশি স্বাধীনতা প্রদান করা হয় তা হলে তাদের মধ্যে এই ভীতি কাজ করে যে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তারা ভবিষ্যতে সহজে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না। যাদেরকে যৌন ব্যাপারে চিন্তা ও কথা বলার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তাদের স্বল্পবাক ও যৌন ব্যাপারে চাপা ব্যক্তিদের দ্বারা নিষ্পেষিত হতে হয়। যাদের দেশপ্রেম সম্পর্কে ছবক দেওয়া হয়নি তাদের কাছে এই জাতীয়তাবাদী জগতটা কঠিন মনে হবে। যাদের আইনানুগ কর্তৃপক্ষকে ভক্তি করতে শেখানো হয়নি তারা স্বাধীনভাবে সমালোচনা করার অভ্যাসের জন্য অসুবিধায় পড়বে। এক কথায় বলতে গেলে, স্বাধীনভাবে চলাফেরায় অভ্যস্ত লোকেরা পরবর্তীকালে নিয়ন্ত্রিত জীবন কাটাতে হলে অধিক অসুবিধা বোধ করবে। জন্ম থেকেই যে ক্রীতদাস তার কাছে নিয়ন্ত্রণ বা অধীনতা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। উদার মানসিকতার অধিকারী অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য অনুদার শিক্ষানীতির পক্ষে এ ধরনের যুক্তিই উপস্থাপন করে থাকেন।

উপর্যুক্ত যুক্তির বিপক্ষে অবশ্য দুটি জবাব উপস্থাপন করা চলে। একটি জবাব হবে তুলনামূলকভাবে ভাসা-ভাসা, অপরটি মৌলিক। প্রথম জবাবটি এভাবে দেওয়া যায় যে, তরুণেরা তাদের বাহ্যিক আচরণ সহজে পরিবর্তন করতে পারে। বস্তুত এটা প্রথানুগ সকল

www.pathagar.com

স্কুলে শেখানোও হয়। এখানে ছেলেরা শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে যে আচরণ করে নিজেরা পরস্পরের সঙ্গে সে আচরণ করে না। তরুণ বয়সে খাপ খাইয়ে চলতে শেখা খুবই সহজ। আসলে এটি কতকাংশে শিষ্টাচারের ব্যাপার মাত্র। কোনো মুসলমানের কাছে হজরত মুহম্মদ-এর বিরুদ্ধে কিছু বলা শিষ্টাচার বিরোধী হবে, কিংবা অপরাধ আইনের বিপক্ষে কোনো বিচারককে কিছু বলা ঠিক হবে না। হয়তো আমাদের সামাজিক দায়িত্ব হল এসব বিষয়ে সাধারণ্যে খোলাখুলি মতামত প্রকাশ, কিন্তু এমন কোনো আড্ডায় বা বৈঠকখানায় বলা উচিত না যেখানে কেউ আহত বোধ করবে কিংবা ক্রুদ্ধ হবে। আমি মনে করি না যে মুক্ত শিক্ষার ফলে বালক-বালিকারা শিষ্টাচার অর্জন করবে না কিংবা প্রচলিত জীবন-যাপনের জন্যে যতটুকু বাহ্যিক শালীনতা অর্জন করা দরকার তা অর্জনে সক্ষম হবে না। আমি এমনও মনে করি না যে, মুক্ত শিক্ষা গ্রহণের পর সাংসারিক জীবনে মানিয়ে চলতে যে কষ্ট হয় তা প্রথাগত শিক্ষার অধিক। প্রকৃতপক্ষে প্রথাগত শিক্ষাই অতিরিক্ত জটিলতা সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় জবাবটা গভীরতর। এই জগতে অনেক গুরুতর অকল্যাণ বিদ্যমান। এগুলো সদিচ্ছা ছাড়া দূর করা যাবে না। যারা এই অকল্যাণগুলো দূর করার জন্যে কিছু করতে চান তাদের প্রাত্যহিক জীবন খুব সুখের হবে না। অন্তত যারা স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী তাদের চেয়ে এদের জীবন অধিক কষ্টের হবে। কিন্তু প্রাত্যহিক সুখের পরিবর্তে তারা এমন কিছু পাবেন যার মূল্য অনেক অনেক বেশি। তারা সর্বদা সচেষ্ট জগতটা সাধ্যমতো কম যন্ত্রণাকর করে তোলার জন্য। এরা মূল্যের ন্যায্য প্রতিমান তুলে ধরতে পারেন যা একজন আপোসকামীর পক্ষে সম্ভব হয় না। তাদের মধ্যে এই বোধ কাজ করে যে তারা এমন লোকের সঙ্গে বাস করেন যারা জগতটাকে অচলায়তনে পরিণত করতে দেবেন না, দেবেন না হতাশায় নিমজ্জিত হতে। অলস সন্তুষ্টির চেয়ে এটা অনেক ভালো। আর মুক্ত শিক্ষা যদি এক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখতে পারে তা হলে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের জন্য এই পথটিই বেছে নিতে পারেন। সাময়িক বা আকস্মিক যন্ত্রণার ভয়ে ভীত হলে চলবে না।

www.pathagar.com

শিক্ষা ও ধর্ম

ধর্ম একটি জটিল বস্তু, এর ব্যক্তিক এবং সামাজিক উভয় দিক রয়েছে। আর ঐতিহাসিক সময়ের সূচনাতেই ধর্ম পুরাতন ব্যাপারে পরিণত হয়ে গেছে। সমগ্র ইতিহাসে সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে ধার্মিকতার হ্রাস সম্পর্কযুক্ত ছিল। আমাদের জানা প্রাচীনতম ধর্মগুলো ব্যক্তিক নয়, সামাজিক ছিল; গোত্রের লোকদের আচরণের ভালো-মন্দ দিকের বিচার করে অতিলৌকিক শক্তি পুরস্কার দিতেন কিংবা শাস্তি প্রদান করতেন। অতিলৌকিক শক্তির কাছে কোন কোন আচরণ ভালো আর কোন কোন আচরণ মন্দ তা নির্ণয় করা হত অনুমানের ওপর নির্ভর করে; আবার এসবের বিস্তারিত বিবরণ পুরোহিতের খাতায় লিখে রাখা হত। কোনো এলাকার অধিবাসীরা যদি ভূমিকম্পে কিংবা মড়কে নির্বংশ হয়ে যেত তা হলে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুসন্ধান করে নির্ণয় করতেন তাদের কোন কোন অভ্যাস আপত্তিজনক এবং ভবিষ্যতে ঐ অভ্যাসগুলো এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আজকের দিনেও কতকাংশে চালু আছে, একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। চার্চ অব ইংল্যান্ডের জনৈক ভিকারকে আমি জানতাম, এই যাজক মহাশয় মনে করতেন মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ হল হায়ার ক্রিটিসিজম (Higher Criticism) জার্মানদের কাছে খুবই প্রিয়; অথচ ঐ যাজক মহাশয়ের মতে মূল বাইবেলের ব্যাখ্যা ব্যাপারে সৃষ্টিকর্তার আপত্তি রয়েছে। অর্থাৎ কি-না মূল বাইবেলের ভাষ্য রচনা করা চলবে না।

ধর্মের প্রবক্তারা মনে করেন ধর্ম থেকে আমরা সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান লাভ করে থাকি। কোনো ব্যক্তি যদি এমন কিছু করেন যা দেব-দেবীদের কাছে নিতান্ত অপ্রিয় লাগবে, তা হলে তারা শুধু ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নয়, গোটা সমাজকে শাস্তি প্রদান করতেন। ফলে উক্ত ব্যক্তির আচরণ গোটা সমাজের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াত। যেহেতু ব্যক্তির অপরাধের জন্য গোটা সমাজকে ভোগ করতে হত চরম দুর্দশা। আজকের দিনেও এই ধারণা অপরাধ আইনের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। কিছু কিছু যৌনবিকৃতির জন্য মানুষকে কারাভোগ করতে হয়; অথচ যৌক্তিক বিচারে অপরাধটা ব্যক্তির নিজস্ব; উক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারটা ন্যায্য করে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হলে সিটিস অব দ্য প্লেইনের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তার ওপর ভিত্তি করে ন্যায্য করতে হবে। আর তা করা হলেই শুধু ব্যক্তির অপরাধে সমাজের কিছু এসে যাবে। মজার ব্যাপার হলো: যে যে আচরণের জন্য দেবতারা নাখোশ হন তা কমই ক্ষতিকর। শুধু দেবতারা ক্রোধান্বিত না হলেই সব ঠিকঠাক চলবে। দেবতারা শূকর ও গরু ভক্ষণে আপত্তি করেন। একজনের স্ত্রী মারা গেলে মৃত স্ত্রীর বোন বিয়ে করাতেও আপত্তি থাকে। রাজা ডেভিডের সময় ঈশ্বর লোক-গণনায় আপত্তি

www.pathagar.com

জানিয়েছিলেন; এবং মড়ক লাগিয়ে এত বেশি লোক কতল করেছিলেন যে রাজা ডেভিডের পরিসংখ্যান মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অজটেকদের দেবতারা পূজারীদের প্রতি করুণাশীল হতেন যদি তারা নরবলি দিতেন এবং নরমাংস ভক্ষণ করতেন। তথাপি, ধর্ম থেকে পাওয়া নৈতিক বিধিমালা অদ্ভুত হলেও ধর্মের জন্যই আমরা একটা নৈতিক বিধিমালা পেয়েছি। যদি কিছুই না থাকার চেয়ে যে কোনো নৈতিক বিধি থাকা ভালো হয়, তা হলে বলতেই হবে যে ধর্ম এক্ষেত্রে শুভশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

সামাজিক ব্যাপার হিসেবে ধর্মের সূচনা হলেও, প্রথম যুগেই ব্যক্তিক ব্যাপার হিসেবেও ধর্ম বিকশিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পৃথকভাবে বেশ কিছু ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই ধর্মগুলোর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির আত্মা। আর খ্রিস্টানরা যাকে মোক্ষ বলে তাও এই ধর্মগুলোর লক্ষ্য ছিল। চিনের তাওবাদ, ভারতের বুদ্ধধর্ম, গ্রিসের অর্ফিক ধর্ম এবং হিব্রু প্রফেটদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ছিল। এদের মনে হয়েছে যে স্বাভাবিক, প্রকৃতি–নির্ধারিত জীবন দুঃখপূর্ণ। অতএব এমন পথ খুঁজে বের করতে হবে যে পথ অনুসরণ করে দুর্ভাগ্য এড়ানো যাবে কিংবা সহনশীল করে তোলা যাবে। ষষ্ঠ শতকের কিছুকাল পর সময়ের অবাস্তবতা এবং সকল বস্তুর অভিন্নতা মতবাদের ওপর ভিত্তি করে পারমিনাইডস একটি ধর্মভিত্তিক দর্শনের বিরাট ঐতিহ্য গড়ে তোলেন। এঁর উত্তরসূরিরা হলেন প্লেতো, প্লতিনাস, ফাদারগণ, স্পিনোজা, হেগেল, বার্গসঁ এবং রহস্যবাদী সকল দার্শনিক। হিব্রু প্রফেটদের ধর্মগুলোর লক্ষ্য হল ন্যায়পরায়ণতা; পরাবিদ্যা নিয়ে তারা কম ভাবিত; প্রটেস্টান্টধর্মে এই ব্যাপারটার প্রাধান্য খুব বেশি লক্ষ করা যায়। খ্রিস্টধর্ম বিভিন্ন সংঘে বিভক্ত হয়ে গেছে; কিন্তু নৈতিক ও অধিবিদ্যক উপাদান সবগুলোতেই বিদ্যমান। এর কারণ হল খ্রিস্টধর্ম জন্ম নিয়েছে ইহুদি ধর্ম ও হেলেনিজমের সমন্বয়ে। তবে, সর্বোপরি, খ্রিস্টধর্ম যতোই পশ্চিমের দিকে সরে গেছে ততই অধিবিদ্যক উপাদান ঝেরে ফেলে বেশি করে আকড়ে ধরেছে নৈতিকতা। পারশ্য ব্যতিরেকে সর্বত্রই ইসলাম ধর্মে অধিবিদ্যক উপাদান সব সময়ই সামান্যই ছিল। আবার ভারতের সবগুলো ধর্মের মধ্যে দার্শনিকতার প্রাধান্য সুস্পষ্ট।

ব্যক্তির ধর্মের উত্থানের পর থেকেই ধর্মীয় জীবনে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানের মধ্যে দ্বন্দ্বসংকুল অবস্থা বিরাজ করছে। প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান স্বাভাবিক কারণেই রাজনীতির দিক থেকে সবলতর। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানের সমর্থনে সব সময়ই পুরোহিত, প্রথা, সরকার, আইন ইত্যাদি দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তির ধর্ম ব্যক্তির ব্যাপার, এর সঙ্গে সমাজ কোনো দিক থেকেই সম্পর্কান্বিত নয়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিরাট রাজনৈতিক গুরুত্বের। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিদ্যমান সেখানে ধর্মের সঙ্গে সম্পত্তির সম্পর্ক রয়েছে। আর একজন লোক উক্ত ধর্মের বিধানগুলোর পক্ষে গলাবাজি করে জীবিকা উপার্জন করতে সক্ষম। কিন্তু ধর্মের বিরোধিতা করে (অত সহজে) জীবিকা উপার্জন করা যায় না। শিক্ষা ধর্ম দ্বারা যতটা প্রভাবিত হোক না কেন তার সবটাই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রভাব। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম প্রাচীন ভিত নিয়ন্ত্রণ করে; পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নিয়ন্ত্রণে। বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশের ধনীর সন্তানের শিক্ষার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে ধর্ম। দরিদ্রের সন্তানের শিক্ষার ওপর ধর্মের প্রাধান্য তুলনায় অনেক কম। এটা কতকাংশে রাজনৈতিক দুর্ঘটনা মাত্র; যেখানে ধর্ম রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব খাটানোর মতো যথেষ্ট সবল নয় সেখানে রাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ গোষ্ঠীর মতবাদ বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে পারে না। কিন্তু স্কুল যদি কেবল ছাত্র বেতনে চলে তা হলে অভিভাবকরা শিক্ষার বিষয়ের ওপর প্রভাব খাটাতে সমর্থ হন। প্রধানত এই কারণেই ইংলন্ড ও ফ্রান্সের ধনীর সন্তানেরা শহুরে দরিদ্র

www.pathagar.com

লোকের সন্তানদের চেয়ে অধিকতর ধর্মভাবপুষ্ট হয়। যখন আমি বলি যে তারা 'ধর্মভাবপুষ্ট', তখন কথাটা রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহার করি। আমি বলি না যে তারা ধার্মিক কিংবা তারা খ্রিস্টধর্মের প্রতি অধিবিদ্যক সম্মতি দিয়ে থাকে। আসলে তারা গির্জার প্রতি সমর্থন দিয়ে থাকে, আইনগত প্রশ্ন দেখা দিলে গির্জার পক্ষে ভোট দেয়। আর অভিভাবকরা চান যে তাদের সন্তানরা ধার্মিক খ্রিস্টানের যত্নে লালিত-পালিত হোক। একারণেই গির্জার গুরুত্ব এখনো টিকে আছে।

মুক্ত ও উদার মনের সাধারণ লোকেরা প্রায়ই বলে থাকেন যে সমাজ জীবনে গির্জার গুরুত্ব এখন আর বড় ব্যাপার নয়। এই ধারণা একেবারে ভুল। বর্তমানে বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের যে আইন তা পাদ্রীদের সম্পূর্ণ মনোপূত না হলেও এতে নানা অসংগতি এবং ক্রুরতা রয়ে গেছে। যেমন মানসিক ভারসাম্যহীনতার জন্য বিবাহবিচ্ছেদ প্রার্থনা করা হলে অগ্রাহ্য করা হয়। গির্জার প্রভাব না থাকলে বিবাহবিচ্ছেদের আইন এক সপ্তাহও টিকত না। খ্রিস্টধর্মের বিরোধীদের অসুবিধা ধার্মিক কিংবা সতর্ক লোকদের চেয়ে অনেক বেশি। বস্তুত ঘোষিত নাস্তিকদের জন্য চাকুরির অনেক দরজা একেবারে বন্ধ; জীবনে সাফল্য লাভের জন্য সাধারণ লোকের চেয়ে নাস্তিকদের অধিকতর দক্ষ হতে হয়, তাদের পরিশ্রম করতে হয় অনেক বেশি।

আজকের দিনে অন্য যে কোনো ক্ষেত্রের চেয়ে শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গুরুত্ব অনেক বেশি। ইংল্যান্ডের সকল পাবলিক স্কুল এবং অধিকাংশ প্রিপারেটরি স্কুল অ্যাংলিক্যান কিংবা রোমান ক্যাথলিক। অনুরূপ স্কুলে অভিভাবকেরা শিক্ষার জন্য নিজের সন্তানকে পাঠান, কিন্তু নিজে মুক্ত-চিন্তায় বিশ্বাসী। অভিভাবকরা বলে থাকেন যে, অধিকাংশ লোক প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধে এক সময় ক্ষেপে যায়। অতএব ছাত্রদের মিথ্যা কথা শেখানো অমঙ্গলজনক নয়। কারণ তাদের মধ্যে এক সময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবেই, তখন তারা যা সত্য তাই বিশ্বাস করবে। এ ধরনের যুক্তি গতানুগতিকের পক্ষে যাওয়ার অজুহাত মাত্র। একটু চিন্তা করলেই ধরা পড়বে এটা পরিসংখ্যানের দিক থেকে ভ্রমাত্মক। বস্তুত অধিকাংশ লোক যুবাবয়সে যা শেখে ভবিষ্যত গোটা জীবনে তাই বিশ্বাস করে চলে। এক একটি দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রটেস্টান্ট, ক্যাথলিক, মোহামেডান রয়ে গেছে। প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব সঠিক হলে প্রতি যুগে প্রতিটি দেশের ধর্মের পরিবর্তন ঘটত। যারা প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বে বিশ্বাস করে সন্তানদের উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে পাঠান তারা নিজেরা স্বীয় আচরণ দ্বারা এ পর্যন্ত কতটুকু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন? যদি আপনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করেন দুয়ে দুয়ে চার হয়, কিন্তু এই অভিমত ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকেন, আর যদি মেনে নেন জনগণের টাকায় আপনার এবং অন্যান্যের সন্তানদের দুয়ে দুয়ে পাঁচ হয় শেখানো সঠিক, তা হলে আপনার কার্যকরী অভিমত দাঁড়ায় দুয়ে দুয়ে পাঁচ হয়; আর আপনি যে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করেন দুয়ে দুয়ে চার হয়, সেই বিশ্বাসের কোনো গুরুত্ব থাকে না। তা হলে দেখা যাচ্ছে, যারা ধর্মভাবপুষ্ট নন অথচ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান বাঞ্ছনীয় মনে করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই; অন্তত কার্যকরী প্রতিক্রিয়া যে নেই তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অনেকে বুদ্ধিগত দিক থেকে ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণ করেন না, অথচ মনে করেন ধর্ম ক্ষতিকর নয়, এবং হয়তো হিতকরও। এ ব্যাপারে আমি গোঁড়াদের পক্ষেই থাকব, তথাকথিত 'উদার' চিন্তাবিদদের পক্ষে নয়। আমার কাছে মনে হয় ঈশ্বর আছে কি-না কিংবা মরণোত্তর জীবন আছে কি-না এ ধরনের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য আমি রাজনীতিবিদদের এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি না যে ঈশ্বর না থাকলেও সাধারণ জনগণের উচিত

www.pathagar.com

ঈশ্বরে বিশ্বাস করা। কারণ হিসেবে বলা হয়, এই বিশ্বাসটা থাকলে নাকি মানুষ সদাচারী হয়। অনেক অভিভাবক মনে করেন ছেলেদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান না করলে তারা শিষ্টাচারী হবে কী করে? এরাই আবার নিজেদের মুক্ত মনের বলে দাবি করেন। আমি বলি, ছেলেদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জেনে-শুনে মিথ্যা কথা শিখিয়ে তাদের শিষ্টাচারী করে গড়ে তুলবেন কি করে? আন্তরিকভাবে কাম্য কোনো আচরণের জন্য মিথ্যা বিশ্বাস মোটিভ হিসেবে দরকার করবে কেন? যাকে আপনি 'সৎ' আচরণ বলে বিবেচনা করেন তার পক্ষে যদি বৈধ যুক্তি না থাকে তা হলে তো মনে করতে হবে যে 'সৎ' সম্পর্কিত আপনার ধারণাটাই ভুল। তাছাড়া ধর্ম তো সন্তানদের আচরণ প্রভাবিত করে না, সন্তানের আচরণ প্রভাবিত করে পিতামাতার কর্তৃত্ব। ধর্ম আসলে যা করে তা হলো, এটা ছেলেদের নির্দিষ্ট কিছু আবেগের অধিকারী করে, আবার উক্ত আবেগগুলো ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়ও নয়। সন্দেহ নেই, পরোক্ষে এই আবেগগুলো আচরণ প্রভাবিত করে, তবে তা কোনো মতেই ধর্মীয় শিক্ষকরা যা প্রত্যাশা করেন তার ধারে-কাছে পৌঁছতে পারে না। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আরো কিছু আলোচনার অবতারণা করা হবে।

ধর্মীয় শিক্ষার মন্দ প্রতিক্রিয়া অংশত নির্ভর করে নির্দিষ্ট কিছু মতবাদের জন্য, অংশত নির্ভর করে কিছু-কিছু অস্পষ্ট প্রস্তাবনা সত্য বলে চালিয়ে দেওয়া হয় বলে। হয়তো এই প্রস্তাবনাগুলো সত্য কি মিথ্যা তা কোনোদিনই জানা যাবে না, কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষকরা এই প্রস্তাবনাগুলো সত্য বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, তাতে ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, ধর্মীয় শিক্ষকরা ছাত্রদের মিথ্যা কিছু শেখাচ্ছেন। উদাহরণত, ভবিষ্যৎ জীবনের কথা তোলা যায়। এ বিষয়ে বিজ্ঞ লোকেরা তাদের অজ্ঞতা কবুল করেন। কারণ এ বিষয়ে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুলতবি রাখাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। অথচ খ্রিস্টধর্ম ভবিষ্যত জীবনের পক্ষে ঘোষণা দিয়েছে। আর ছাত্রদের বিশ্বাস করানো হচ্ছে যে মরণোত্তর জীবন সুনিশ্চিত ঘটনা। পাঠকরা সমস্বরে বলতে পারেন: "এতে কি যায় আসে? এই বিশ্বাস স্বাচ্ছন্দ্য আনে এবং এটা কোনো ক্ষতি করতে পারে না।" আমি জোর দিয়ে বলব যে এটা নিম্নলিখিত উপায়ে ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

প্রথমত, অসাধারণ মেধাসম্পন্ন কোনো ছেলে আবিষ্কার করবে যে অমরত্বের ধারণা সুনিশ্চিত নয়, কিন্তু শিক্ষক তাকে এক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করবে, এমনকি তাকে শাস্তিও প্রদান করতে পারেন। অন্যান্য ছেলেরা অনুরূপ চিন্তা শুরু করার জন্য উৎসাহ বোধ করবে তবে তাদের মধ্যে এ বিষয়ে মত বিনিময় নিরুৎসাহিত করা হবে এবং সম্ভব হলে তাদের এমন পুস্তক পাঠে বিরত রাখা হবে যে পুস্তক পড়লে অবশ্যই অনেক কিছু জানা যাবে, এমনকি যুক্তিশীল হওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু যাদের বুদ্ধিমত্তা গড় ছেলেদের চেয়ে অনেক উপরে তারা আজকাল খোলাখুলিভাবে কিংবা গোপনে অজ্ঞেয়তাবাদী (agnostic), ফলে ধর্মধ্বজ শিক্ষককে হতে হয় একেবারে নির্বোধ কিংবা খাড়া ভণ্ড; কিন্তু তারা যদি ব্যতিক্রমী চিন্তায় অভ্যস্ত বলে বুদ্ধিজীবীসুলভ চিন্তায় সমর্থ হন কিন্তু কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম না হন তা হলে ব্যাপারটা ভিন্ন হতেও পারে। অবশ্য বাস্তবে যা ঘটে তা হল এই, যারা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন তারা শুরুতেই মনস্থ করেন যে কখনো দুঃসাহসিক চিন্তায় অবতীর্ণ হবেন না। তারা হয়ে পড়েন ভীরু এবং প্রথানুগ, প্রথমে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে, পরবর্তীতে যে কোনো বিষয়ে। লেজ কাটা খেঁকশেয়ালের মতো তারা ছাত্রদের বলেন যে ভীরু এবং প্রথানুগ হওয়া কল্যাণকর। এমনি করে কিছুকাল চলার পর তারা কর্তৃপক্ষের

www.pathagar.com

চোখে পড়েন, আর কর্তৃপক্ষ তাদের ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। যারা শিক্ষক হিসেবে চাকুরি রক্ষা করে চলতে পারেন এবং স্বীয় পেশায় সাফল্য অর্জন করেন, তারা কর্তৃপক্ষের কাছে ধর্মতাত্ত্বিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এরা স্বাধীন ভাবে চিন্তায় অসমর্থ। আর ছাত্রদের যারা বুদ্ধিগত নৈতিক দিক দিয়ে উদ্দীপিত করতে সমর্থ তাদের শিক্ষকতার পেশায় ঢুকতে দেওয়া হয় না।

তৃতীয়ত, কোনো প্রস্তাবনাকে যদি পবিত্র এবং তর্কাতীত গণ্য করা হয় তা হলে ছাত্রদের বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা যাবে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম কথাই হল কোনো কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করা যাবে না। আর এটা মেনে নিতে হবে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ যে কোনো পথে পরিচালিত করতে পারে। যদি কোনো নীতি সংরক্ষণ করার দরকার করে তা হলে প্রাথমিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ঐ নীতিকে আবেগ ও ট্যাবু দ্বারা আবৃত করা। আর জোর গলায় প্রচার করা যে ঐ নীতিতে বিরাট সত্য রয়েছে। তাছাড়া এই সত্যেরও সংজ্ঞা তৈরি করতে হবে এবং তা বিজ্ঞানমূলক হলে চলবে না। ধর্মাদির স্বর্ণযুগে, যখন জনগণ বিশ্বাস করেছে যে (টমাস অ্যাকুইনাস যেমন বিশ্বাস করেছেন), বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব-এর মৌলিক প্রস্তাবনাগুলোর সত্যতা প্রতিপাদন করা সম্ভব, তখন ভাবাবেগের কোনো দরকার ছিল না; সাধু অ্যাকুইনাসের Summa ডেভিড হিউমের যুক্তির মতোই শীতল, নিরঞ্জন এবং যুক্তিশীল মনে হয়েছে। কিন্তু সে দিন এখন অতীত। আজকের আধুনিক ধর্মতাত্ত্বিকরা ব্যবহার করেন আবেগাপ্লুত শব্দ, যাতে পাঠকেরা তাদের লেখার যুক্তির জোরটা ঠাহর করতে না পারে। আবেগ ও ভাবাবেগ সব সময়ই বিপথগামী করে। ২ + ২ = ৪ প্রস্তাবনার প্রতি ধর্মের প্রবক্তারা কী পদ্ধতি প্রয়োগ করেন তা একবার কল্পনা করুন। ফল দাঁড়াবে অনেকটা এই রকম: "এই মহান সত্য অফিসের ব্যস্ত কর্মচারী থেকে শুরু করে, জাতীয় রাজস্বের পরিমাণ নির্ণয়রত রাজনীতিক, যাত্রীর ভিড়ের চাপে দিশেহারা বুকিং ক্লার্ক, অনুজের জন্য চকলেট ক্রয়রত নিষ্পাপ শিশু এবং আর্কটিক সাগরে মৎস্য শিকাররত নিরীহ এস্কিমো পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছেন। এই যে বিরাট ও অভাবনীয় ঐকমত্য, এটা কি গভীর আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি মানবিক স্বীকৃতির ফলে সৃষ্টি হয়নি? আমরা কেন উন্নাসিক নাস্তিক কিংবা সংশয়বাদীর কথা শুনে স্বর্ণযুগের বিজ্ঞতার ঐতিহ্য হারাব? আমরা তো জানি ঐ সময়টার সঙ্গে অনন্তের সম্পর্ক ছিল সুগভীর, আজকের জাজ যুগের মতো কোলাহলপূর্ণ ছিল না! হারাব না! এক হাজার বার হারাব না!' তবে সন্দেহ থেকে যায় যে, বর্তমানে চালু পদ্ধতি পরিত্যাগ করে ধর্মতাত্ত্বিকদের পদ্ধতিতে ছাত্রদের পাটিগণিত শেখালে কতটা সফলতা আসবে।

এসব কারণেই যে-কোনো নীতি শিক্ষার জন্য ক্ষতিকর হবে যদি তা বিচারোর্ধ্বে মনে করা হয়। যাই হোক, খ্রিস্টান দেশগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষায় আপত্তিকর অনেক কিছুই থাকে, যা আমাদের সন্তানদের পড়তে বা জানতে হয়।

প্রথমত, ধর্ম হল রক্ষণশীল শক্তি, অতীতের অকল্যাণকর সব কিছু ধর্ম বাঁচিয়ে রাখে। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় পর্যন্ত রোমকরা দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য নরবলি দানের প্রথা পালন করেছে। ধর্মের কারণ ছাড়া এতটা বর্বরতা তারা করতে পারত না। অনুরূপভাবে আজকের দিনেও মানুষ এমন কাজ করে থাকে, যা ধর্মের সমর্থন ছাড়া অসহনীয় নির্দয়তা বলে গণ্য হত। রোমান ক্যাথলিক চার্চ এখনো নরকে বিশ্বাস করে। ক্যান্টারবারি ও অর্কের আর্চবিশপদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে প্রিভি কাউন্সিলের সাধারণ সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেয় বলে অ্যাংলিকান চার্চ নরক আছেই এ-রকম বিশ্বাস বাধ্যতামূলক মনে করে না। তথাপি অধিকাংশ যাজকরা এখনো নরকে বিশ্বাস করেন। যারা নরকে বিশ্বাস করেন তারা নিশ্চয়

www.pathagar.com

প্রতিহিংসামূলক শাস্তি অনুমোদন করেন। ফলে তাদের কাছে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং অপরাধীদের সংশোধনের ব্যাপারে নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বনের পক্ষে তাত্ত্বিক ন্যায্যতা রয়েছে। ধর্মের ধ্বজাধারী এবং পুরোহিতরা যুদ্ধ বাধলেই তা সমর্থন করে বসেন।* অবশ্য শান্তির সময়ে তারা শান্তিবাদী। যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তারা জোর দিয়ে বলেন যে ঈশ্বর তাদের পক্ষে আছেন। এবং পাইকারি হারে নরহত্যাকে যারা অবিজ্ঞজনোচিত মনে করেন তাদের নির্যাতন করা ধার্মিকতার মধ্যে পড়ে বলে রায় দেন। যখন ক্রীতদাস প্রথা ছিল যাজকরা তখন তা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করতেন; এখন অনুরূপ উপায়ে পুঁজিবাদী শোষণ সমর্থন করেন। সকল প্রকার প্রথানুগ নির্দয়তা ও অন্যায় সংঘবদ্ধ ধর্মগুলো সমর্থন করে থাকে। অবশ্য এক সময় সাধারণ মানুষ অবস্থার পরিবর্তন করে।

দ্বিতীয়ত, খ্রিস্টধর্ম একান্তভাবে খ্রিস্টানদের জন্য স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। আর ধর্মে বিশ্বাস ফিকে হয়ে এলে স্বচ্ছন্দ জীবন না-থাকাটা যন্ত্রণাকর হয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ভবিষ্যৎ জীবনে আস্থা থাকলে স্টয়িক সাহসের খুব দরকার করে না। কিন্তু সংশয়বাদীদের জন্য এটা খুবই দরকারি। অনেক তরুণ এমন বয়সে বিশ্বাস হারিয়ে বসে যখন হতাশাগ্রস্ত হওয়া খুবই সহজ। ধর্মীয় আবহে লালিত-পালিত হয়নি এমন তরুণের চেয়ে এদের হতাশার মাত্রা অনেক বেশি হয়ে থাকে। খ্রিস্টধর্ম মৃত্যু ও জগতের প্রতি ভীত বোধ না করার কারণ তুলে ধরে, আর এটা করতে গিয়ে সাহসের সদ্‌গুণ সম্পর্কে যথার্থ শিক্ষা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের আকাঙ্ক্ষার উৎস ভীতি, আর বিশ্বাসের প্রবক্তারা মনে করেন কিছু কিছু ভীতি দূর করা উচিত হবে না। আমি তো মনে করি এক্ষেত্রে তারা বিরাট ভুল করেন। ভীতি এড়ানোর জন্য আনন্দদায়ক বিশ্বাস পোষণ কোনো মহৎ বা কার্যকর উপায় নয়। ভীতি কাজে লাগিয়ে ধর্ম বরং মানুষের মর্যাদা হ্রাস করে।

তৃতীয়ত, ধর্মকে যদি আমরা গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করি তাহলে ইহলোকের চেয়ে পরলোকের প্রতি গুরুত্ব বেশি প্রদান করতে হয়। আর একবার পরলোকের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করলে স্বর্গ-সুখের জন্য ইহলোকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে। এই প্রশ্নের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল সেক্স। পরবর্তী অধ্যায়ে আমি যৌনতা বিষয়ে আলোকপাত করব। কিন্তু যারা খ্রিস্টধর্মীয় শিক্ষা আন্তরিক এবং গভীরভবে গ্রহণ করেন তারা দারিদ্র্য এবং রোগব্যাধির মতো অমঙ্গলকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। কারণ তাদের কাছে এই দুর্ভোগগুলো ইহজীবনের ব্যাপার। স্বর্গে পুণ্যবানের জন্য দিব্যসুখ অপেক্ষা করছে। এই মতবাদ ধনী লোকদের স্বার্থের খুবই অনুকূলে। আর এজন্যই প্রধান ধনিকতন্ত্রীরা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ হয়ে থাকেন। পরজীবন বলে যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে, আর মর্ত্যে দুর্ভোগ পোহানোর পুরস্কার যদি হয় স্বর্গে দিব্যসুখ, তা হলে ইহজগতে মানুষের অবস্থার উন্নতির প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা অত্যন্ত সঠিক কাজ হবে। আর আমাদের উচিত হবে সেই সব নিঃস্বার্থ শিল্পপতিদের প্রতি ভক্তি গদ-গদ হওয়া যারা অন্যরা পৃথিবীতে লাভজনক সংক্ষিপ্ত দুর্ভোগকে একচেটিয়া কারবারে পরিণত করলে আপত্তি করেন না। বরং সাগ্রহে অনুমোদন করেন। কিন্তু পরজীবনে বিশ্বাস করা যদি ভুল হয়, তা হলে সেটা হবে কায়া ফেলে ছায়ার পেছনে ছোটা। আর আমাদের দুর্ভাগ্য তুলনা করা হবে সেই লোকদের সঙ্গে যারা গোটা জীবনের সঞ্চয় এমন ব্যবসায় লগ্নি করেন যে ব্যবসায় লালবাতি জ্বলা অনিবার্য।

---

* এ বিষয়ে Joad-এর Under the Fifth Rib গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলো দেখুন।

www.pathagar.com

চতুর্থত, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিক্রিয়া মন্দ বা অকল্যাণকর হতে বাধ্য। ধর্ম মানুষের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে; তরুণদের কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার ফল দাঁড়ায় এই যে তরুণরা আর নিজেদের পরিচালনা করতে পারে না। আমি কিছু লোককে জানি যারা রোমান ক্যাথলিক হিসেবে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। বিশ্বাস হারানোর পর তাদের যে আচরণ আমি লক্ষ করেছি তাকে দুঃখজনক না বলে গত্যন্তর নেই। কেউ কেউ বলবেন ঐ লোকগুলো ধর্মের নৈতিক উপযোগিতার উদাহরণ, আমি কিন্তু বলবো একেবারে বিপরীত কথা। কারণ তাদের মধ্যে যে দুর্বল ইচ্ছাশক্তি দেখেছি সেটা ধর্মীয় শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। উপরন্তু ধর্মকে নৈতিকতার একমাত্র ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হলে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি ধর্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, সে কোনো প্রকার নৈতিকতাতেও বিশ্বাস ধরে রাখতে পারে না। খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাস হারানোর পর পরই স্যামুয়েল বাটলার–এর The Way of all Flesh উপন্যাসের নায়ক গৃহের পরিচারিকাকে ধর্ষণ করে বসে। গৃহের পরিচারিকাকে ধর্ষণ না করার পক্ষে অনেক সুযুক্তি রয়েছে, তবে সে যুক্তিগুলোর একটিও কথিত নায়ককে শেখানো হয় নি। তাকে শুধু শেখানো হয়েছে যে ধর্ষণ করা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ। অতএব আজকের দিনে যেখানে বিশ্বাস হারানো খুবই সহজ হয়ে পড়েছে সেখানে নৈতিকতা অত ঠুনকো হলে চলবে না।

নৈতিক বিচারে ধর্মীয় শিক্ষার আরো একটি বাজে বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে বুদ্ধিবৃত্তির মর্যাদাকে খুব খাটো করে দেখা হয়। বুদ্ধিগত নিরপেক্ষতার মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণকে নির্জলা বাজে ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়। আর জটিল বিষয় বোঝার পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টাকে সহ্য করা হয় মাত্র। যাদেরকে ভক্তি করা হয়, দেখা যায় তাদের মেধা প্রথম শ্রেণীর নয়। দু'একজন প্রথম শ্রেণীর মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভক্তি করা হয় বোকামি করে। আর তারা এটা করে কোনো বোকামিপূর্ণ মুহূর্তে। ধর্মের সঙ্গে সদ্‌গুণকে এক করে দেখা হয় বলে এবং যেহেতু ধার্মিক ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা উচ্চস্তরের নয়, তাই নির্বোধ ব্যক্তিরা ধর্মীয় শিক্ষার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করতে সাহসী হয়। উদাহরণত, ধর্মের জোরে অনেক দেশে বিবর্তনবাদকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে, Gospel-এ বুদ্ধিমত্তার প্রশংসায় একটি কথাও বলা হয় নি। এক্ষেত্রে ধর্মযাজকরা গসপেলের কর্তৃত্ব কঠোরভাবে অনুসরণ করেন। খ্রিষ্টীয় নীতিশাস্ত্রের এটা গুরুতর ত্রুটি।

খ্রিষ্টীয় নীতিশাস্ত্রের আরো একটি মৌলিক ত্রুটি এখানে যে, এতে নির্দিষ্ট ধরনের কাজকে 'পাপপূর্ণ' কিংবা 'পুণ্যময়' গণ্য করা হয়। এ ছাড়া এখানে কাজের সামাজিক ফলশ্রুতি বিবেচনায় আনা হয় না। যে নীতির উৎস কুসংস্কার নয়, সে নীতির জন্য দরকার কি ধরনের সমাজ বাঞ্ছনীয় তা সাব্যস্ত করা। কী ধরনের সমাজ একান্তই কাম্য নয় সেটাও ভেবে দেখতে হবে। অতঃপর ভেবে দেখতে হবে কী করলে বাঞ্ছনীয় ফল লাভ করা যাবে। আদি কালের নৈতিকতা কিন্তু এ পথে চলে নি। কিছু–কিছু আচরণ তারা বিচার করার জন্য নির্বাচন করে, তবে কেন এটা করে তার কারণ নৃতাত্ত্বিক জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। মোটের ওপর দেখা যায় নিন্দিত কাজ ক্ষতিকর, প্রশংসিত কাজ হিতকর; তবে সকল ব্যাপারে এটা খাটেনি। এক শ্রেণীর লোক মনে করেন জীব–জন্তু পোষ মানানোর আদি কারণ ধর্মীয়, প্রাথমিক লক্ষও উপযোগিতা ছিল না, কিন্তু যে গোত্রগুলো কুমির কিংবা সিংহ পোষ মানানোর চেষ্টা করেছে তারা নির্বংশ হয়েছে, কিন্তু যারা ভেড়া ও গরু পোষ মানাতে গেছে তারা জীবনে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। অনুরূপভাবে গোত্রসমূহের মধ্যে নৈতিক বিধির ভিন্নতা নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছে, যে গোত্রের নীতিমালা কম অসংগত ছিল সেই গোত্র হয়েছে জয়ী। তবে নীতির

www.pathagar.com

উৎস যদি কুসংস্কার হয় তা হলে নীতিতে অসংগতি না থেকে পারে না। এ ধরনের অসংগতি এখন অনেক কমে এসেছে। রোববার কর্মবিরতি যুক্তিসংগত বলা যায়, কিন্তু খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ নিষিদ্ধ করা তো ঠিক হবে না। চৌর্যবৃত্তি নিষিদ্ধ করা খুবই ভাল। তাই বলে নির্বাসিত রাজপুত্রদের সম্পত্তি ভোগদখল নিশ্চয় অন্যায় নয়। যুদ্ধোত্তর জার্মানির গির্জাগুলো কিন্তু এ ধরনের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভোগদখল নিষিদ্ধ করেছিল। খ্রিষ্টীয় নৈতিকতার ভিত্তি যে কুসংস্কার তা সবচেয়ে পরিষ্কার বোঝা যায় যৌন-প্রসঙ্গ বিবেচনা করতে গেলে। তবে এই বিষয়টা এতই ব্যাপক যে এর জন্য দরকার ভিন্ন একটি অধ্যায়। পরবর্তী অধ্যায় এ বিষয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সেক্স ও শিক্ষা

সভ্যতাপুষ্ট সাবালক লোকেরা সেক্স বিষয়ে যে অভিমত পোষণ করেন, দেখা যায়, সন্তানদের সেই অভিমত অনুসারে শিক্ষা দিতে চান না। এই ব্যাপারটা আমি প্রায়ই লক্ষ করি। এ ব্যাপারে একটা প্রথানুগ নৈতিক বিধি রয়েছে যা এক শ্রেণীর লোক আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন, অন্যেরা মন থেকে গ্রহণ করেন না, গ্রহণ করতে হয় বলে করেন। সাধারণভাবে, সেক্স বিষয়ে যাদের অভিমত প্রথানুগ তারা তাদের অভিমত জোর দিয়ে ঘোষণা ও প্রচার করেন, কিন্তু যারা প্রচলিত নৈতিকতা ব্যাপারে নির্দ্বন্দ্ব নন, তারা চুপ থাকা বিজ্ঞতার পরিচায়ক মনে করেন। যারা নিজেদের এবং অপরের একান্ত ব্যক্তিগত আচরণ ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত, তাদের নিজস্ব নৈতিক বিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তাছাড়া তারা প্রথাগত নৈতিকতা ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ না করলেও জনসাধারণ্যে তা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন। উপরন্তু, তারা মনে করেন যে, যৌন আসক্তির প্রবলতা নর ও নারীকে যে পথে নিয়ে যায় সে পথ বাঞ্ছনীয় নৈতিক বিধি অতিক্রম করে। ফলে, ক্রিয়া–কর্মে সঠিক মাত্রায় স্বাধীনতা লাভ করতে হলে সত্যের পেছনে অতিরিক্ত না ছুটে তত্ত্বকে কঠোর করে তুলতে হবে। যে ব্যক্তি মনে করেন কোনো অবস্থাতেই পরকীয়া প্রেম মেনে নেওয়া যায় না, তিনিই হয়তো গভীর প্রেমের টানে, অবস্থার অদ্ভুত প্রকৃতির জন্য নৈতিক বিধি শিথিল করার অনুমতি দেবেন। আবার, যিনি মনে করেন গভীর প্রেমের ক্ষেত্রে পরকীয়া সম্পর্ক অন্যায্য কিছু নয়, তিনি তুচ্ছ প্রেমকে গভীর প্রেম বলে গণ্য করবেন। কেউ যদি মনে করেন জবরদস্তি নয়, ব্যাপারটা পারস্পরিক হলে, তুচ্ছ বা খেয়াল–চালিত প্রেমকেও বৈধ বলে মেনে নেওয়া যায়, তাকেই দেখা যাবে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা পারস্পরিক হওয়ার শর্ত ইচ্ছা করেই বিস্মৃত হয়েছেন। এভাবেই মানুষ তত্ত্বে নয়, বাস্তবে অতিরিক্ত স্বাধীনতা ভোগ করে। সুতরাং যৌন ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতি করলে কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সেই কিছুটা স্বাধীনতা বিরাট আকার ধারণ করেছে।

বয়স্কদের জন্য সঠিক যৌননীতি সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গিই অবলম্বন করা হোক না কেন, ছোটদের যৌনশিক্ষা ব্যাপারে কিছু সমস্যা রয়েছে যে গুলো মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন না করে অর্থাৎ ব্যাপারটার গভীরে না গিয়ে কেবল সাধারণ জ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের আলোকে বিবেচনা করা চলে। নিরেট মূর্খ, গোঁড়া এবং নীচুমনা লোকদের ওপর শিক্ষার গোটা দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধনীর সন্তানদের প্রাথমিক বছরগুলো কাটে প্রধানত নার্সদের তত্ত্বাবধানে। এই নার্সরা কুমারব্রতী এবং সব সময় অতি শালীনতার ভান করে চলে। পরবর্তীকালে যখন তারা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মহিলাদের দায়িত্বে চলে যায় (এই মহিলারাও

www.pathagar.com

নিয়ম অনুসারে কুমারব্রতী), তখন প্রত্যাশা করা হয় যে তারা নিষ্পাপ, নিখুঁত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হবে। অর্থাৎ তাদের দুর্বলচিত্ত, ভাবাবেগপ্রবণ এবং বাস্তবতাবোধ বিবর্জিত হওয়া জরুরি। আরো এই অর্থ দাঁড়ায় যে, যৌনতা সম্পর্কে তাদের অভিমত খুবই কঠোর কিন্তু তথ্য-নির্ভর হবে না। স্কুল শিক্ষকদের প্রতি আশা করা হয় যে তারা কুমারব্রতী এবং উচ্চ নৈতিক মানের অধিকারী হবেন এবং বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বের আলোকে নয়, প্রথানুগ সংস্কার দ্বারা। শিক্ষকদের মনে করতে হবে যে শিশু-যৌনতা একটা নোংরা বিষয় এবং এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকাই উত্তম।

এদিকে দু'বছর পূর্ণ হতে না হতে অধিকাংশ শিশুকে যৌনাঙ্গ সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা দেওয়া হয়। ও সব যেন রহস্যময় এবং ভীতিকর কিছু। তাদের স্বাভাবিক প্রয়োজন কানে-কানে জানানো শেখানো হয়। যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া করলে তাদের শুনতে হয় দীর্ঘ বক্তৃতা। আমি বেশ ক'জন নর ও নারীকে জানি যারা শৈশবে যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া করতে গিয়ে মায়ের কাছে ধরা পড়েছেন। এবং মা তাদের বরং মৃত দেখার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। (এটা কিন্তু কোনো মতেই ব্যতিক্রম ঘটনা নয়।) আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, তারা কিন্তু প্রচলিত অর্থে পুণ্যবান সাবালক হন নি। তরুণদের মধ্যে হস্তমৈথুন একটা সাধারণ ঘটনা। এ জন্য তাদেরকে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হয়। ফ্রয়েড-এর লেখা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, ছেলেদের বলা হয় তোমরা যদি হস্তমৈথুন করো তা হলে সারসপাখি এসে তোমাদের পুরুষাঙ্গ কেটে নিয়ে যাবে। এই ছেলেরা কখনো নগ্ন বালিকা দেখার সুযোগ পেলে তাদের ধারণা হয় ঐ বালিকার পুরুষাঙ্গ সারস পাখির উদরে গেছে। যারা মনঃসমীক্ষণ বিষয়ক লেখা পড়েছেন তারা এ ধরনের অনেক ঘটনা জানেন। অথচ এ জাতীয় লেখা পাঠ তাদের জন্য নিষিদ্ধ, যারা এ জাতীয় লেখা না পড়ার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। হস্তমৈথুনের ক্ষতির দিকটা খুব বড় করে তুলে ধরার ফল এই দাঁড়ায় যে, ছেলেরা পরবর্তীকালে স্নায়বিক বৈকল্যে ভোগে। স্কুল জীবনে ছাত্ররা প্রতি নিয়তই শোনে যে হস্তমৈথুনের অমোঘ পরিণতি উন্মাদগ্রস্ততা। হস্তমৈথুনের ভয়ানক পরিণতির হুমকি থেকে উন্মাদগ্রস্ততার ঘটনা প্রায়ই ঘটে, তবে প্রকৃত কাজের দরুন (হস্তমৈথুন) ক্ষতি হয় খুবই কম, অন্তত কম বয়সে।

শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পদ্ধতি যে ভাবে রহস্যাবৃত করে রাখা হয় তাতে অনেক কুফল ফলে। প্রথমত এতে মেনে নেওয়া হল যে কোনো কোনো জ্ঞান অকল্যাণকর। যে কোনো ভালো নৈতিকবিধির অন্যতম স্তম্ভ হওয়া উচিত এই যে, যে-কোনো জ্ঞান কল্যাণকর। এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ব্যতিক্রম অনুমোদন করা উচিত হবে না। যে ছেলে দেখতে পায় তার কোনো-কোনো কৌতূহল ব্যাপারে বড়োদের থেকে উৎসাহ পাবার পরিবর্তে ধমক পাচ্ছে সে ছেলে ধরে নেয় যে, জ্ঞান কল্যাণকর গণ্য হবে মজাদার না হলে আর মজাদার হলে অকল্যাণকর। একই কারণে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল অকল্যাণের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়, আর ছেলেদের প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায় নির্বোধ হওয়ার প্রচেষ্টা। হায়! শেষোক্ত ক্ষেত্রেই তারা বেশি সফল হয়। জরায়ুর ভেতর সন্তান লালন-পালনের ঘটনা সম্পর্কে মেয়েদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখা খুবই অন্যায়। এতে মেয়েদের মধ্যে এই ধারণা জন্মে যে তারা ছেলেদের চেয়ে হীন। যত দিন তারা গর্ভে সন্তান লালন-পালন সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারে ততদিন তারা এই ধারণা লালন করে যে ছেলেরা সকল ব্যাপারেই মেয়েদের চেয়ে উন্নত। আমি কয়েকজন মেয়েকে জানি যারা গর্ভধারণ ও জন্মদানে মায়েদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পেরে নারীজাতির প্রতি নতুন করে শ্রদ্ধা পোষণ করতে শুরু করেন। তবে যদি শুধু মায়ের

www.pathagar.com

ভূমিকা সম্পর্কেই বক্তৃতা করা হয়, পিতার ভূমিকা সম্পর্কে নিরব থাকা হয়, তা হলে আবার ছেলেদের মনোভাব দাঁড়াবে মেয়েদের অনুরূপ। উপরন্তু, পিতৃপ্রিয় সন্তানেরা এটা জানতে পেরে আনন্দিত হয় যে তাদের সঙ্গে পিতা-মাতার দৈহিক সংযোগ রয়েছে। তাছাড়া মেয়েদের যেমন জানা দরকার প্রজননে মায়ের ভূমিকা রয়েছে, তেমনি ছেলেদেরও জানা দরকার এক্ষেত্রে পিতার ভূমিকাও নগণ্য নয়।

যৌনতা ব্যাপারে নীরবতা পালনের আরো একটি কুফল এই যে, এতে সন্তানের ধারণা হয় যে, পিতামাতারা তাদের কাছে মিথ্যে কথা বলে থাকেন। সন্তনেরা কিন্তু অনতিবিলম্বে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করে ফেলে এবং এত দ্রুত উদ্ঘাটন করে যে, তাদের পিতামাতারা তা কল্পনাও করতে পারেন না। এবং সত্য উদ্ঘাটনের পরই তারা এ বিষয়ে পিতা-মাতাকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। আর তখন পিতামাতা মিথ্যা জবাব দিলে জবাবগুলো তারা তরুণসুলভ সিনিসিজমের সঙ্গে গ্রহণ করে। নীতিবাগিশরা যাই মনে করুন না কেন, ছেলেমেয়েদের কাছে মিথ্যে কথা বলা অবাঞ্ছিত বদভ্যাস মাত্র। এই নীতি কোনো মতেই সুস্থ বলে গণ্য হতে পারে না।

গুরুত্বপূর্ণ হল অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যে সুরে কথা বলা হয় যৌন বিষয়েও সেই একই সুরে কথা বলা উচিত। বিষয়টা ব্যতিক্রমী মনে করা হয় বলেই যে পরোক্ষে কথা বলতে হবে তা ঠিক নয়। একটি মতবাদী গোষ্ঠী প্রচার করেন যে ছেলেদের প্রথমে পুষ্পপ্রেম শেখানো উচিত, অতঃপর শেখানো উচিত গলদা চিংড়ির লম্ফ জম্ফ সম্পর্কে, তার পর পিতা-মাতার আচরণ সম্পর্কে দীর্ঘ জীববৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেবার পরই শুধু যৌন বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করা চলবে। সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিরাই শুধু মনে করেন এই দীর্ঘ বক্তৃতার দরকার রয়েছে। যে ছেলে বয়স্কদের অতিরিক্ত শালীনতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বখে যায়নি তার কাছে অন্যান্য বিষয়ের মতো যৌন বিষয়ও স্বাভাবিক মনে হবে। পিতা-মাতা যদি মনে করেন তারা ছেলেদের সঙ্গে যৌন বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলতে পারবেন না তা হলে তারা এমন লোক নিয়োগ করতে পারেন যার এ ব্যাপারে কোনো সংস্কার নেই। যৌবন সমাগমের আগে যৌন বিষয়ে ছেলেদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক রাখা কঠিন নয়। অন্যান্য বিষয়ের মতো এ বিষয়কেও তারা স্বাভাবিক বলে ধরে নেবে।

এই আদর্শ গোটা জীবনে অনুসরণ করা উচিত, কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করার পর কাজটা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে ছেলেদের যদি স্বাভাবিক নিয়মে লালন-পালন করা হয়, তা হলে আর তেমন অসুবিধা হয় না। আবার, অবাস্তব ভীতি এবং অকারণ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে যদি তাদের বড়ো হতে হয় তা হলে অসুবিধা কোনো মতেই দূর করা যায় না।

বেশি বয়সী বালক-বালিকার মধ্যে যে সমস্যা দেখা দেয় তা সদর্থক যৌন বিধি ছাড়া দূর করা সম্ভব নয়। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি হলো, পূর্ণ আত্ম-সংযম জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, এবং আত্ম-সংযম কোনো প্রকার ক্ষতি করে না। বিলেতে একাধিক নারী বা পুরুষ সম্ভোগ অসম্ভব করে তোলা হয় নারী ও পুরুষের মাঝখানে দেয়াল রচনা করে। কেবল কিছু উদ্যোগী তরুণ ব্যতিক্রমী যৌনজীবন উপভোগে সমর্থ হয়। অন্যান্য উদ্যোগী তরুণ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সমকামে। দুর্বলচিত্তের দল দ্বারস্থ হয় হস্তমৈথুন পদ্ধতির। বালকদের বলা হয়, তারা বিশ্বাসও করে, সমকাম ও হস্তমৈথুন দুষ্ট অভ্যাস এবং ক্ষতিকর। ছেলেদের এই অভ্যাসগুলো চালিয়ে যেতে হয় গোপনে; কারণ ধরা পড়লে দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়। তবে ধরা পড়ার ঘটনা অবশ্য বিরল; অতএব দণ্ড প্রদান করা হয় অন্যায় এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে। কিন্তু শাস্তির ভয় ও গোপনীয়তা রক্ষার প্রথা তাদের ওপর খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যারা

www.pathagar.com

কোনোদিনই ধরা পড়ে না। পাবলিক স্কুলগুলোতে সদগুণের কাছে বুদ্ধি জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। আর এই কাজটি করা হয় ছেলেদের শারীরিকভাবে ক্লান্ত করে, এরপর তারা যৌনকর্মের জন্যে সময় পায় না, সে উৎসাহও তাদের আর থাকে না। চালু পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত অসুবিধাগুলো দেখা যায়; প্রথমত, এতে ছেলেদের মনে অযৌক্তিক ভীতি বদ্ধমূল হয়; দ্বিতীয়ত, এতে বিরাট একটি অংশ দুর্বলচিত্ত এবং ভণ্ড হয়; তৃতীয়ত, এতে যৌনতা নোংরা এবং গোপন ব্যাপার মনে করার অভ্যাস গড়ে ওঠে; চতুর্থত, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল পাপাচারী গণ্য হয়; পঞ্চমত, অবসরসম্ভোগে উৎসাহ থাকে না, ফলে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বিঘ্নিত হয়।

চালু ব্যবস্থার মধ্যে এই ত্রুটিগুলো থাকা সত্ত্বেও, নৈতিক বিধিমালা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা না হলে ত্রুটিগুলো দূর করার কথা কল্পনা করা যায় না। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে বিয়ে করার সময় পর্যন্ত আধুনিক সমাজের অধিকাংশ পুরুষের খারাপ সময় যায়। যদি ধরেই নিই যে পূর্ণ আত্ম-সংযম অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়, তবু এটা সুনিশ্চিত যে অধিকাংশ পুরুষ সংযম মেনে চলবেন না। তবে যতদিন বর্তমানের নৈতিক বিধিমালা চালু থাকবে ততদিন নিজেদের ক্ষতি না-করে উক্ত বিধিমালা লংঘন করা যাবে না। গণিকাসম্ভোগ খারাপ কাজ সন্দেহ নেই। প্রথমত এতে রোগ সংক্রামের ভয় থাকে; দ্বিতীয়ত, বেশ্যাবৃত্তি একটা অবাঞ্ছিত পেশা, অন্তত তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখা হয় বলে; তৃতীয়ত, যদি একটা লোকের প্রথম যৌন অভিজ্ঞতার সঙ্গে আবেগের ছোঁয়া না থেকে অর্থের সম্পর্ক থাকে, তা হলে লোকটি বিয়ে করার পর স্ত্রীকে বেশ্যা মনে করবে কিংবা সন্ত। এবং এটা কোনো মতেই সুখী জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করবে না। যৌবনে হস্তমৈথুন করলে দারুণ কিছু ক্ষতি হবেই। প্রথানুগ নীতিবিশারদেরা অবশ্য ক্ষতিটা অনেক বড় করে দেখার ভান করেন। হস্তমৈথুনের অভ্যাস মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক এবং দুর্বলচিত্ত করে গড়ে তোলে। তাছাড়া পরবর্তীকালে অনেকের স্বাভাবিক যৌনজীবন ব্যাহত হয়। এটা সম্ভব যে, সমকামী সম্পর্ক সহনশীলতার সঙ্গে দেখলে খুব ক্ষতিকর কিছু হয় না। তবে ভয় একটাই, পরবর্তীকালে স্বাভাবিক যৌনজীবন ব্যাহত হয়। নারী পুরুষকে যদি বিচ্ছিন্ন করে রাখা না-হয় তা হলে বালক-বালিকার মধ্যে যৌনকর্মের ঘটনা ব্যাপক হারেই ঘটবে। ফলে সংশ্লিষ্ট বালক-বালিকার লেখাপড়া শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, অনাকাঙ্ক্ষিত সময়ে গর্ভধারণের ঘটনাও ঘটবে। আমি তো মনে করি না যে, বর্তমানে সমাজের যা অবস্থা এবং সাধারণ মানুষের অভিমতের যে ধরন তাতে এই সমস্যার কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। হয়তো এমন একটা সময় আসবে যখন বর্তমান নৈতিকবিধির জন্যে বয়ঃসন্ধিকালে যে মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলা ঘটে তা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে এবং সামোয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপে যে ধরনের যৌন স্বাধীনতা অনুমোদন করা হয় তা আমাদের বালক-বালিকাদের জন্যেও অঙ্গীকার করা হবে। আর, যদি পরিবর্তিত রীতি প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে সংশ্লিষ্টদের গর্ভনিরোধ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। তবু সতর্কতা অবলম্বনের পরও যদি গর্ভধারণের ঘটনা ঘটে তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে গর্ভপাতের ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হয়ে পড়বে। আমি বলতে পারি না যে এই ব্যাপারটা সমর্থন করা যায়। এবং সম্ভবত দেখা যাবে যে বয়ঃসন্ধিকালে আত্ম-সংযম পালন করলে অসহনীয় কোনো বোঝা চেপে বসবে না। তবে দেখতে হবে ২০ বৎসর বয়সে এর প্রয়োজনই ফুরিয়ে যায় কি-না। এটা অর্জন করা যায় বিচারপতি লিন্ডসের পদ্ধতি অনুসরণ করে (Companionate marriage)। আমি নিশ্চিত যে বুদ্ধিগত ও নৈতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন অনেক ভালো হবে যদি ছাত্ররা সন্তানহীন অস্থায়ী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এতে যৌনজীবনে না থাকবে অস্থিরতা, না থাকবে কুসংস্কার, না হবে তাড়াটে কিংবা নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাছাড়া সময়ের অপচয় হবে না এবং অর্থপূর্ণ কাজের জন্যে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

প্রাক-যৌবনে শিক্ষায় যৌনতার প্রশ্নটা বিচার করে দেখতে হবে মানসিক স্বাস্থ্যের আলোকে। যৌননীতিমালা বিষয়ে সুনিশ্চিত ধারণায় উপনীত হবার দরকার করে না এক্ষেত্রে। তবে যৌনজীবনের কোন দিকটা কাঙ্ক্ষণীয়, কোন দিকটা কাঙ্ক্ষণীয় নয়, সে সম্পর্কে অত্যন্ত স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে স্কুল জীবনের শেষ দিকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সেক্স সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া হওয়া উচিত তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়বে। অধিকাংশ লোকের যৌন বিষয়ক নীতিমালা বিশৃঙ্খল, এই বিশৃঙ্খল নীতিমালার উৎস প্রধানত তিনটি : প্রথমত, পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের স্বার্থে স্ত্রীকে সতী হতেই হবে; দ্বিতীয়ত, এই খ্রিস্টীয় মতবাদ যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছাড়া সকল প্রকার যৌনকর্ম পাপপূর্ণ; তৃতীয়ত, নারীর সমানাধিকার বিষয়ক অত্যাধুনিক মতবাদ। এই তিনটি উৎসের মধ্যে প্রাচীনতম হল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। বর্তমানে জাপানে এই একটি মাত্র উৎসই অস্তিত্বশীল। জাপানীরা সেক্স ট্যাবু থেকে অনেকাংশে মুক্ত। এবং তাদের যৌননৈতিকতার মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলা চলে। সেখানে লিঙ্গ সাম্যের কোনো ভান নেই, আর মহিলাদের অবস্থান পুরুষের পরবর্তী এবং এই রীতি কঠোরভাবে পালন করা হয়। তাছাড়া, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, আর পিতৃতান্ত্রিকতা টিকিয়ে রাখা হয় নৈতিক বক্তৃতা প্রচার করে নয়, নারীদের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। তরুণদের যৌন বিষয়ে জ্ঞানদান করা হয়; তাদেরকে কিছুটা যৌনক্রীড়াও অনুমোদন করা হয়, তবে একটা মাত্রা রক্ষা করে, ইউরোপীয়রা এটা ভাবতেও অবাক মানবেন। বয়স্ক জীবনে নৈতিকতা রক্ষার নিয়মটা শুধু নারীদের জন্য নির্ধারিত, পুরুষ তার উচ্চতর ক্ষমতাবলে এই নৈতিকতা নির্দয়ভাবে আরোপ করে। এই নিয়মটা প্রাচীনকালীন, খ্রিস্টীয় সভ্যতা সূচনার আগে এটা প্রায় সর্বত্রই চালু ছিল।

সূচনায় খ্রিস্টধর্ম এই বিশ্বাসটা চালু করে যে, যৌনতার মধ্যে নোংরা একটা কিছু জড়িত রয়েছে, অতএব যৌনকর্ম কেবল চলতে পারে মানববংশ বিস্তার ও টিকিয়ে রাখার জন্য। অন্যথায় বিবাহিত জীবনে যৌনতাও আত্ম-সংযমের চেয়ে শ্রদ্ধেয় নয়। অবশ্য আমি বলছি না যে এই বোধ খ্রিস্টধর্ম জাগরণের আগে ছিল না; মানব প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা পুরুষদের মধ্যে যৌন-বিরোধী অনুভূতির সৃষ্টি করে। খ্রিস্টধর্ম পুরুষের এই অনুভূতির প্রতি প্রথমত আবেদন রাখে। ইহুদিদের মধ্যে প্রবল যৌন ট্যাবু ছিল, তবে খ্রিস্টানদের মতো তারা যৌনকর্মে নোংরা কিছু দেখেন নি, যদিও apocrypha*-র মধ্যে এর সূত্রপাতের চিহ্নগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে। খ্রিস্টীয় নৈতিকবিধিই ইতিহাসে প্রথম তত্ত্বগতভাবে নর-নারীর সাম্যের কথা বলে। যদিও যৌন নৈতিকতা থেকে বিচ্যুতি নারীর ক্ষেত্রে যতটা কঠোরভাবে ধরা হয়, পুরুষের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এটা হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। ফলে বাস্তবে খ্রিস্টীয় আচার প্রাক-খ্রিস্টীয় পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার অনুরূপ হয়ে যায়। তবে একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রভেদ থেকেই গেছে। কারণ পুরুষের যৌন স্বাধীনতা পাপপূর্ণ গণ্য করা হয়েছে।

লিঙ্গসাম্য মতবাদের আবির্ভাবের পর এই প্রথা ভেঙ্গে পড়ে। এখন পুরুষকে নারীর সমান যৌন বিশুদ্ধতাসম্পন্ন হতে হবে, নারীবাদের প্রবক্তাগণ অন্তত তাই চান, অথবা নারীকে পুরুষের সমান মুক্ত যৌনজীবন যাপন করতে দিতে হবে। একালের নারীবাদীরা প্রকৃতপক্ষে তাই কামনা করেন বলে মনে হয়। কিন্তু নারীর সতীত্ব ব্যাপারে কোনো প্রকার আপোস হলে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার টিকবে কী করে তা বোঝা কঠিন; আর পিতৃতান্ত্রিক

* বাইবেলের যে অংশগুলি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি।—অনুবাদক

www.pathagar.com

পরিবার প্রথা বর্জন করা হলে সমাজ কাঠামোর গভীর পরিবর্তন সাধিত হবে। ফলে এখানে একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা থেকে যায়। খ্রিস্টীয় নৈতিক বিধি পুরুষের মানব প্রকৃতির জন্য সব সময় কঠোর ছিল, এখন নারীও যদি পুরুষের সমান স্বাধীনতা ভোগের অধিকার দাবি করে তা হলে তারাও দেখতে পাবে যে খ্রিস্টীয় নৈতিকবিধি দুঃসহ মাত্রায় কঠোর। পরিবার প্রথার শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত, পুরুষ ইচ্ছে করে এই প্রথার রূপান্তর চাইবে বলে মনে হয় না। এই বিভ্রান্তি থেকে একটা ইস্যু আমরা পাই–তা হল পিতার স্থান গ্রহণ করবে রাষ্ট্র–এই প্রথা কম্যুনিজমের অধীনে অনায়াসে চালু করা যায়। তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার আইনের অধীনে মোটেই সহজ নয়। এখানেই যৌন নৈতিকতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে। সন্তান নিজের নয়, অথচ তাদের জন্য কাজ করা কোনো লোকের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং, ব্যক্তিগত সম্পত্তি পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্ত্রীর মধ্যে অন্তত নির্দিষ্ট মাত্রার সতীত্বের দাবি তোলে। আবার স্ত্রীর সতীত্ব প্রত্যাশা করা এবং স্বামীর ব্যাপারে শিথিল হওয়া লিঙ্গসাম্য নীতির সঙ্গে খাপ খায় না। তা হলে দেখা যায়, নির্যাতন কিংবা ট্যাবু ছাড়া যৌন বিশুদ্ধতা রক্ষা কঠিন কাজ। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সমস্যার সমাধান নিহিত পিতার গুরুত্ব ক্রম হ্রাস এবং পিতার স্থলে রাষ্ট্রের গুরুত্ব ক্রম বৃদ্ধির মধ্যে। আমি অবশ্য খুব নিশ্চিত নই যে, এটা খুব ভালো কাজ হবে কি–না। পিতৃত্ব বোধ এবং পিতার প্রতি পুত্রের অনুভূতি সভ্যতার ইতিহাসে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি জানি না পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা উঠিয়ে দিলে সভ্যতা কী চেহারা ধারণ করবে। তবে ভালো হোক, আর মন্দ হোক, সন্তানের ব্যাপারে রাষ্ট্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে বাধ্য, সঙ্গে–সঙ্গে পিতার গুরুত্ব তুলনীয় হারে হ্রাস পাবে।

তরুণের শিক্ষার সঙ্গে যারা জড়িত তারা আধুনিক এই সব সমস্যা এবং বিভ্রান্তি নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন। তারা ব্যাপারটার প্রতি গুরুত্বই দিতে চান না। এরা মনে করেন কঠোর খ্রিস্টীয় নৈতিক বিধি বয়স্কদের ওপর আরোপ করা না গেলেও, তরুণদের দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করবে ঐ কঠোর নীতিমালা। এবং তারা একাজটি সম্ভব বলেও মনে করেন। জগতের অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে বৃটিশ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নৈতিক দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত কঠোর। ফলে ছাত্রদের যে সমাজের জন্য তৈরি করার কথা সেই সমাজের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। গণমত এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি যে অবস্থায় আছে তাতে আমার তো মনে হয় না যে কোনো পরিষ্কার সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভবপর হবে। কারণ লিঙ্গ সাম্যনীতির সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ধারণা কোনো কালেই বিরোধহীনভাবে সহবাস করতে পারবে না। এই অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও সমস্যা সম্পর্কে অনেকাংশে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে সাধারণ নৈতিক বিধিমালা দ্বারা। সেক্স সম্পর্কে সকল প্রকার কুসংস্কার দূর করেও আমরা এক্ষেত্রে অনেক দূর এগোতে পারি।

তরুণদের সঙ্গে সর্ব প্রকার কারবারে একটা নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। নীতিটা হলো: তাদেরকে কোনো মতেই শিক্ষার নামে মিথ্যা কথা বলা যাবে না। আরো একটা নীতি থাকতে হবে এবং তা কঠোরভাবে পালন করতে হবে। যে কোনো বিষয় উন্মুক্ত ও যৌক্তিক বিচারাধীন, এই বিশ্বাস থাকতে হবে এবং বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সংরক্ষণ নৈতিকতার ভিত্তি হওয়া অনিবার্য হলে, যে যৌনক্রীয়ায় সন্তান আসে না সেই যৌনক্রিয়াকে পাপাচারী গণ্য করা যায় না। অথচ একে সব চেয়ে আতংকজনক গণ্য করা হয়ে থাকে। শুধু খ্রিস্টীয় নৈতিকবিধি নয়, অপরাধ আইনের চোখেও এটা আতংকজনক। আমাদের বুঝতে হবে যে কোনো নৈতিক আচরণ কাঙ্ক্ষণীয়

www.pathagar.com

হলেও, উক্ত আচরণ কঠোর উপায়ে আরোপ করা কাঙ্ক্ষণীয় নাও হতে পারে। এ নীতিগুলো তরুণদের নৈতিক শিক্ষার বিরাট একটা অংশ জুড়ে আছে। বাকিগুলোর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে; কবে আমাদের এই বিশৃঙ্খল এবং দ্রুত পরিবর্তমান সমাজ সমধিক স্থির কাঠামো লাভ করে সেই দিনের জন্য।

একটা কথা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো, ছেলেরা যেন এধারণা লাভ না করে যে সেক্স জিনিসটা মূলত নোংরা এবং গোপন ব্যাপার। বিষয় হিসেবে সেক্স খুবই মজার, এবং লোকে এই বিষয় নিয়ে ভাববে এবং কথা বলবে এতো খুবই স্বাভাবিক। বর্তমানে তরুণদের এ সম্পর্কিত নিতান্ত স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে কর্তাব্যক্তিরা দুষ্ট বলে গণ্য করেন। ফল দাঁড়ায় এই যে, তরুণদের যৌন ব্যাপারে আগ্রহ অতি মাত্রায় বেড়ে যায় এবং নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণসুখের আনন্দ নিয়ে নিরন্তর আলোচনা করে। আবার এদের আলোচনা অজ্ঞ ও নির্বোধের মতো হয়ে থাকে। কারণ এ বিষয়ে তাদের কথা বলতে হয় নিজেদের অসার অনুমানের ওপর নির্ভর করে এবং বিষয়টা সম্পর্কে আধা জ্ঞান নিয়ে। ফলে সেক্স সম্পর্কিত গোটা বিষয়টা অধিকাংশ তরুণের কাছে হয়ে দাঁড়ায় চাপা হাসি এবং নোংরা খোশগল্পের ব্যাপার। যৌনতা যে স্বভাবজ আনন্দের ব্যাপার, অনেক সময় লঘুচিত্ত এবং কৌতুকের, অনেক সময় গভীর ট্র্যাজিক আসক্তির ব্যাপার, তা পণ্ডিতম্মন্য নীতিবিশারদদের কাছে কখনো মনে হয় না। এদের কাছে আনন্দের জন্য যৌনকর্ম দুষ্ট ব্যাপার, সদ্‌গুণসম্পন্ন তখনই যখন এটা একঘেয়ে, ক্লান্তিকর এবং অভ্যাসগত। এই কদর্য নৈতিকতা দ্বারা কবিতা, আনন্দ এবং সৌন্দর্য জীবন থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়। পরিবর্তে মানব সম্পর্কের মধ্যে চালু করা হয় রুক্ষ ও অনমনীয় কিছু ব্যাপার। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই জন্ম নেয় অতি শালীনতার বোধ এবং হীন মনোবৃত্তি। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে কল্পনাপ্রতিভার। মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিরও কিছু বিপজ্জনক দিক থাকতে পারে। তবে সেগুলো জীবনের বিপদ, মৃত্যুর নয়।

www.pathagar.com

শিক্ষায় দেশপ্রেম

প্রতিটি মানুষের কিছু লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা থাকে; এর কতকগুলো একান্ত ব্যক্তিগত, বাকিগুলো অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া সম্ভব। অধিকাংশ লোকের টাকার প্রতি দুর্নিবার লোভ, আর ধনী হওয়ার চালু উপায় হল কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা। সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী ধনী হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট উপায়ের ওপর নির্ভর করে। অধিকাংশ লক্ষ্যের ক্ষেত্রে একই ব্যবসায়ে নিয়োজিত দুটি প্রতিষ্ঠান পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, তবে তারা সংরক্ষণমূলক রাজস্বের ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকে। অবশ্য শুধু টাকার জন্যই লোকেরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে যায় না। গির্জা, ভ্রাতৃসংঘ, বিদ্বজ্জন সমাজ প্রভৃতি গঠন নিয়েও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে যে অভিপ্রায়তাড়িত হয়ে লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে তার সংখ্যা কম নয়। স্বার্থের অভিন্নতা, অভিন্ন অভিমত, রক্তের সম্পর্ক তৃতীয় নম্বর। রথচাইল্ড পরিবার রক্তের বন্ধনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। সহযোগিতার জন্য তাদের কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিক ধারা-উপধারা অন্তর্ভুক্তির দরকার করেনি। কারণ তারা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারে এবং তাদের সাফল্যের মাঝখানে এই ঘটনা ছিল: ইউরোপের প্রতিটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে একজন রথচাইল্ডকে দেখা গেছে। যুদ্ধোত্তর কালে অভিন্ন অভিমতের কারণে এক ধরনের সহযোগিতা আমরা দেখেছি কোয়েকারদের মধ্যে, তাদের দাতব্য কর্মকাণ্ডে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন ছিল বলে তারা সহজে এক যোগে কাজ করতে পেরেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন এবং জয়েন্ট স্টক কম্পানির ভিত্তি হল অভিন্ন স্বার্থের বন্ধন।

একদল একটা লক্ষ্যে সংগঠিত হলো, এখন তাদের সংগঠন টিকে থাকবে শুধু তাদের ঐ অভিন্ন লক্ষ্যের জন্য। এই সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি হবে প্রাঞ্জল এবং কলাকৌশলহীন, অন্তত যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে। সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ, আমরা বলবো, কেবলমাত্র বাস্তবিক গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দেয়। যদিও সংঘের সদস্যরা আরো অনেক ব্যাপারে উৎসাহী। দ্য ফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিজ কেবল ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থ দেখে, অথচ ঐ প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিসদস্যরা হয়তো আরো অনেক ব্যাপারে উৎসাহী; তারা হয়তো নিয়মিত খেলাধুলা করে কিংবা ক্রিকেট খেলা দেখার সুযোগ কখনো নষ্ট করে না। একটা পরিবার সামগ্রিকভাবে শুধু উক্ত পরিবারের স্বার্থের কথা ভাবে, তাছাড়া গোটা পরিবারের লাভালাভের জন্য হয়তো ব্যক্তি-সদস্যের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।

মানবিক আসক্তিগুলো রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করলে তার শক্তি অনেক বেড়ে যায়। যে জনগোষ্ঠী রোববার প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা দেখতে যাওয়া পছন্দ করে সে জনগোষ্ঠী সংগঠিত

www.pathagar.com

নয় এবং রাজনৈতিকভাবে এদের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু যে সাবাথপন্থীরা চায় ওরা সিনেমা দেখতে না যাক, তারা সংগঠিত এবং এদের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। সিনেমা হলের মালিকরাও সংগঠিত। তা হলে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রোববার ছবি মুক্তি পাওয়ার বিষয়টা সিনেমা হলের মালিক এবং সাবাথপন্থীদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব, এখানে সর্বসাধারণের মতামতের কোনো মূল্য নেই।

একজন ব্যক্তি একই সময় একাধিক সংগঠনের সদস্য হতে পারেন, এই সংগঠনগুলোর কোনোটি হতে পারে কেজো, কোনোটি ক্ষতিকর এবং কতকগুলো নিষ্পাপ, কাজেরও নয়, অ-কাজেরও নয়। আমরা ধরে নিচ্ছি একজন লোক ব্রিটিশ ফ্যাসিবাদী দলের সদস্য, তার গ্রামের ফুটবল ক্লাবেরও সদস্য, আর নৃতাত্ত্বিক গবেষণা সমাজেরও সদস্য। শেষোক্ত সমাজের সদস্য হওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রশংসা কুড়াবেন, দ্বিতীয় সমাজের সদস্য হওয়ার জন্য নিরীহ এবং প্রথম সমাজের সদস্য হওয়ার জন্য তিনি অবজ্ঞেয়। তিনি নিজে ভালো কিংবা মন্দের মিশ্র অস্তিত্ব, কিন্তু সংগঠনগুলো ভালো কিংবা মন্দ। যে লক্ষ্যের জন্য লোকেরা সংগঠিত হয় সেই লক্ষ্যই নির্ধারণ করে উক্ত সংগঠন ভালো না মন্দ। এক্ষেত্রে উক্ত সংগঠনের সদস্যদের চরিত্র কোনো ব্যাপার নয়।

প্রায় সকল সভ্য দেশে রাষ্ট্র হল সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন, অতএব রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে তার লক্ষ্যসমূহ রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি বাস্তবিক এবং কার্যকর, তার অন্যান্য লক্ষ্য এক্ষেত্রে তুচ্ছ। তা হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্যগুলো বিচার করে দেখা।

রাষ্ট্রের কার্যাবলীর অংশবিশেষ আভ্যন্তরিক, অংশবিশেষ রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। এই কারণে স্থানীয় সরকারকে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করছি। একজন হয়তো বলবেন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক কার্যকলাপ কল্যাণকর, কিন্তু রাষ্ট্র তার সীমানা ছাড়িয়ে যা করে তা মোটেই কল্যাণকর নয়। এই ধারণা এতটা সরল যে একে সঠিক বলে মানা যায় না, তবে উক্ত বচন যে সত্যের কাছাকাছি এতে কোনো সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হল রাস্তা নির্মাণ, রাস্তা আলোকিত রাখার ব্যবস্থা করা, শিক্ষাসংগঠন, পুলিশবাহিনী, আইন প্রণয়ন এবং সংগঠন, ডাকঘর প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি। প্রশাসনের এব্যাপার সে ব্যাপার সম্পর্কে একজন ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, কিংবা হতে পারেন ক্ষুব্ধ, কিন্তু একমাত্র নৈরাজ্যবাদীরাই শুধু বলবেন উক্ত কার্যক্রমগুলোই মূলত নিরর্থক। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক কার্যক্রম সম্পর্কে তা হলে বলতে হয়, রাষ্ট্র নাগরিকের আনুগত্য এবং সমর্থন দাবির অধিকার রাখে।

বহির্বিশ্বের কথা উঠলে ব্যাপার অন্য রকম দাঁড়ায়। বহির্বিশ্ব ব্যাপারে বৃহৎ রাষ্ট্রের লক্ষ্য দু'টি : বাইরের আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষা, এবং বৈদেশিক শোষণের বেলায় স্বীয় নাগরিকদের সমর্থন। বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু না ভেবেই বলা যায়, এর দরকার আছে। কিন্তু অসুবিধাটা দাঁড়ায় এখানে যে, বাইরের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য যে উপায়ের দরকার করে সেই উপায়ই বৈদেশিক শোষণের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। জগতের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দেশগুলোর শ্রম ও খনিজ সম্পদ থেকে উপঢৌকন লাভ প্রত্যাশা করে। আর উপঢৌকন লাভের জন্য নিয়োগ করে সেনাবাহিনী, অথচ সেনাবাহিনীর কাজ হল দেশরক্ষা। উদাহরণত, যখন দেখা গেল যে ট্রান্সভালে সোনার খনি রয়েছে, তখন ইংরেজরা দেশটাকে জোর গলায় আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'সোনার খনি আমাদের লক্ষ্য নয়।' অথচ যেখানে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে

www.pathagar.com

সেখানেই আমরা গেছি এবং একটা যুদ্ধের পর তা আমাদের দখলে এসেছে। আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক: সবাই জানেন বৃটিশবাহিনী দক্ষিণ পারশ্যে যায় ওখানকার জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের জন্য। কিন্তু এখানে একটা কথা। ঐ এলাকায় তৈল ক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হলে আমরা কি তাদের কল্যাণের জন্য এতটা করতাম। আমি নিজে এ ব্যাপারে একেবারে নিঃসন্দেহ নই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্য আমেরিকায় যা করছে সে সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা চলে। জাপানের মানচুরিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য খুবই মহৎ, এতে কোনো সন্দেহ নেই; অথচ দেখা যাচ্ছে, এই ঘটনার সঙ্গে জাপানিদের স্বার্থ অদ্ভুত এবং কাকতালীয়ভাবে মিলে যায়। এতে অধিক বলা হয় না যে, শক্তিধর দেশের বহির্বিশ্বের সঙ্গে কার্যকলাপে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয় কিংবা নিয়োগ করার হুমকিটা থাকে। লক্ষ্য হল কম শক্তিশালী দেশের সম্পদ লুণ্ঠন। ব্যক্তি বিশেষ যদি এধরনের আচরণ করে তবে তাকে কিন্তু অপরাধী গণ্য করা হবে। তার আইনত শাস্তিও পেতে হবে। অথচ একটা দেশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন হয়ে যায়। দেশের নাগরিকরাই পররাষ্ট্র লুণ্ঠনের জন্য বাহবা জানায়।

এখন আমরা বর্তমান অধ্যায়ের বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারি। বিষয়টা হলো: স্কুলে দেশপ্রেম বিষয়ে শিক্ষাদান। এই শিক্ষা বিষয়ে কোনো প্রকার সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য শুধু এই শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে চলবে না, বাস্তবে কি ফলাফল দাঁড়াতে পারে সে সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। দেশপ্রেমের লক্ষ্য ভালো। দেশপ্রেম থাকা, এমনকি দেশের ঐতিহাসিক কৃতিত্বের জন্য গর্ব বোধ করা খারাপ কিছু নয়। এই অনুভূতি একটু জটিল; এর সঙ্গে অংশত যুক্ত দেশের মাটির প্রতি টান এবং পরিচিত পরিবেশের প্রতি অনুরাগ, অংশত পরিবারের প্রতি মমত্ববোধের বর্ধিত রূপ। তাছাড়া এই অনুভূতির শেকড় অংশত ভৌগোলিক, অংশত জৈবিক। তবে এই আদিম অনুভূতি কিন্তু স্বকীয়ভাবে রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক নয়। এই অনুভূতি স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, পররাজ্যের প্রতি বিরাগ নয়। দেশপ্রেমের আদিম রূপটা কেবল ভ্রমণের অভিজ্ঞতাহীন পল্লীর লোকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে বা যেতে পারে। শাহুরিক লোকেরা প্রতিনিয়ত আবাসস্থল পরিবর্তন করে, এদের নিজের বলে দাবি করবার মতো এক খণ্ড জমিও নেই। ফলে এদের মধ্যে কথিত আদিম অনুভূতির পরিমাণ একেবারেই কম। এদের দেশপ্রেমবোধ গ্রামীণ ভূ-স্বামী এবং কৃষকের তুলনায় নেই বললে চলে। বরং শাহুরিক লোকদের যে অনুভূতি তা প্রধানত কৃত্রিম, এবং তা তার শিক্ষা এবং সংবাদপত্র পাঠের ফল, এবং প্রায় সবটাই ক্ষতিকর। তার অনুভূতির সঙ্গে দেশপ্রেম কিংবা স্বদেশবাসীর প্রতি মমত্ববোধের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং তার মধ্যে কাজ করে বিদেশীদের প্রতি ঘৃণা এবং পররাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠনের দুর্বার বাসনা। সকল বাজে অনুভূতির মতো এই অনুভূতি আনুগত্যের ছদ্মবেশ ধারণ করে। আপনি যদি কাউকে দিয়ে ঘৃণ্য অপরাধ করাতে চান, আর সে যদি অপরাধের কথা শুনেই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তা হলে প্রথমে তার মধ্যে একদল জঘন্য অপরাধীর প্রতি আনুগত্যশীল করে তুলতে হবে। অতঃপর সে অপরাধের মধ্যে সদগুণ খুঁজে পাবে। এই প্রক্রিয়ার জন্য দেশপ্রেম হল সবচেয়ে নিখুঁত উদাহরণ। উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করুন জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধার ব্যাপারটা। পতাকা হল একটা জাতির সামরিক শক্তির প্রতীক। যুদ্ধ, বিজয়, বীরত্ব ইত্যাদির সঙ্গে পতাকার সংযোগ। বৃটিশ পতাকা বলতে ইংরেজরা বোঝেন নেলসন এবং ট্রাফালগারকে, শেক্সপিয়র, নিউটন কিংবা ডারুইনের এখানে পাত্তা মেলে না। সভ্যতার বিকাশের জন্য ইংরেজরা যা-কিছু করেছেন তার সঙ্গে জাতীয় পতাকার কোনো সম্পর্ক নেই। ইংজেরা জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সময় তদের সভ্যতার অবদানের কথা

www.pathagar.com

মনেও করেন না। তাছাড়া ইংরেজদের মহত্তম কৃতিত্ব ইংরেজ হিসেবে নয়, ব্যক্তি হিসেবে। ইংরেজ হিসেবে গর্ব করে তারা যে কৃতিত্ব অর্জন করেছে তার মূল্য খুব বেশি নয়। জাতীয় পতাকা আবার এই কৃতিত্বগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আহ্বান জানায়। প্রকৃত কৃতিত্বগুলোকে আমল দেয় না। আর যা বৃটিশ পতাকা সম্পর্কে সত্য তা Stars and Stripes সম্পর্কে সত্য, যে কোনো শক্তিশালী দেশের জাতীয় পতাকা সম্পর্কে সমানভাবে সত্য।

গোটা পশ্চিম জগতের বালক-বালিকাদের শেখানো হয় যে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আনুগত্য থাকা উচিত রাষ্ট্রের প্রতি-যে রাষ্ট্রের তারা নাগরিক। আর রাষ্ট্রীয় সরকারের নির্দেশ মান্য করে চলা কর্তব্য। পাছে এই মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেই ভয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মিথ্যা ইতিহাস, মিথ্যা রাজনীতি এবং মিথ্যা অর্থনীতির পাঠ দেওয়া হয়। তাদের পররাষ্ট্রের অপকর্ম সম্পর্কে খবরাখবর নিয়মিত সরবরাহ করা হয়, কিন্তু স্বীয় অপকর্ম সযত্নে গোপন করে। যুদ্ধ বাধলে বলা হয় যে এই যুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক, আর বৈদেশিক রাষ্ট্রের যুদ্ধ হল আক্রমণাত্মক। অপর কোনো দেশ দখল করলে বলা হয় যে সভ্যতা বিকাশের স্বার্থেই এটা করা হয়েছে। কিংবা বলা হয় গসপেল প্রচারের জন্য করা হয়েছে, কিংবা বলা হয়, নৈতিক আদর্শ, কিংবা প্রহিবিশন অথবা অন্য কিছু এর লক্ষ্য। এবং এই সবগুলোই আদর্শ হিসেবে সুমহান। ছাত্র-ছাত্রীদের আরো বিশ্বাস করতে বলা হয় যে অন্য রাষ্ট্রের নৈতিক আদর্শ বলে কিছু নেই। আর বৃটিশ জাতীয় সংগীতে বলা হয়েছে যে, Providence এর কর্তব্য হল 'তাদের ক্রুর কৌশল পরাস্ত করা'—এই কর্তব্যের জন্য Providence আমাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্ভাব্য সকল প্রকার অন্যায় আচরণ করে থাকে। অন্যায়ের ধরন এবং ব্যাপকতা নির্ভর করে সেনাবাহিনীর শক্তির ওপর। নাগরিকগণ, এমনকি মার্জিত নাগরিকরাও অপকর্ম সাধনের কর্মকাণ্ডের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। কারণ তারা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না, প্রকৃত ঘটনাও তাদের কাছে রহস্যাবৃত থেকে যায়।

ডাকাতির জন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিশ্চেতনভাবে জড়িত থাকতে সাধারণ লোক যে ইচ্ছুক হন তার জন্য দায়ী প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা। অনেকে দোষ চাপান সংবাদপত্রের ওপর, কিন্তু আমার মতে এটা তাদের ভুল। কারণ সংবাদপত্রে তো প্রতিফলন ঘটে জনগণের ইচ্ছার, আর জনগণ নিম্নমানের সংবাদপত্র চাইবেই, যেহেতু তাদের দেওয়া হয়েছে নিম্ন মানের শিক্ষা। জাতীয়তাবাদী ধরনের দেশপ্রেম সম্পর্কে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয় তো বটেই, বরং এ ধরনের দেশপ্রেমকে চিহ্নিত করা উচিত গণমূর্খা হিসেবে। অতএব এ ধরনের দেশপ্রেম থেকে ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক ও বুদ্ধিগতভাবে দূরে রাখা উচিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাতীয়তাবাদ হল আমাদের সময়ের সবচেয়ে অশুভ শক্তি। মাতলামি, মাদকদ্রব্য সেবন, বাণিজ্যে অসাধুতা কিংবা অন্য যে কোনো অকল্যাণের চেয়ে ক্ষতিকর। অন্তত প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্ষতিকর বলে গণ্য সবকিছুর চেয়ে ক্ষতিকর। যাদের পক্ষে আধুনিক জগতের জরিপ নেওয়া সম্ভব তারা উপলব্ধি করেন যে জাতীয়তাবাদের জন্যই আমাদের এই সভ্যতা বিপজ্জনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তো বলি যে, যারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির খোঁজ-খবর রাখেন তারা এ বিষয়টা ভালো করেই জানেন। সর্বত্রই এই অনিষ্টকর ও ধ্বংসাত্মক জিনিসটা প্রচারের জন্য জনগণের টাকা দেদার ব্যয় করা হচ্ছে। যারা মনে করেন পাইকারি হারে হত্যা করা মহৎ কাজ, এটা ছেলেদের শেখানো উচিত নয়, তাদের দেশদ্রোহী বলে নিন্দা করা হয়। আরো বলা হয় যে এই লোকগুলো সকল দেশের বন্ধু, শুধু স্বদেশের নয়। অথচ একজনের স্বাভাবিক

www.pathagar.com

অনুভূতি এই হবে যে তাদের সন্তানেরা অব্যক্ত যন্ত্রণার ভেতর মৃত্যুবরণ করছে দেখে ব্যথায় তাদের বুক কেঁপে উঠবে। অথচ তা হচ্ছে না। বিপদটা দৃঢ়মূল, অথচ এই বিপদ দূর করার জন্য চেষ্টিত হলে সেটা অধিকাংশ দেশের শাসক সম্প্রদায় নেক নজরে দেখেন না। সামরিক বাহিনীতে যোগদান দেশরক্ষার লক্ষ্যে মহান প্রস্তুতি বলে গণ্য করা হয়। ছেলেদের কখনো এমন কথা বলা হয় না যে সামরিক তৎপরতা কচিৎ-কদাচিৎ দেশরক্ষার লক্ষ্যে চালানো হয়, পররাজ্য আক্রমণ মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

দেশপ্রেমমূলক শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি রয়েছে। একটা আপত্তি সম্পর্কে আমরা ইতঃমধ্যেই বিবেচনা করেছি। জাতীয়তাবাদী উগ্র প্রেরণা প্রশমিত করা না গেলে এই সভ্যতা টিকবে না। আরো একটা আপত্তি হলো: যে প্রতিষ্ঠানে নরনিধনের নিয়ম আনুষ্ঠানিকভাবে শেখানো হয় সেখানে সভ্যতা, শিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ে ছেলেদের জ্ঞানদান সম্ভব নয়। আর একটি আপত্তি, ঘৃণা করার অভ্যাস গড়ে তোলা কোনো ভাল কাজ নয়। অথচ এটাই জাতীয়তাবাদী শিক্ষার দরকারি অঙ্গ। সবচেয়ে বড় আপত্তি তা হলো, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে শিক্ষাদান আসলে মিথ্যা বুলি শেখানোর নামান্তর। দুনিয়ার সকল দেশেই ছাত্রদের শেখানো হয় যে তাদের দেশটাই সবার সেরা এবং একটি দেশ ছাড়া সব দেশের জন্যই এই ধারণা ভুল। আমরা যেহেতু নির্ণয় করতে পারছি না যে এই ধারণা কোন দেশের ক্ষেত্রে সত্য, তাই একটা দেশের মর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে অপর একটি দেশকে বড়ো করে দেখার এই অভ্যাসটা পরিত্যাগ করাই তো সমুচিত। এই যে মনে করা হয় ছাত্রদের সম্ভব হলে শুধু সঠিক ও সত্য জ্ঞান দেওয়া উচিত, এই ধারণা একেবারে ভুল, এবং মারাত্মক, অনেক ক্ষেত্রে এগুলোর প্রয়োগও অবৈধ। তবে মিথ্যে বুলি শেখানো একেবারে বাজে ব্যাপার। জগতের সকল দেশে ইতিহাসের জ্ঞান একইভাবে দেওয়া উচিত। আর ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত লিগ অব নেশনসের ওপর। যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েৎ ইউনিয়ন থেকে সহকারী নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ইতিহাস হবে বিশ্ব ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস নয়। ইতিহাসে গুরুত্ব পাবে সংস্কৃতি, যুদ্ধের কাহিনী নয়। যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু শেখাতে হলে বিজরীর দৃষ্টিকোণ থেকে শেখালে চলবে না, শুধু বীরগাথা রচনাও ঠিক হবে না। ছাত্ররা যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের পাশে দাঁড়াবে, যুদ্ধে বিধ্বস্ত এলাকার গৃহহীন লোকদের প্রতি প্রদর্শন করবে প্রগাঢ় মমত্ববোধ। ছাত্রদের বুঝতে হবে যুদ্ধ কতো নির্দয়তা এবং অন্যায়ের জন্ম দেয়। বর্তমানে ইতিহাসের বইগুলো যুদ্ধকে গৌরবান্বিত করে। এদিকে বিদ্যালয়গুলো যে ভাবে শিক্ষা দেয় তার বিরুদ্ধে শান্তিবাদীরা প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই করতে পারেন না। অবশ্য এই মন্তব্য কেবল ধনীর সন্তানদের স্কুলের বেলায় খাটে। তাদের স্কুল দরিদ্রদের স্কুলের চেয়ে নৈতিক ও বুদ্ধিগত উভয় দিক বিবেচনায় হীন। ছাত্ররা স্কুলে ভিন্ন দেশের ত্রুটিগুলো সম্পর্কে জানতে পারে, নিজের দেশের ত্রুটিগুলো সম্পর্কে থাকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে। কেবল অপর দেশের ত্রুটি সম্পর্কে জানলে একজন নিজেকে অতি মহান ভাবতে শুরু করে, তার মনোভাব হয়ে দাঁড়ায় অতিরিক্ত যুদ্ধংদেহী, অথচ নিজের দেশের ত্রুটিগুলো সম্পর্কে জানলে সেটা অনেক উপকারে আসে। ইংরেজ বালকদের স্কুলে আয়ারল্যান্ডের ব্ল্যাক ও ট্যানদের সম্পর্কে কোন সত্য তথ্য পরিবেশন করা হয়? কিংবা ফরাসি স্কুলগুলোতে রুর অঞ্চলের দখলদার অশ্বেতাঙ্গ বাহিনী সম্পর্কে কোন সত্য তুলে ধরা হয়? ম্যাক্কো, ভ্যানজেটি, কিংবা মুনি ও বিলিং সম্পর্কে মার্কিনি বালকদের কি জ্ঞান প্রদান করা হয়? সত্য গোপন করার জন্যই প্রত্যেক সভ্য দেশের সাধারণ নাগরিকগণ আত্ম-তুষ্টিতে ভোগে। তারা অপর দেশ সম্পর্কে যা জানে নিজের দেশ সম্পর্কে তা জানে না। আবার নিজের দেশ সম্পর্কে তারা যা জানতে পারে তার মূল্য কিছুই না।

www.pathagar.com

দেশপ্রেম সম্পর্কে যা শেখানো হয় তার প্রায় সবটাই বুদ্ধিগত দিক থেকে বিপথগামী, কিন্তু নৈতিক বিচারে নির্দোষ। আর যে শিক্ষক শেখানোর দায়িত্ব পালন করেন তিনি নিজেই ভুল শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতর শিক্ষা লাভ করেছেন। তারা শিখেছেন যে, এই জগতের বিদেশী লোক বলতেই যেহেতু দুষ্ট লোক বুঝতে হবে, অতএব বড়ো ধরনের বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে বিরাট সামরিক প্রস্তুতি নিতান্ত জরুরি। দেশপ্রেমমূলক প্রচারণার অবশ্য একটি অপেক্ষাকৃত কম নির্দোষ দিক রয়েছে। কিছু কিছু ঘটনা থেকে বিপুল অর্থ বানানো যায় যেমন অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ কিংবা সংগ্রহ থেকে। অনুন্নত দেশসমূহে বিনিয়োগ করেও টাকা বানানো চলে। কোনো দেশের তৈল ক্ষেত্রের যদি আপনি মালিক হন তা হলে তেল তুলে আনার জন্য আপনাকে দু'টি কাজ করতে হবে। প্রথমত, তৈল উত্তোলনের জন্য সরাসরি খরচ করতে হবে; দ্বিতীয়ত, নেটিভদের বশে রাখার জন্য করতে হবে রাজনৈতিক কিংবা সামরিক ব্যয়। প্রকৃত পক্ষে উত্তোলনের খরচটাই শুধু আপনাকে বহন করতে হবে। দ্বিতীয় কাজটির জন্য ব্যয় অনেক বেশি করতে হবে, তবে টাকাটা আপনার পকেট থেকে যাবে না। করদাতার টাকা থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হবে। করদাতা টাকা দেবেন এজন্য যে দেশপ্রেমমূলক প্রচারণা দ্বারা তাদের ইতোমধ্যেই বশীভূত করা হয়েছে। এভাবে দেশপ্রেম ও দেশের আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে একটা অবাঞ্ছিত যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এবং এ ব্যাপারটাও ছাত্ররা যাতে বুঝতে না পারে তার জন্য সকল ব্যবস্থা যত্নের সঙ্গে গৃহীত হয়।

অতিরিক্ত সমরবাদী দেশপ্রেমের সঙ্গে টাকা–পয়সার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। দেশের সেনাবাহিনীকে নাগরিকদের আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে নিয়োগ করা যায়। এবং এই কাজটি করা হয় অন্য দেশ থেকে উপঢৌকন কিংবা ক্ষতিপূরণ আদায় করে কিংবা ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দিয়ে (অন্যথায় সেনাবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করা হবে), কিংবা জবরদস্তি করে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়, কিংবা সম্পাদন করা হয় বাধ্যতামূলক বাণিজ্যিক চুক্তি। গোটা ব্যাপারটাকে যদি দেশপ্রেমের রঙে পুরো রঞ্জিত করা না যায় তা হলে যে কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোকের কাছে ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত অর্থগৃধ্নুতা ও দুরাচার সহজেই ধরা পড়ে। আমরা যদি চাই তা হলে শিক্ষা ব্যবস্থা অনায়াসে মানব জাতির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলার পক্ষে কাজ করে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা জনগণকে বোঝানোর দায়িত্বও পালন করতে পারবে। আমরা চাইলে এক প্রজন্মের মধ্যেই সমরবাদী জাতীয়তাবাদ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি। শুকর যে দেয়াল আমাদের দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করছে তাও নিশ্চিহ্ন করা যায়। যে সমরাস্ত্র ভাণ্ডার আমাদের পৃথিবী–পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার হুমকি দিচ্ছে তাও বিলুপ্ত করা সম্ভব। যে ঘৃণা আমাদের নাক কেটে সমান করছে তা দূর করতে পারি, সহজেই পারি সদিচ্ছা দ্বারা। যে জাতীয়তাবাদ আজ জগতের সর্বত্র বাড়াবাড়ি করছে তার আতুড়–ঘর হল স্কুলগুলো, এই অবস্থার অবসান আশু প্রয়োজন। শিক্ষার মধ্যে ভিন্ন উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা আজ জরুরি হয়ে পড়েছে।

নিরস্ত্রীকরণের মতো এই ব্যাপারটাও আন্তর্জাতিক ঐকমত্য দ্বারা সমাধা করতে হবে। লিব অব নেশনস আক্রমণকারীদের তোষণ কমিয়ে যদি একটু সময় করতে পারে তা হলে আগে হোক পরে হোক এ ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। বিভিন্ন দেশের সরকার মিলিত হয়ে অভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন ব্যাপারে সম্মত হতে পারেন। অবশ্য এমন হতে পারে যে পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধের পর যদি কিছু লোক বেঁচে থাকে তা হলে তারা একটা জরুরি সিদ্ধান্ত নেবে। তারা নিজ নিজ দেশের জাতীয় পতাকা বর্জন করে লিগ অব নেশনস–এর পতাকা ব্যবহার করবে। কোনো সন্দেহ নেই যে আমার ধারণা ইউটোপিয়ান। শিক্ষকদের

www.pathagar.com

স্বভাবই এই যে তারা জানে যতটুকু তাই শেখায়, তাদের জানার পরিমাণ যতই কম হোক না কেন। ভেবে দেখুন একজন ইংরেজ ইতিহাসের শিক্ষককে আন্তর্জাতিক সম্মতি দ্বারা হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে তাকে বিশ্ব ইতিহাস পড়াতে হবে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে কখন হিজরি সন শুরু হয় এবং কোন তারিখে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ঘটে। চেঙ্গিস খান এবং আইভ্যান দ্য টেরিবল সম্পর্কে তাদের জানতে হবে, আরো জানতে হবে নাবিকদের ব্যবহার্য কম্পাস কিভাবে চিন থেকে আরব্য নাবিকদের হাতে আসে এবং কীভাবে গ্রিকরা সর্বপ্রথম গৌতম বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করে। এসব জানতে যদি তাদের বাধ্য করা হয় তা হলে এটা অনুমান করা কঠিন নয় যে এই শিক্ষকদের ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে যাবে। তারা তখন নতুন সরকার গঠনের দাবি উত্থাপন করবে, যে সরকার লিগ অব নেশনসের নির্দেশ অস্বীকার করার অঙ্গীকার করেছে। গোটা পশ্চিম বিশ্বের সক্রিয় শক্তি হল পুঁজিবাদী উদ্যোগের, এবং সর্বোপরি এই শক্তি ধ্বংসাত্মক। শিক্ষক শ্রেণীর লোকেরা অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন, অথচ এই শ্রেণীগুলো বরং স্থিতাবস্থা বজায় থাকলে সন্তুষ্ট। সামাজিক উন্নতির জন্য পাঠসূচি পরিবর্তন অত্যাবশ্যক অথচ তারা পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের একেবারে পক্ষপাতী নয়। তারা যে উদ্যোগ এড়িয়ে চলতে চান তা কেবল বুদ্ধিগত নয়, আবেগগতও। পরিচিত আবেগ সহজে আসে; আর পরিচিত মুহূর্তে নতুন আবেগ অনুভব করা দুরূহ ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর মুহূর্তের কথা বলা যায়। ফলে আমাদের এই আধুনিক জগৎ (যেখানে সৎ ব্যক্তিরা অলস এবং অসৎ ব্যক্তিরা কর্ম-তৎপর) ক্রমাগত মাতালের মতো ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। কোনো-কোনো মানুষ চোখের সামনে নরক দেখতে পায়, কিন্তু অবাস্তব আবেগের উন্মত্ততা অবিলম্বে তাদের চোখ বন্ধ করে দেয়। যারা নেশাগ্রস্ত নন, তারা বিপদটা পরিষ্কার দেখতে পান। আর আমাদের সভ্যতা যে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলছে তার পেছনে প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করছে জাতীয়তাবাদ।

www.pathagar.com

শিক্ষায় শ্রেণীচেতনা

সভ্যতার সেই উষালগ্ন থেকে শ্রেণী-বৈষম্য চলে আসছে। আজকের দিনের আদিম বর্বর উপজাতিগুলোতে এই বৈষম্যের রূপটা খুবই সরল। প্রত্যেক উপজাতির সর্দার রয়েছে এবং তারা একাধিক স্ত্রী পোষার অধিকার রাখেন। বর্বর উপজাতিসমূহ স্ত্রীদের সম্পদের উৎসে পরিণত করার একটা উপায় উদ্ভাবন করেছে, যা সভ্য মানুষেরা পারেনি। ফলে একজন যত বেশি সংখ্যক স্ত্রী পুষতে পারেন তিনি তত বেশি সম্পদের অধিকারী হন। তবে এই আদিম সামাজিক বৈষম্য অবিলম্বে এক নতুন ও জটিল ধরনের কাঠামোর কাছে হার মানে। সামাজিক বৈষম্য প্রধানত উত্তরাধিকার আইনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত ছিল। ফলে, সকল পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতেন। কিছু-কিছু লোকের সম্পত্তির প্রধান উৎস ছিল সামরিক শক্তি। সফল যোদ্ধারা সম্পদ লাভ করতেন এবং পুত্রসন্তানের জন্য রেখে যেতেন। তরবারির সাহায্যে যে সম্পত্তি লাভ করা হত তার সিংহভাগ ছিল জমি-জমা কিংবা ভূ-খণ্ড। আজকের দিনেও বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়া আভিজাত্যের লক্ষণ। আর অভিজাতরা কাগজে-কলমে ছিলেন কোনো ফিউড্যাল ব্যারনের উত্তরপুরুষ। যে ব্যারন পূর্ববর্তী ভূম্যধিকারীকে হত্যা করে ঐ ভূ-খণ্ড অধিকার করেছেন, এবং বাহুবলে অধিকার কায়েম রেখেছেন। সম্পদ আহরণের এই উপায়কে সবচেয়ে সমীহ করা হয়। আরো কিছু উপায় রয়েছে যে গুলোকে ততটা শ্রদ্ধেয় মনে করা হয় না। এক ধরনের লোক আছেন, যারা নিদারুণ অলস, কিন্তু কর্মোদ্যোগী পূর্বসূরির কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন। আরো এক শ্রেণীর লোক রয়েছেন যারা স্বীয় পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে লাভ করেছেন সম্পদ। আধুনিক জগতের ধনিক-শ্রেণী কিন্তু কর্মবিরতি মানে না। এরা অভিজাত শ্রেণীর লোকদের ক্রমান্বয়ে হটিয়ে দিচ্ছেন পেছনের সারিতে। এই অভিজাত শ্রেণীর আয়ের উৎস ভূ-সম্পত্তি। প্রাকৃতিক সম্পদের একচেটিয়া মালিকানা থেকেও এদের আয় হত। সম্পত্তি লাভের প্রধানত দুটি উৎস ছিল: আভিজাতিক উৎস: দ্বিতীয়টি হল বুর্জোয়া উৎস, অর্থাৎ স্বীয় শ্রমের বিনিময়ে সামগ্রী উৎপাদনের অধিকার। এই অধিকার অবশ্য কেবল কাগজে-কলমেই ছিল। কারণ পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করা হয় অন্যান্য সামগ্রী থেকে। আর যিনি সামগ্রী উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করেন, তিনি শ্রমের মজুরি পরিশোধের বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীর ওপর অধিকার কায়েম করেন। আর যেখানে ক্রীতদাস প্রথা চালু আছে সেখানে ক্রীতদাসের নিতান্ত ভরণপোষণের জন্য সামান্য ব্যয় করেন। তা হলে আমরা দেখতে পাই যে সমাজে তিন শ্রেণীর লোক রয়েছেন; ভূমির মালিক, পুঁজিবাদী এবং সর্বহারা। পুঁজিবাদী হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি এক সময় পণ্য-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য কিছু কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মতো যথেষ্ট টাকা সঞ্চয় করেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি এই

www.pathagar.com

অধিকার লাভ করেছেন যে মজুরি পরিশোধ করে উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীর মালিক হবেন। কাগজে-কলমে গোটা মানবেতিহাস জুড়ে এই তিনটি শ্রেণী, ভূমির মালিক, পুঁজিবাদী এবং সর্বহারাদের দেখতে পাই। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা একটু ভিন্ন। কারণ একজন ভূমির মালিক বাণিজ্যিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সমুদ্র-সৈকতে নিজস্ব ভূমির ওপর মোটেল নির্মাণ করতে পারেন। একজন পুঁজিবাদী উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় সূত্রে লব্ধ আয়ের একটা অংশ বিনিয়োগ করতে পারেন জমি ক্রয় এবং উন্নয়নে, আর উক্ত জমি থেকে লব্ধ খাজনার টাকায় স্বীয় জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। একজন সর্বহারাও প্রাপ্ত মজুরির একটা অংশ সঞ্চয় করে এবং সঞ্চিত অর্থ দিয়ে বাড়ি ক্রয় করতে পারেন। তা হলে তিনিও জমির মালিক কিংবা পুঁজিপতিতে পরিণত হন। একজন কীর্তিখ্যাত ব্যারিস্টার প্রত্যেক কেসের জন্য হাজার গিনি দাবি করেন এবং পেয়ে থাকেন। এখানে যদি সর্বহারার সংজ্ঞা কঠোরভাবে আরোপ করা হয় তা হলে আমাদের মেনে নিতে হবে যে একজন ব্যারিস্টারও সর্বহারা। তবে তাকে সর্বহারা গণ্য করলে কিন্তু তিনি নির্ঘাত ক্ষেপে যাবেন। কারণ তার মানসিকতা খাঁটি ধনিক শ্রেণীর।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে শ্রেণী বৈষম্য নির্ভর করে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এবং উত্তরাধিকার আইনের ওপর। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথার জন্য ধনীর সন্তানেরা পৃথক শিক্ষা পায়, অবশ্য সে শিক্ষা যে সব সময় উন্নততর হয় এমন মনে করা যাবে না। উত্তরাধিকার আইনের কারণে ধনীর দুলালেরা অলস, কর্মহীন জীবন বেছে নিতে পারে। এবং এর জন্য তাদের মোটেই অনাহারে থাকতে হবে না। উত্তরাধিকার আইন বলতে যদি কিছু না থাকতো তা হলে কয়েক প্রজন্মের মধ্যে সকল বৈষম্য মুছে যেত। আর পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা না থাকলে ধনীর সন্তানেরা দরিদ্রের সন্তান থেকে আলাদা শিক্ষা পেত না। সমাজতন্ত্রীরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলেন, তাদের বিশ্লেষণে পুঁজি গঠনে কী কী উপাদান কাজ করে তার ব্যাখ্যা থাকে না। পুঁজিবাদীদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সবটা নয়। পুঁজিবাদীর সন্তান সম্পদের কারণে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে, এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাস্তবিক ও আবশ্যিক ঘটনা। আমি এটা মার্ক্সবাদের সমালোচনা হিসেবে উল্লেখ করছি না, কারণ মার্ক্স অর্থনীতির সঙ্গে পরিবারের সংযোগটা বুঝতে পারতেন। তবে কিছু-কিছু ইংরেজ সমাজতন্ত্রীর সমালোচনা করার জন্য আমি এর উল্লেখ করেছি। এই সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন বিবাহ ও পরিবারের সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর অনিবার্য কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ বাস্তবে সম্পর্কটা পারস্পরিক ব্যাপার। যে বুর্জোয়া ব্যক্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির পাহাড় গড়ায় ব্যস্ত তিনি স্ত্রী ও সন্তানকেও এক ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে দেখেন। অন্য দিকে যৌনহিংসা ও পিতৃস্নেহের জন্যই মানুষ নারী এবং সন্তানাদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে চায়। এই ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বাসনা থেকে তাদের মধ্যে অন্য ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকার বাসনাও জাগে। আদিম সমাজে পুরুষ সম্পদ কামনা করে এজন্যে যে এতে একাধিক স্ত্রী পোষা সহজ হবে। সভ্য সমাজে সম্পদশালী হওয়ার ইচ্ছা এজন্যে জাগে যে এতে স্ত্রী ও সন্তানের পক্ষে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা ভোগ করা সম্ভব হয়। অতএব ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে সম্পদ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে নারী ও সন্তানের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। এটা মনে হয় না যে একটা ভেঙে পড়লে অপরটা ভেঙে পড়বে না। নারী ও সন্তানাদি ব্যক্তিগত হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। আর শিক্ষায় শ্রেণীবিভেদ চলে আসে। এখন সাম্যভিত্তিক সমাজ (কম্যুনিজম) প্রতিষ্ঠিত হলে এ ব্যাপারগুলো কিরূপ নেবে তা নিয়ে বর্তমান পর্যায়ে আলোচনা করছি না।

অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতার সামাজিক অবস্থান সন্তানের অবস্থান নির্ণয় করে। ফলে যে সমাজে শ্রেণী বৈষম্য বিদ্যমান সেখানে সন্তানের মর্যাদা শুধু তার মেধার ওপর নির্ভর করে না,

www.pathagar.com

পিতার সম্পদের পরিমাণের ওপরও নির্ভর করে। ধনীর সন্তানেরা এই বিশ্বাস অর্জন করে যে তারা দরিদ্রের সন্তানের চেয়ে উন্নততর। দরিদ্রের সন্তানদেরও বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে তারা ধনীর সন্তানের চেয়ে হীন। এটা না করলে দরিদ্রের সন্তানদের মন বিক্ষুব্ধ হতে পারে। ফলে যেখানে শ্রেণী বিষম্য বিদ্যমান সেখানে শিক্ষাব্যবস্থায় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি ত্রুটি থেকে যায়। সম্পদশালীদের মনোবৃত্তি হয় উগ্র আর দরিদ্রদের অযথা হীন গণ্য করার বদভ্যাস জন্মে। ধনিক শ্রেণীর উগ্র মনোবৃত্তি কেন আপত্তিজনক সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। হিব্রু প্রফেটদের সময় থেকে সকল নীতিবিশারদ এ ব্যাপারে আপত্তিও জানিয়ে আসছেন। তবে নীতিবিশারদরা বোঝেন যে শুধু ওয়াজ-নছিহত করে এই অকল্যাণ দূর করা যাবে না। এবং ভিন্ন অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করেই শুধু এই অকল্যাণ দূর করা সম্ভব। দরিদ্রের সন্তানেরা হীন মনে করবে নিজেদের, ধনীর এই আহলাদী ইচ্ছা থেকে যে অকল্যাণ জন্মে তার ধরন একেবারে আলাদা। দরিদ্র লোকজন যদি নিজেদের হীন ভাবতে শুরু করে তা হলে তারা উদ্যমহীন হয়ে পড়বে, তাদের আত্ম-মর্যাদাও হ্রাস পাবে। হীনমন্যতা জাগাতে না পারলে তাদের মধ্যে ধ্বংসাত্মক ক্ষোভের সৃষ্টি হবে। হীনমন্যতা বোধ সৃষ্টি হোক বা না হোক, হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি করতে গেলে মিথ্যে কথা তাদের দিয়ে গেলাতেই হবে। প্রথমত গেলাতে হবে নৈতিক মিথ্যাচার, তাদের বোঝাতে হবে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিদ্যমান যে ধন্যবৈষম্য তা অন্যায় নয়। দ্বিতীয়ত, অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অর্থনৈতিক মিথ্যাচার: চালু অর্থ ব্যবস্থা সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থার মধ্যে মহোত্তম। তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক মিথ্যাচার। অতীতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হয়েছে তা ধনীর দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা। যদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের অবস্থা সর্বহারার চেয়ে উন্নত না হয় তা হলে তারা যা শেখাচ্ছে তা বিশ্বাস করার জন্য তাদের দরকার করবে ক্রীতদাসের আত্মা, বিশ্বাস না করেও শেখাতে গেলে সাহসের অভাব জরুরি হয়ে পড়বে।

শিল্প যুগের সূচনার আগে ধন-সম্পদের মালিক ছিল অভিজাত শ্রেণী। তখন ধন-বৈষম্যের পক্ষে কথা বলা হত অভিজাত শ্রেণীতে জন্মের দোহাই পেড়ে। ঐ শ্রেণীর হাতে যে সম্পদ কুক্ষিগত, তার খুব একটা উল্লেখ করা হত না। তাছাড়া জন্ম-গরিমার অর্থনৈতিক উৎস রাখা হত গোপন। নিষ্কপর্দক, নির্বাসিত গোষ্ঠীপতিকে একজন সফল সুদখোর মহাজনের চেয়ে অধিক মর্যাদা দেওয়া হত। তথাপি সম্পদই ছিল মূলত শ্রদ্ধার বস্তু। কারণ আন্তর্জাতিক বংশপরম্পরা ছিল ধন-সম্পদের প্রকৃত উৎস। অভিজাততন্ত্র যেখানে খুবই সরল, সেখানে ঐ তন্ত্রের প্রতি আস্থা চাঙা করা হয় এক গাদা বাজে কথা বলে। যেমন বলা হয়, অভিজাতরা আদব-কায়দাটা খুব ভালো জানে, এদের শিক্ষা-দীক্ষা বেশি, অন্যান্য লোকের চেয়ে এদের অনুভূতি সূক্ষ্মতর। যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনিকতান্ত্রিক সমাজে দমবাজির চেহারাটা একটু ভিন্ন। ধরে নেওয়া হয় যে সফল ধনিকতন্ত্রী উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন কঠোর পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা এবং বিবেকী ক্ষমতার বিনিময়ে। তিনি তার মর্যাদা কাজে লাগাবেন পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে, সর্বজনীন মঙ্গল হবে তার লক্ষ্য। গত শতাব্দীর ষাটের এবং সত্তরের দশকে যখন ধনিকশ্রেণী ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ছে তখন অ্যাডামস পরিবার সম্পদ অর্জনের নেপথ্য কাহিনী ফাঁস করে দেয়, একে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া বলা চলে। ফলে জানা যায় যে, ছল-চাতুরী এবং অবৈধ উপায় অবলম্বন করেই ধনিকতন্ত্রী শ্রেণী সম্পদের পাহাড় গড়েছে।* গোটা আশির ও নব্বই-র দশকে স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির ব্যবসাকৌশলের বিরুদ্ধে অনেক পুস্তক লেখা হয়েছে। আজকাল এ-সবের বিপুল পরিবর্তন

* দেখুন : High Finance in the Sixties, by the Brothers Adams, Reprinted by Yale University Press.

www.pathagar.com

সাধিত হয়েছে। বড়ো বড়ো ধনিকতন্ত্রীকে গণ্য করা হয় জনগণের বিরাট হিতসাধক হিসেবে। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় এই ধনিক শ্রেণীর কাছ থেকে নিয়মিত মোটা অঙ্কের টাকা পায় কিংবা পাবার আশা রাখে। প্রত্যেক বিদ্যায়তনিক তরুণ আশা করে যে সে কোনো কোটিপতির কাছ থেকে রিসার্চ ফেলোশিপ লাভ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংবাদপত্রগুলো ধনীদের নিয়মিত প্রশংসা করে, আর সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয় যে এক জন মানুষ তার আয়ের অনুপাতে পুণ্যবান হয়ে থাকে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে শ্রেণীবৈষম্য যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, অভিজাততন্ত্রী দেশে তার থেকে কম নয়। নরওয়ে এবং ডেনমার্কের মতো দেশে কিন্তু শ্রেণী-বৈষম্যের গুরুত্ব এতটা প্রবল নয়। এসব দেশে আরাম-আয়েসের মোটামুটি ভাগাভাগি হয়। তাছাড়া এই দেশগুলোতে ধনীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য।

শ্রেণী-বৈষম্য দ্বারা যে ক্ষতি করা হয় তা কিন্তু শুধু শিশু-কিশোরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর লম্বা হাত শিক্ষক ও পাঠ্য বিষয়ও স্পর্শ করে। দৈহিক প্রস্তুতির চেয়ে মানসিক প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় অনেক বেশি, ফলে শিক্ষকরাও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রশ্নে উদাসীনতা দেখান, শারীরিক অসুখের প্রাথমিক লক্ষণ সম্পর্কে থাকেন একেবারে অজ্ঞ। দেহ ও মনের বিভেদ কল্পনাটাই কৃত্রিম এবং বাস্তবতাবিবর্জিত। অথচ সমাজের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগে এর গুরুত্ব খুব বেশি। ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় দেহের যত্ন এবং মনের যত্ন ভিন্ন ব্যাপার, অথচ তা হওয়া উচিত নয়। অবশ্য সাম্প্রতিককালে অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। অতীতে বধির বালককে ক্লাসে অমনোযোগী হওয়ার জন্য বছরের পর বছর শাস্তি প্রদান করা হত। অনুসন্ধান করে দেখা হত না যে ছেলেটা মনোযোগী হবে কি, সে তো কানেই শুনতে পায় না। যদিও এ ধরনের বিকট উদাহরণ আজকের দিনে হয়তো সৃষ্টি হবে না, তবে এই ত্রুটি প্রচ্ছন্নভাবে এখনো বিদ্যমান। উদাহরণ, শিক্ষক হয়তো ছাত্রের হজম করার শক্তি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। হয়তো একটি ছাত্র নিদারুণ কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছে বলে তার মেজাজ সব সময় ভালো থাকে না। অথচ শিক্ষক না জেনে ওর ওপর অতিরিক্ত রুষ্ট। যদি শিক্ষকদের বলা হয় তারা যেন ছাত্রদের পেটের খবরাখবর নিয়মিত রাখেন তা হলে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হল বলে মনে করবে। এখানে পাঠক সমাজ যেন আমাকে ভুল না বোঝেন। আমি জানি আজকের প্রতিটি আধুনিক স্কুলে ছাত্রের শরীরের যত্ন নেওয়া হয়। তাদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য নানা ব্যবস্থা থাকে। অতীতে যা কল্পনা করা যেত না। আমার আপত্তিটা এখানে যে দেহ এবং মনের যত্নের ব্যাপারটা এত আলাদা করে দেখা হয় যে যিনি একটা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তিনি অপরটা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ থাকেন। একজন বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেহ ও মনের মাঝখানে বিরাট ফারাক। কিন্তু এই ফারাকের কোনো দার্শনিক কিংবা আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা নেই। এটা শিক্ষার ফসল। কোলের শিশুর ক্ষেত্রে এই ফারাক একেবারে নেই। একটু বড়ো হলে কিছুটা ফারাক সৃষ্টি হবে। পরে ফারাকটা আরো বাড়বে। আমি তো মনে করি একটা দশ বছরের ছেলে দেহ ও মনের ব্যাপারে গভীর কিছু বলতেই পারবে না। একটা ছেলে তৎক্ষণাৎ বুঝবে যদি আপনি তাকে বলেন: 'তোমার মনের যত্ন নিয়ে থাকে মিস এ, আর তোমার দেহের যত্ন নিয়ে থাকে মিস বি।' এই মিস এ ও মিস বি-এর মধ্যেকার পার্থক্যই পরবর্তীকালের মন ও বস্তুর মধ্যেকার পার্থক্যের নির্ণায়ক। যদি মিস এ ও মিস বি-কে মিস সি-তে সমন্বিত করা হয় তা হলে প্রতিটি সন্তান বড়ো হবে নিরপেক্ষ একত্ববাদী (Neutral monist) হিসেবে, আর বিশ্বাস করবে যে মন ও বস্তু একই জিনিশের দুই ভিন্ন রূপ। এইভাবে অধিবিদ্যা শ্রেণী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। মানসিক কর্মকাণ্ডের জন্য হাত কিংবা পায়ের দরকার করে না। শারীরিক কর্মকাণ্ডের জন্য দরকার হাত-পায়ের।

www.pathagar.com

শারীরিক কর্মকাণ্ড মানসিক কর্মকাণ্ডের চেয়ে হীন। কারণ কাজটা যারা করেন তাদের কাজটা করিয়ে নেওয়ার জন্য ভৃত্যের দরকার করে। তা হলে ঘটনা দাঁড়ায় এই যে, দেহের আত্মা মহৎ, বস্তু হচ্ছে মূর্তিমান অমঙ্গল, ইত্যাদি।

পাঠ্যসূচির ক্ষেত্রেও সম্পদের প্রতি অতি ভক্তি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অবশ্য আজকের দিনে এই প্রতিক্রিয়া খুব একটা বোঝা যায় না। ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত সকল সমাজের মতো গ্রিকরাও মনে করতেন শারীরিক শ্রম কদর্য ব্যাপার। এ জন্যই তারা সংস্কৃতি, দর্শন এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতেন। কারণ এগুলো চর্চার জন্য কায়িক শ্রমের দরকার করে না, অর্থাৎ হাত খাটাতে হয় না। তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে কায়িক শ্রম দেওয়া ভদ্রলোকের কাজ নয়। ফলে তারা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে নি। সিরাকুজ নগর অবরোধ কালে প্লুটার্চ আর্কিমিডিসের উদ্ভাবনা বর্ণনা করে ঐ বিজ্ঞানীর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এই বলে যে, আর্কিমিডিসের কাজটাকে কোনো মতেই কদর্য বলা যাবে না, কারণ তিনি যা কিছু উদ্ভাবন করেছেন তা তার সম্রাট মামাত ভাই-র জন্য। সংস্কৃতি সম্পর্কে রোমকদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রিকদের অনুরূপ ছিল, আজকের দিনেও পশ্চিম ইউরোপের প্রতিটি দেশে এই দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান। সংস্কৃতি জিনিশটা পুস্তক পাঠ করে কিংবা বাক্যালাপ করেই অর্জন করা যায়। এর বহির্ভূত কোনো কিছুর কথা উঠলে বুঝতে হবে সেটা গ্রিসীয় অর্থে সংস্কৃত নয়। আর এখনও, অন্তত ইংলন্ডে, স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সাহিত্য রুচিসম্পন্ন বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরা সংস্কৃতি জিনিশটা গ্রিসীয় অর্থে বুঝে থাকেন। এটা শুধু পুরাকালীন গ্রিস ও রোমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, আধুনিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হেনরি ক্যাভেনডিশ কিংবা রবার্ট বয়েলের চেয়ে হোরেস ওয়ালপোল কিংবা বলিংব্রোক সম্পর্কে বেশি জানলে অতি সংস্কৃতিবান গণ্য করা হয়। অথচ রবার্ট বয়েল এবং হেনরি ক্যাভেন্ডিসের গুরুত্ব যে অনেক বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চূড়ান্ত বিচারে এসবই এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত যে তাকেই ভদ্রলোক মনে করতে হবে যিনি হাত দিয়ে কোনো কাজ করেন না। অবশ্য 'ভদ্রলোকেরা' যুদ্ধের মতো শিল্পকলা ব্যাপারে হাত লাগাতে কুণ্ঠিত হন না। একজন ভদ্রলোক, সত্যিই ভদ্রলোক হলে, তরবারি ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু কুত্রাপি টাইপরাইটার ব্যবহার করেন না।

এ ধরনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ থেকে অনেক এগিয়ে আছে। এগিয়ে থাকার কারণও আছে। ইউরোপে যখন অভিজাততন্ত্র জাঁকিয়ে বসে আছে তখন যুক্তরাষ্ট্রে এটা কার্যকরভাবে বিলুপ্ত করা হয়েছে। তবে সেখানেও শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা নতুন ধরনের শ্রেণীবৈষম্য গজিয়ে উঠেছে। এই বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে ব্যবসা ব্যবস্থাপক এবং উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত লোকদের মধ্যে। ব্যবসা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা ভবিষ্যতের অভিজাত। ডিসেরেলির উপন্যাসে গ্রেট নোবলম্যান বলতে যা বোঝাতো আধুনিক আমেরিকায় তাকে বোঝায় গ্রেট এক্সিকিউটিভ। আজকের সাংস্কৃতিক আদর্শের ওপর এক্সিকিউটিভদের প্রভাব অপরিসীম। ডিসরেলির ডিথ্যার‍্যামবিক দিবাস্বপ্নে বিভোর গ্রেট নোবলম্যানরা, কোনো সন্দেহ নেই যে, সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তবে এই ক্ষমতা তাদের অর্জন করতে হত না, তারা এমনিতেই ক্ষমতার অধিকারী হতেন। আর এই ক্ষমতা তারা নিদারুণ আলস্যের সঙ্গে খাটাতেন। তারা বিপুল ধন-সম্পদ নিয়ে গর্বও করতেন না। তাদের গর্ব ছিল বরং স্বীয় শিষ্টাচার সম্পর্কে, তারা ভালো মদ সম্পর্কে যাবতীয় খবর রাখেন, এটা তাদের গর্বের ব্যাপার ছিল। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল, এটাও কম গর্বের বিষয় নয়; রেনেসাঁস চিত্রকলার প্রতি তিনি সুবিচার করতে

www.pathagar.com

পারেন, তিনি তীক্ষ্ণ, ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তি করতে সুদক্ষ, এগুলোও তার গর্বের বস্তু। সাধারণভাবে বলা চলে যে অভিজাতদের কৃতিত্বগুলো ছিল তুচ্ছাতিতুচ্ছ, এবং অসার, তবে বাজে নয়। আমাদের সময়ের বড়-বড় ব্যবস্থা প্রশাসকদের কৃতিত্ব একেবারে অন্য জাতের। তারা বর্তমান অবস্থানে উন্নীত হয়েছেন স্বীয় ইচ্ছাশক্তির জোরে এবং অপরের চরিত্র সহজে বুঝে ফেলার ক্ষমতার জন্য। ক্ষমতার প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি ব্যবসা প্রশাসকদের চরিত্রের প্রধান দিক। আর তার ব্যক্তিত্ব ঝলসে ওঠে সাংগঠনিক দক্ষতার আশীর্বাদে। এই লোকদের সর্বজনীন মঙ্গল সাধনের যোগ্যতা যেমন খুব বেশি, অমঙ্গল সাধনের ক্ষমতা তেমনি ততোধিক। এরা আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি দাবি করতে পারেন তাদের ক্ষমতা এবং গুরুত্বের জন্য। তারা আমাদের ভালবাসা কিংবা ঘৃণা কুড়াবেন তাদের কাজের প্রকৃতির জন্য। কিন্তু আমরা এদের অবহেলা করতে পারব না কিংবা দেখাতে পারব না দয়া-দাক্ষিণ্য। শিল্পসমৃদ্ধ জগতে এ ধরনের লোকের স্থান সামনের সারিতে হবেই। সোভিয়েত রাশিয়ায় এ ধরনের লোককে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়। পুঁজিবাদী জগতের মতো এদের নির্দয় হবার সুযোগ দেওয়া হয় না। অবশ্য পুঁজিবাদের অধীনেই হোক, আর কম্যুনিজমের অধীনে হোক, এই লোকেরাই শেষ পর্যন্ত শিল্পসভ্যতার শাসন-ভার লাভ করবে, এদের প্রাধান্য থাকবে সর্বোচ্চ এবং এদের মানসিকতা এবং আগের যুগের অভিজাতদের মানসিকতার তফাৎ ফিউডাল কিংবা বণিক যুগের সংস্কৃতি থেকে শিল্পযুগের সংস্কৃতিকে ভিন্ন চরিত্র দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

'ভদ্রলোকের শিক্ষা' নামক ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর মন্দ প্রভাব ফেলবে। তরুণদের মধ্যে যাদের মেধা খুব বেশি নয় তারা আঠারো থেকে বাইশ বছর বয়সে বিদ্যায়তনিক শিক্ষা লাভ করতে খুব আগ্রহ দেখায় না, কারণ কাজটাকে তারা দুরূহ মনে করে। এমন আস্থাও তারা অর্জন করতে পারে না যে, ঐ বিদ্যায়তনিক জ্ঞান তাদের ভবিষ্যতে কোনো কাজে লাগবে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের কাটে অলস জীবন। যারা ভবিষ্যতের কার্যক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিতে চান গবেষণাগার, কেবল তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মোটামুটি মূল্য রয়েছে। বাকিদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিতান্ত বাস্তবতাবিবর্জিত। ভবিষ্যৎ জীবনে সে জ্ঞান কোনো কাজে লাগার সম্ভাবনাই থাকে না। পেশাগত ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর মতো জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জন করা যায়, কিন্তু রক্ষণশীল পণ্ডিতরা একথা শুনে কানে হাত দেবেন, আতংক বোধ করবেন। অথচ তারা এ ক্ষেত্রে ভুল করে থাকেন। আমি মনে করি অনেক বুদ্ধিমান তরুণ নিস্তেজ ও সিনিক্যাল হয়ে পড়েন যখন তারা দেখতে পান বিদ্যালয়ে ব্যয়িত বছরগুলোর কাজের প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো গুরুত্বই নেই। অথচ যারা মেডিসিন, ইঞ্জিনিয়ারং, কৃষিতত্ত্ব কিংবা অন্য কোনো সুস্পষ্ট কেজো বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন তাদের মধ্যে এ ধরনের অসারতা বোধ জাগে না। একজন ভদ্রলোক কেজো না হয়ে অলঙ্কার হয়ে বসে থাকবেন, এটাই যদি প্রত্যাশা করা হয়, তা হলে তাকে অনুপার্জিত আয় সরবরাহ করতে হবে। যে ব্যক্তির জীবিকা উপার্জন করে জীবন-ধারণ করতে হবে, তাকে অসার শিক্ষা প্রদান করে চমৎকার অলস ব্যক্তিতে পরিণত করা ঠিক হবে না।আদর্শ হিসেবে বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্থান আছে কেবল গোষ্ঠীর জীবনে। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির কাছে এ ধরনের জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই। অবশ্য তিনি যদি ভবিষ্যতে গবেষক হতে চান তা হলে তার কাছে এ জ্ঞানের মূল্য রয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোনো পেশা অবলম্বন করবেন তাকে ঐ পেশার জ্ঞানই অর্জন করতে হবে। আজকের দিনে সব্যসাচী জ্ঞান বলতে কিছু নেই। অথচ ইংল্যান্ডে এমন শিক্ষা লাভের প্রতি প্রবল ঝোঁক কাজ করে যাতে কথায়-

www.pathagar.com

কথায় জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া যায়। উপরন্তু যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে পরবর্তী কালের পেশাগত কাজের কোনো সংযোগ না থাকে তা হলে উক্ত জ্ঞান অবিলম্বে বিস্মৃত হতে হয়। চল্লিশ বৎসর বয়সের একজন পেশাজীবী লোককে পরীক্ষা করে দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত বিদ্যা তার মধ্যে কতটুকু অবশিষ্ট আছে। আমার ভয় হয়, দেখা যাবে, উক্ত জ্ঞানের কণামাত্রও তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। অথচ তার শিক্ষার সঙ্গে যদি পরবর্তীকালের পেশাগত কাজের সম্পর্ক থাকতো তা হলে দেখা যেত যে তার পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা অর্জিত জ্ঞানের জন্য সুন্দর উদাহরণ তৈরি করছে। ফলে তারা উক্ত জ্ঞানের মূল্য অনুধাবন করত এবং বিস্মৃত হত না।

এ পর্যন্ত আমি শ্রেণী-বৈষম্য থেকে যে আকস্মিক অসুবিধাগুলো সৃষ্টি হয় তাই নিয়ে আলোচনা করেছি। তবে সমস্যাটার নৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছি সবিস্তারে। যেখানে অন্যায় বৈষম্য বিদ্যমান সেখানে যে ব্যক্তি উক্ত ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ে তার মধ্যে নিজের অবস্থান যৌক্তিক করার জন্য বাক্ বিস্তারের ঝোঁক দেখা দেয়। তিনি প্রকারান্তরে এই কথাটা বোঝাতে সচেষ্ট হন যে, যে কোনো কারণেই হোক তিনি অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবানদের চেয়ে ভালো। তার যুক্তি জালের মধ্যে থাকে সীমিত সহানুভূতি, ন্যায় বিচারের বিরোধিতা এবং স্থিতাবস্থা (Status quo) বজায় রাখার প্রচেষ্টা। এদের প্রচেষ্টার জন্যই সমাজের সকল ভাগ্যবান লোকেরা প্রগতি বিরোধী হয়ে পড়ে, এদের মনে সব সময় আশঙ্কা এবং ভয় কাজ করে। ফলে নিজেরাই নিজেদের স্বাচ্ছন্দ নষ্ট করে। অপর দিকে সমাজের অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবানেরা বুদ্ধিগত স্ফূর্তি হারিয়ে ফেলে, সমাজ যে তাদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করছে সেটাও ধরতে পারে না। কিন্তু নৈতিক আত্মসম্মান হারানোর জন্য তারা নিজেদের মতো লোকদের কাছে নতজানু হয় কিংবা তাদের মন হয় বিক্ষুব্ধ, সব সময় বঞ্চনা বোধে ভোগে। এক সময় গোটা দুনিয়া অত্যাচারিতের রঙিন চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করে। অন্যায় নীরবে মেনে নেওয়া হলে দুটি ব্যাপার ঘটে। ভাগ্যবান সম্পর্কিত একটা দিক, ভাগ্যহীন সম্পর্কিত আর একটা দিক। এজন্য বৈষম্যদুষ্ট সমাজ অশুভ। অন্যায়ভিত্তিক সমাজের শিক্ষার নৈতিক দিকটা কখনই সঠিক হতে পারে না। ক্ষুব্ধ মন এমনিতে খুবই খারাপ, কিন্তু সমাজ থেকে অন্যায় দূর করার জন্য এর দরকার আছে। তা সে অন্যায়টা শ্রেণীতে শ্রেণীতে হোক, জাতিতে জাতিতে হোক কিংবা নারী ও পুরুষে। আবার রাজনৈতিক আবেগ দরকারি হলেও অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো থেকে মুক্ত হয় না। কল্যাণব্রতী সমাজে থাকবে দয়া, বন্ধুতা এবং গঠনমূলক আবেগ। আর ক্রোধ ও ধ্বংসাত্মক আবেগের স্থান হওয়া উচিত নয়। এই ধরনের বিবেচনা যদি আমাদের মধ্যে কাজ করে তা হলে আমরা অনেক দূর যেতে পারব। তবে যেহেতু আমাদের বিবেচনার বিষয় হল শিক্ষা, সুতরাং এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পাঠকের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।

www.pathagar.com

শিক্ষায় প্রতিযোগিতা

বিগত উনিশ শতকে যে সব আদর্শ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তার কোনো কোনোটা এ যুগেও টিকে আছে, কোনো কোনোটা টিকতে পারেনি। টিকে যাওয়া আদর্শগুলোরও কিন্তু আগের মতো গুরুত্ব নেই। অন্তত এক শো বছর আগে যে গুরুত্ব ছিল তা এখন আর নেই। আজকের দিনে সীমাবদ্ধ কিছু ক্ষেত্রেই শুধু এগুলোর প্রয়োগ চলে। এখানে উদাহরণ হিসেবে প্রতিযোগিতার আদর্শকে ধরা যায়। তার আগে একটা কথা বলে রাখা ভালো, ডারুইনবাদ–এর জন্যই লোকেরা প্রতিযোগিতার আদর্শ গ্রহণ করেছিল এটা মনে করা ঠিক নয়। আসলে এর উল্টোটাই বাস্তব ঘটনা; প্রতিযোগিতায় বিশ্বাস থাকার জন্যই ডারুইনবাদের উদ্ভব হতে পেরেছে। একজন আধুনিক জীববিদ্যাবিশারদের বিবর্তনবাদে আস্থা ক্ষুণ্ন না হয়ে থাকলেও প্রতিযোগিতার ওপর আস্থা ডারুইনের চেয়ে কম রাখেন। মানসিকতায় এই পরিবর্তনের জন্যই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শিল্পযুগের সূচনায় অগণন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছে, এবং কারখানাগুলো শৈশবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সাহায্য পেয়েছে যৎসামান্য। এর কারণও ছিল। রাষ্ট্র তখন ছিল কৃষিপ্রধান এবং আন্তর্জাতিক। এ জন্য প্রথম যুগের শিল্পপতিরা সর্বদাই চেষ্টা করেছেন স্বাবলম্বী হতে। আরো, এ জন্যই তারা বিশ্বাস রেখেছেন অবাধ বাণিজ্য (laissez faire) এবং প্রতিযোগিতার ওপর। শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিযোগিতার আদর্শ অন্যান্য ক্ষেত্রে চলে আসে। ডারুইন আমাদের বুঝিয়েছেন যে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে বলেই বিবর্তন সম্ভব হচ্ছে। এর থেকে শিক্ষাবিদরা ধরে নিলেন, শ্রেণী কক্ষে প্রতিযোগিতা থাকলে বিদ্যাভিমানীর দল অধিক পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক হবে। এক সময় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে নিয়োগকর্তারা অবাধ প্রতিযোগিতার আদর্শ কাজে লাগান, আমেরিকার অনুন্নত অঞ্চলসমূহে আজো উক্ত আদর্শ কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়। তবে পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ক্রমান্বয়ে কমে আসতে থাকে। শিল্পপতিরা জাতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হবার দিকে ঝুঁকে পড়েন। ফলে প্রতিযোগিতার রূপ নিয়েছে প্রধানত জাতিসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যাপারে। ইতোমধ্যে সংগতকারণেই শিল্পপতিরা এক দিকে নিজেরা সংগঠিত হচ্ছেন, অপরদিকে সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা নিচ্ছেন যাতে কর্মচারীর দল একতাবদ্ধ হতে না পারে। এখন তাদের আদর্শ অনেকটা এই রকম : 'একতাবদ্ধ হলে আমাদের ক্রমিক উন্নতি নির্বাধ হবে, আর ওরা যদি একতাবদ্ধ না হতে পারে তা হলে ওদের পতন ঘটবে।' এ জন্য অবাধ প্রতিযোগিতা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 'মহান আদর্শ' হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তবে বৃহৎ শিল্পপতিদের ক্ষেত্রে এই আদর্শ টেকেনি। বৃহৎ

www.pathagar.com

শিল্পপতিদের কাছে প্রতিযোগিতা হচ্ছে জাতিগত ব্যাপার। অতএব তাদের কাছে ব্যাপারটা সোৎসাহ দেশপ্রেমিকতার।

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার আদর্শ দুটি খারাপ প্রভাব ফেলেছে। একদিকে এই আদর্শের জন্য শ্রেণীকক্ষে সহযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতার পক্ষে ওকালতি করা হচ্ছে, অন্তত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মূল্যকে বড় করে দেখানো হচ্ছে। অপরদিকে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, অন্তত বিদ্যার্থীদের মধ্যে গবেষণা বৃত্তি লাভের জন্য প্রতিযোগিতা হচ্ছে খুব বেশি। পরবর্তীকালে চাকুরি লাভের জন্যও জোর প্রতিযোগিতা হচ্ছে। শেষোক্ত স্তরে একটু শিথিলতা দেখা দিয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্য। তবে পেশাজীবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জোর ও তীব্রতা একটুও কমেনি।

প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসের অন্যতম বড়ো ত্রুটি হলো, এতে ছাত্ররা খুব বেশি পড়াশুনা শুরু করে দিয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা বাদে পশ্চিম ইউরোপের প্রতিটি দেশে একটা বিপজ্জনক ঝোঁক দেখা দিয়েছে যে, তরুণদের খুব বেশি লেখাপড়া করতে হবে; এতে তাদের কল্পনাপ্রতিভা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ভোঁতা হচ্ছে; অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক ক্ষতির ঘটনাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ঝোঁক থেকে সুচতুর ছেলেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। প্রতিটি প্রজন্মের সবচেয়ে মেধাবী এবং সবচেয়ে কল্পনাপ্রতিভাসম্পন্ন ছেলেরা প্রতিযোগিতা নামক মহান ঈশ্বরের পায়ে আত্মাহুতি দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম ইউরোপের চেয়ে উন্নত নয়, তবে এক্ষেত্রে তারা অনেক ভালো। আমেরিকার প্রতিটি সমর্থ তরুণ স্নাতক-উত্তীর্ণ ছাত্র সংস্কৃতি এবং বিদ্যবত্তার ক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের ছাত্রদের চেয়ে হীন, তবে এদের জ্ঞানান্বেষণের আকাঙ্ক্ষার কোনো তুলনা নেই, এদের গবেষণা করার আকাঙ্ক্ষাও অপরিসীম। জ্ঞানান্বেষণের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই জ্ঞানান্বেষণ দুরূহ কাজ, আর ইউরোপের শিক্ষাবিদরা এই সমস্যার কোনো সমাধান খুঁজে বের করতে পারেন নি।

শিক্ষাবিদদের প্রথম কাজই ছিল তরুণ বিদ্যার্থীর কল্পনাপ্রতিভাকে হত্যা করা। কল্পনাপ্রতিভা নিয়মনীতিহীন, বিশৃঙ্খল, প্রাতিস্বিক, এবং এটা সঠিকও নয়, অ-ঠিকও নয়; আর এর প্রতিটি ধাপেই শিক্ষকরা অসুবিধার সম্মুখীন হন। বিশেষত যখন প্রতিযোগিতার জন্য নির্জলা মেধার দরকার। কল্পনাপ্রতিভার সঠিক ব্যবহার দুরূহ হয়ে যায় এ জন্য যে ছেলেদের বাস্তব জগৎ সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাপ্রতিভাই খাটো হয়ে যায়। যে সব বয়স্ক ব্যক্তির কল্পনাপ্রতিভা খাটো হয়নি বরং বেশ সবল আছে, তারা শৈশব থেকেই বাস্তবতার নাগালের একটু বাইরে থাকার জন্য সব সময়ই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বয়স্ক লোকদের কল্পনাপ্রতিভা যদি মূল্যবান হতে হয় তা হলে অজ্ঞতা থেকে বাস্তবের নাগালের বাইরে থাকলে চলবে না। ফারিনাটা ডেলগি উবার্টির নরকের প্রতি অবজ্ঞা ছিল অপরিসীম, অথচ তাকে চিরটা কাল নরকেই কাটাতে হয়েছে। বাস্তবতার প্রতি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কেবল বয়স্ক লোকেরা কেজো কল্পনাপ্রতিভার অধিকারী হতে পারেন।

এখানে বাস্তব উদাহরণ নেওয়া যায়। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের রেখাঙ্কন এবং ছবি আঁকার বিষয়টা বিবেচনা করি না কেন। পাঁচ থেকে আট বছরের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে উৎসাহ পেলে খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে, তবে তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। কেউ কেউ, তবে এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, আত্ম-সচেতনতা অর্জনের পর রং ও তুলি ব্যবহারে দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে। তবে তাদের যদি শুধু অনুলিপি তৈরি করতে বলা হয় তা হলে তারা শৈল্পিক দক্ষতা হারাতে শুরু করে, তাদের মন হয়ে পড়ে অতিরিক্ত বিজ্ঞানমনস্ক। ফলে তাদের চিত্রকর্মে কল্পনাপ্রতিভার স্বাক্ষর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ঘটনা এড়িয়ে চলতে

www.pathagar.com

হলে তাদের ছবি আঁকা শেখানো উচিত হবে না, তবে তারা চাইলে উপদেশ দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া তাদের বুঝতে সুযোগ দিতে হবে যে অঙ্কন সঠিক হলেই মেধার পরিচয় মেলে না।শিক্ষকদের পক্ষে এখানে একটু অসুবিধা হয়। কারণ শৈল্পিক দক্ষতা ও চমৎকারিত্ব মতামতের ব্যাপার এবং ব্যক্তিরুচি নির্ভর। পক্ষান্তরে অনুলিপি অবিকল হল কিনা তা নির্ণয় করা এবং এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসা কোনো কঠিন কাজ নয়। স্কুল-শিক্ষায় শ্রেণীচেতনা কাজ করলে শিল্পকর্মে ব্যক্তি গুণাগুণ নয়, সামাজিক উপাদান বিবেচনা করে চমৎকারিত্বের মান নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা অসাধারণ মেধাসম্পন্ন হলেই কেবল ঘটনা ভিন্ন হতে পারে। ব্যক্তির গুণাগুণ রক্ষা করতে হলে শিক্ষকতা একটু কমানোর দরকার করবে। আর শিল্পকর্মের সমালোচনাও হতে হবে নিয়ন্ত্রিত, যাতে ছাত্ররা দুর্বলচিত্ত না হয়, আত্মপ্রকাশে ভয় না পায়। তবে এই গুলো অনুসরণ করে ছবি আঁকলে সে ছবি স্কুল পরিদর্শকের মনঃপূত হবে বলে আশা করা যায় না।

পরবর্তী ধাপে সাহিত্য পড়ানোর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার প্রযোজ্য হবে। শিক্ষকদের সহজাত প্রবণতা খুব বেশি নির্দেশ প্রদানের দিকে। তাছাড়া গদ্য-শৈলী সম্পর্কে তাদের মধ্যে ছেলেমানুষী ধারণা কাজ করে। উদাহরণত তারা ছাত্রদের অযথা নির্দেশ দেন যে কোনো বাক্য 'এবং' 'কিন্তু' দিয়ে শুরু করা যাবে না। ব্যাকরণের নিয়মাবলী অবশ্য সুনির্দিষ্ট হওয়া খুবই জরুরি। তবে শিক্ষকরা স্বভাবদোষে অনেক সময় ব্যাকরণের নিয়মনীতির ওপর অতিরিক্ত জোর দিয়ে থাকেন। যে ছেলে লিখেছে :

And damned be him that first cries hold, enough

তাকে অবশ্যই ধমকে দেওয়া হবে। এবং তা শুধু শাস্ত্রবিরোধী হওয়ার জন্য নয়, বৈয়াকরণগত ত্রুটির জন্যও ধমকে দেওয়া হবে। চিত্রশিল্পের মতো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভয়টা এখানে যে, পাছে শৈল্পিক দক্ষতা পাত্তা না পায়, এবং বিশুদ্ধতার ওপর না বেশি জোর দেওয়া হয়। সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে কেবল পাঠের ওপর। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, অধিক সংখ্যক বই পড়ার চেয়ে একটা বই গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি কাজে লাগে। কোনো লেখা পড়ে যদি গভীর আনন্দ লাভ করা যায় তবে সে লেখা মুখস্ত করে ফেলাই ভালো। আর লেখা পড়ে যদি কোনো প্রকার আনন্দ পাওয়া না যায় তবে সে লেখা ক্লাসিকধর্মী হলেও পড়ে মোটেই লাভ হয় না। সাহিত্য গভীর আগ্রহ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লে তা একজনের রচনারীতি ও শৈলীর ওপর সদর্থক ছাপ রাখতে পারে। সাহিত্য ঠাণ্ডা মাথায় পড়লে কেবল পণ্ডিতম্মন্য হওয়া যায় এবং কথায়-কথায় তর্ক করা সম্ভব হয়। ছাত্রদের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখার অভ্যাসও গড়ে তোলা উচিত। তবে তাদের লেখার সমালোচনা করা ঠিক নয়। অন্তত কি করলে লেখাটা আরো ভালো হত সে সম্পর্কে শিক্ষকের নিজস্ব মতামত জ্ঞাপন একেবারে অনুচিত। লেখালেখি ব্যাপারে শিক্ষকতা কোনো কাজে আসে না।

এবার বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও আমাদের বিবেচনা অভিন্ন হবে। অবসন্নতার সঙ্গে জড়িত কিছু বিষয় নিয়েও বিবেচনা করা দরকার। অবসন্নতা সার্বিক এবং বিশেষ হতে পারে; প্রথমটার সম্পর্ক স্বাস্থ্যের সঙ্গে। দ্বিতীয়টা আসে অতিরিক্ত বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার কারণে। পাঠক সাধারণের নিশ্চয় পাভলভের কুকুরকে মনে আছে, যে কুকুর বৃত্ত থেকে উপবৃত্তের তফাৎ ধরতে শিখেছিল। কিন্তু পাভলভ সাহেব যখন উপবৃত্তের আকারটা বৃত্তের কাছাকাছি নিয়ে আসতে শুরু করলেন তখন কুকুরের মনেও খটকা লাগতে শুরু করলো। এক সময় যখন বৃত্ত ও উপবৃত্তের পার্থক্যের অনুপাত দাঁড়ালো ৯ ঃ ৮, তখন

www.pathagar.com

কুকুরটার ভেদবুদ্ধির ক্ষমতা পেল লোপ। তার বৃত্ত ও উপবৃত্ত সংক্রান্ত সকল জ্ঞানের ঘটল অবসান। বিদ্যালয়ের অনেক ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রেও এটা খাটে। যদি তাদের ক্ষমতায় কুলায় না এমন কিছু শিখতে বাধ্য করা হয় তা হলে তারা হতবুদ্ধি এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে বুদ্ধিগত কোনো ব্যাপারে উৎসাহ আর অবশিষ্ট থাকে না। আমরা দেখতে পাই যে, কোনো কোনো লোক সারা জীবনেও গণিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। এর কারণ আর কিছু নয়। তাদের খুব কম বয়সে গণিত চর্চার অভ্যাস করতে হয়েছে। স্কুলে যে সব দক্ষতা পরীক্ষিত তার মধ্যে বিমূর্ত যুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা বিকশিত হয় সবার শেষে। পিয়াজেটের মূল্যবান গ্রন্থ 'জাজমেন্ট অ্যান্ড রিজনিং ইন দ্য চাইল্ড' এ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। একজন পণ্ডিত ব্যক্তির যদি বিস্তর মনস্তাত্ত্বিক এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকে তবে তারা বুঝতে পারবেন না যে ছেলেরা তাদের মতোই জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হতে পারে: সঠিক মৌখিক উত্তর পেলেই ধরা হত সংশ্লিষ্ট ছাত্র বিষয়টা যথাযথ বুঝেছে। পাটিগণিত ও গণিতশাস্ত্র সাধারণত খুব কম বয়সে শিখতে হয় বলে ছাত্রদের ঐ দুটি বিষয় সম্পর্কে যে ধারণা জন্মে তার সঙ্গে তুলনা চলে পাভলভের কুকুর-ছাত্রের জ্যামিতি সম্পর্কিত ধারণার। এধরনের দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্য দরকার শিক্ষকের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা। তাছাড়া শিক্ষকতা রীতিমতো একটা কলা; এই কলা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি। উপরন্তু শিক্ষকদের দরকারে পাঠ্যসূচি শিথিল করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। মনে করা হয় যে, দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষকেরই শুধু শিক্ষকতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি, 'ভদ্রলোকের' সন্তানদের প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক শিক্ষা দিতে পারেন। এ ধরনের ঘটনার উৎস হল স্নবারি।

অবসন্নতা বুদ্ধিবৃত্তি ভোঁতা করে দেয়, অতএব এটা গুরুতর ব্যাপার। একটা জিনিস কম ক্ষতিকর হলেও ক্ষতিকর। তা হল বুদ্ধিগত ব্যাপারে আগ্রহ নিরুৎসাহিত করা। অকেজো জ্ঞান প্রদানের জন্য এই নিরুৎসাহের সৃষ্টি হয়। একটা গড়ক্লাসের একশো জন ছাত্রকে ধরা যাক। আমি অনুমান করছি যে নব্বই জন ছাত্র শাস্তির ভয়ে লেখাপড়া করে, নয় জন সাফল্য অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতার বোধ থেকে; কেবল মাত্র একজন জ্ঞানতৃষ্ণা থেকে। এই দুঃখজনক অবস্থা কিন্তু অনিবার্য নয়। ক্লাসের ঘন্টা কমিয়ে দিয়ে, স্বেচ্ছা নির্বাচিত পাঠ রাখার অধিকার দিয়ে, শিক্ষকতার মান উন্নয়ন করে এটা সম্ভব করে তোলা যায় যে, অতঃপর সত্তর শতাংশ ছাত্র জ্ঞানতৃষ্ণা থেকে লেখাপড়া করবে। এ ভাবে ছাত্রদের মনোভঙ্গি পরিবর্তন করা গেলে, তারা স্বেচ্ছায় লেখাপড়ায় মনোযোগী হবে, তাদের মনের ওপর কোনো চাপ থাকবে না। ফলে তাদের অবসন্নতা অনেকাংশে দূর হবে, তাদের স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট উন্নতি হবে। উপরন্তু জ্ঞানার্জন আনন্দদায়ক মনে হবে। ফলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শেষ হবার পরও তাদের মধ্যে লেখাপড়া করার ইচ্ছে বেঁচে থাকবে। স্বেচ্ছায় অল্পক্ষণ লেখাপড়া করলেও জানা হয় অনেক বেশি। তবে শিক্ষকদের জানা থাকা দরকার ছাত্ররা কোন জিনিশ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া মূল্যবান মনে করে। ছাত্রদের চোখ রাঙিয়ে এটা বোঝানো উচিত হবে না যে, পুরাকালীন ছাই ভস্মের গূঢ় এবং আধ্যাত্মিক মূল্য রয়েছে।

শিক্ষকতায় আর একটা ত্রুটি এই যে (অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চস্তরে এই ত্রুটি থাকে না), শিক্ষকরা ছাত্রদের বোঝান যে, যে-কোন বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ সহজ। তাদের মধ্যে এমন বিশ্বাসও উৎপাদন করা হয় যে, বৈধ বিতর্কের বিষয়ের ক্ষেত্রেই কেবল সুনিশ্চিত উত্তর পাওয়া যায়। মনে পড়ছে, আমরা একবার শেক্সপিয়রের কোন নাটকটি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই নিয়ে কথা বলেছিলাম। আমাদের মধ্যেকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একটা ব্যতিক্রমী অভিমত দেবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু জনৈক চতুর তরুণ বলে বসলো হ্যামলেটই শেক্সপিয়রের সর্বশ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

নাটক। ঐ তরুণ সম্প্রতি স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। তরুণটি বলল, হ্যামলেট যে শেক্সপিয়রের শ্রেষ্ঠ নাটক, এটা বাস্তব ঘটনা। এর পর উক্ত বিষয়ে আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকার প্রতিটি ধর্মযাজক জানেন রোমক সাম্রাজ্যের কেন পতন ঘটে: জুভেনাল ও পেট্রোনিয়াসবর্ণিত নৈতিক অধঃপতনের জন্য। আর পশ্চিম ইউরোপের পতনের আগের দুই শতাব্দীতে যে নৈতিকতা প্রধান ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা অনেকেরই জানা কিংবা ব্যাপারটা এড়িয়ে চলা হয়। ইংরেজ ছেলেমেয়েদের ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে এক রকম বলা হয়, ফরাসি ছেলেমেয়েদের অন্য রকম। উভয় দেশেই প্রকৃত ঘটনা গোপন রেখে শেখানো হয়। কিন্তু শিক্ষকের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করা বিজ্ঞতার পরিচায়ক হয় না, কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে ইচ্ছুকও হয় না। ছাত্ররা যদি বুদ্ধিমানের মতো ভিন্নমত পোষণ করে তা হলে শিক্ষকের উচিত তাদের উৎসাহিত করা। তাদের এমন পুস্তকও পাঠ করতে বলতে পারেন যেখানে ভিন্নমত পোষণ করা হয়েছে। কিন্তু এ কাজটি কখনোই করা হয় না। ফলে ছাত্ররা যে শিক্ষা পায় তাতে থাকে মতবাদের জগাখিচুড়ি। ছাত্ররা অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী হতে পারে না। এর জন্য কিন্তু শিক্ষকরা দায়ী নন, দায়ী হল পাঠ্যসূচি। অর্থাৎ পঠিত বিষয়ই সর্বনাশ ডেকে আনে।

অতিরিক্ত শিক্ষাগ্রহণ বা অতি-পঠনের গুরুতর ক্ষতির দিক হল এই যে, এতে ছাত্রের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, বিশেষত মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় খুব বেশি। ইংল্যান্ডে অতি-শিক্ষা নামক অমঙ্গল থাকার কারণ হল লিবারাল পার্টির একটা জিগির ছিল যে সুযোগ লাভের অধিকার সকলের সমান থাকতে হবে। এই জিগির বা নীতিবাক্যটা তাড়াহুড়ো করে বাস্তবায়িত করা হয়। এই সাম্প্রতিক কালেও শিক্ষা লাভের অধিকার ছিল কেবল মাত্র ধনাঢ্য পরিবারের সন্তানদের। কিন্তু গণতন্ত্রের শুভ প্রভাবে উপলব্ধি জাগে যে উচ্চ শিক্ষা সবার জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত। অন্তত যারা উচ্চ শিক্ষা পেলে লাভবান হবে তাদের উচ্চ শিক্ষা পাবার অধিকার থাকবে। আর উচ্চ শিক্ষা লাভ করে লাভবান হওয়া নির্ভর করে ছাত্রের বুদ্ধি ও মেধার ওপর। সমস্যার সমাধান করা হয় মেধা যাচাই করে ব্যাপক হারে বৃত্তি দিয়ে। আর মেধা যাচাই শুরু হয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। অল্প বয়সে মেধার পরিচয় দিলেও বৃত্তি প্রদান করা হত। প্রতিযোগিতার ওপর চূড়ান্ত মূল্য আরোপের জন্য তারা বুঝতে পারেননি যে বালক-বালিকা, এমনকি কিশোর-কিশোরীদের ওপর দৈহিক ও মানসিক চাপ খুব বেশি হলে ফল খুব ভালো হয় না। চাপটা বুদ্ধিগত হলে ক্ষতি হয় বেশি। বালক-বালিকার ভবিষ্যত নির্ভর করে দীর্ঘ প্রস্তুতির পর সংক্ষিপ্ত পরীক্ষায় সাফল্যের ওপর। দরিদ্র ঘরের একটি ছেলের কথা ভাবা যাক। ছেলেটির বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের দিকে আগ্রহ বেশি, অথচ তার সঙ্গী-সাথীরা বই-পুস্তকের কথা উঠলে আতঙ্ক বোধ করে। যদি ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারে তা হলে সে হয়তো সেখানে সমমনা বন্ধুদের সঙ্গ লাভের সুযোগ পাবে। নিজের পছন্দসই কাজে আত্মনিয়োগ করে জীবনযাপনের সুযোগ লাভ করবে। যদি সে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে তা হলে চির-দারিদ্র্য হবে তার বিধিলিপি, জীবন হবে মানসিকভাবে নিঃসঙ্গ। সম্ভাব্য এই পরিণতি নিয়ে এগিয়ে যেতে হলে মাথায় উদ্বেগ নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে, তার কাজে হয়তো বিজ্ঞতার পরিচয় মিলবে না। শিক্ষাজীবন শেষ হবার আগেই তার মনের স্থিতিস্থাপক শক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা আছে তারা এই অশুভ ব্যাপার সম্পর্কে সচেতন আছেন। তবে প্রতিকার খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়। প্রত্যেককে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া সম্ভবত কাঙ্ক্ষণীয় নয়, আর্থিক কারণে তো সম্ভবই নয়। ফলে

www.pathagar.com

ছাত্র বাছাই করে নেওয়ার পদ্ধতি থাকা জরুরি। আর বাছাই করার ভিত্তি হতে হবে মেধা। পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন করতে গেলে চাপের সৃষ্টি হয় বলে সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। ভালো হয় শিক্ষকরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে যদি প্রার্থী বাছাই করে নিতে পারেন। সন্দেহ নেই যে, এই পদ্ধতিতে তোষামোদি এবং স্বজনপ্রীতির আশংকা থেকে যাবে। তবে বর্তমানে চালু ব্যবস্থার চেয়ে ত্রুটির ভাগ অনেকাংশে কম থাকবে। আরো ভালো হয় যদি বাছাইকৃত প্রার্থীরা বারো বৎসর বয়সে শিক্ষা লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। অতঃপর তাদের জন্য প্রতিযোগিতার আর কোনো দরকার থাকবে না। কেবল বিবেকিতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিশ্রম করলেই চলবে। বারো বৎসর বয়সে নির্বাচন করতে গেলে কিন্তু প্রার্থীর প্রকৃত দক্ষতার দিকটা বিচার করলে চলবে না, বিচার করতে হবে তাদের বুদ্ধিমত্তা।

বুদ্ধিমত্তার বিচার ইংল্যান্ডে বলতে গেলে করাই হয় না। আবার আমেরিকায় করা হয় খুব বেশি, যার বৈজ্ঞানিক ন্যায্যতা আছে বলে আমার মনে হয় না। বুদ্ধিমত্তা বিচারের উৎকর্ষ এখানে নয় যে, এই পদ্ধতি একেবারে ত্রুটিহীন নয়—কোনো পরীক্ষা পদ্ধতিই একেবারে ত্রুটিহীন হতে পারে না—তবে এই পদ্ধতি মোটামুটি সঠিক ফল এনে দিতে পারে। এই পদ্ধতিতে বিচারে উত্তীর্ণ হবার জন্য প্রার্থীদের রাত-দিন ঘর্মক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে না। পক্ষান্তরে, প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় কঠোর পরিশ্রম এড়ানো যায় না।

শহর এলাকায় এবং যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি সেখানে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বালক ও বালিকাদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় থাকা দরকার। মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য যেমন বিশেষ বিদ্যালয় ইতঃমধ্যেই খোলা হয়েছে। আমেরিকা এদিকে কিছুটা মনোযোগ দিয়েছে, তবে ঐ কিছুটা। ব্যাপক হারে নয়।*

তবু মজাদার কিছু ফল পাওয়া গেছে। উদাহরণত, যে বালকের বুদ্ধির ভাগফল (Intelligent quotient) ১৯০ (গড় হল ২০০) তাকে পাওয়া গেছে সাধারণ স্কুলে, যেখানে তার কোনো বন্ধু নেই, এবং নির্বোধ বলেই সে সবার কাছে পরিচিত। এ বালককে যদি পাঠানো হয় মধ্যম মানের ছাত্রদের (বুদ্ধির ভাগফল ১৬৪) স্কুলে, সেখানে গিয়ে ছেলেটি রাতারাতি নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখবে, নেতৃপদ লাভ করবে, বেশ ক'টি দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাকে নেতা নির্বাচন করা হবে। মেধাবী ছাত্রদের যদি নির্বোধ বালকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে না হয় তা হলে তাদের জীবন অনেকটা ঝামেলামুক্ত হবে। বলা হয়ে থাকে, কৈশোরে সবার সঙ্গে সমঝোতা করে চললে বাকি জীবনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে যায়। আমার বিবেচনায় এটি একটি বাজে কথা। কারণ পরবর্তী জীবনে কেউ রাম-শ্যাম, করিম-রহিম সঙ্গে মেলামেশা করে না। পুস্তক বাঁধাইকারীরা ধর্মযাজকদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য নন। উল্টোটাও সত্য। ধর্মযাজকের পুস্তক বাঁধাইকারীর সঙ্গে মেলামেশা করার কোনো দরকার নেই। পরবর্তী জীবনে একটি লোক যে পেশা অবলম্বন করে এবং যে মর্যাদা কিংবা অবস্থান লাভ করে তা থেকে বলে দেওয়া যায় তার আগ্রহ কোন বিষয়ে এবং তার দক্ষতা কতটুকু। আমার জীবনে আমি নানা ধরনের, বিচিত্র পেশার লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। এদের মধ্যে কূটনীতিক, পণ্ডিত, শান্তিবাদী থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ এবং নিয়মিত কারাগারে যেতে হয় এমন লোকও রয়েছেন। কিন্তু কোথাও তো ছেলেদের মধ্যে আমি বিশৃঙ্খল, বেপরোয়া ভাবটা লক্ষ্য করিনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় মেধাবী ছেলেরা তাদের মেধা আড়াল করে চলতে পারে না। ফলে তাদের নানাভাবে, নানা ক্ষেত্রে নিগ্রহ সহ্য করতে হয়;

---

* দেখুন Gifted Children, ইলিংওয়ার্থ-কৃত। অধ্যায় ৯ ও ১০

www.pathagar.com

এদের মধ্যে যারা সত্যিই বাস্তব বুদ্ধি রাখেন তাদের চলাফেরা হয় সাদাসিধে, কিন্তু এর মধ্যে আমি কোনো গভীর তাৎপর্য খুঁজে পাই না। আপনি একটি বড় পশু খামারের ভেতর দিয়ে হাঁটছেন। আপনার চোখে পড়বে গরু, ভেড়া, শূকর, ছাগল, হাঁস, পাতিহাঁস, মোরগ-মুরগি, কবুতর। এদের সবার আচরণ বিভিন্ন; কেউ তো মনে করেন না যে একটা কবুতর শূকরের আচরণ রপ্ত করে সামাজিকতার স্বাক্ষর রাখবে। অথচ বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের কাছে এটিই প্রত্যাশা করা হয়।

সুচতুর বালক-বালিকাদের জন্য আলাদা শিক্ষালয় থাকলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। এতে তাদের সামাজিক নির্যাতনের শিকার হতে হবে না। যন্ত্রণা এবং আবেগগত অবসন্নতা এড়াতে পারে। কাপুরুষোচিত আচরণ করার শিক্ষা পাবে না। আচার-আচরণ কাপুরুষোচিত হলে কুশলী বয়স্ক লোকদেরও ক্ষমতাশীল নির্বোধ লোকদের কাছে মাথা বিক্রয় করতে হয় কিংবা ভাড়ায় খাটাতে হয়। নির্জলা বুদ্ধিজীবী দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারি, এদের অতি দ্রুত শেখানো সম্ভব। তাদের এমন কিছুও শিখতে হবে না যা তারা সহজাত অনুমান দ্বারা বুঝতে পারে যে শ্রেণীর অপরাপর সদস্যদের কাছে এটা ইতোমধ্যেই ব্যাখ্যা করা শুরু হয়েছে। উপরন্তু তারা নিজেদের মধ্যে যে কথাবার্তা বলবে তা তাদের মনে গেঁথে যাবে, এবং তাদের অবসর সময় কাটবে সুন্দরভাবে। কেউ তাদের নিয়ে পরিহাস করার কোনো সুযোগই পাবে না। বর্তমানে বুদ্ধিমান বালক-বালিকারা অনুভব করেন যে তাদের অবস্থান কিছুটা অদ্ভুত এবং দৃষ্টিকটু। বিশেষ স্কুলের ব্যবস্থা হলে তাদের অবস্থার উন্নতি হতে বাধ্য।

বৃহৎ শিক্ষায়তনগুলোতে একটি অসুবিধা এই যে, এগুলোর প্রশাসকরা শিক্ষক নন। কোনটা সম্ভব এবং কোনটা সম্ভব নয় তা এদের পক্ষে কোনোদিনই বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। যখন একজন ব্যক্তি শিক্ষকতা শুরু করেন তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেন যে তরুণ ছাত্ররা অনেক কম শেখে এবং ধীরে শেখে। নির্বাচিত এবং বিশেষ মেধাবী ছাত্রদের ক্লাস হলে অবশ্য ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়। একটা বিষয়ে জ্ঞান লাভ খুবই জরুরি হতে পারে, তাই বলে উক্ত বিষয়টা শেখানোও জরুরি হবে এমন কোনো কথা নেই। কারণ শেখানোর জন্য যে সময় বেঁধে দেওয়া হবে তা হয়তো অধিকাংশ ছাত্রের জন্য যথেষ্ট হবে না। যাদের শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা নেই তাদের পাঠ্যসূচি তৈরি করার দায়িত্ব দিলে তারা আজদাহা পাঠ্যসূচি তৈরি করে। ফলে অধিকাংশ ছাত্রই কোনো বিষয় পুরো আয়ত্তে আনতে পারে না। আবার অভিজ্ঞ শিক্ষকদেরও কিছু ত্রুটি থাকে। তারা মেধার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করেন বলে এমন বিষয় বেছে নেন যে বিষয়ে ছাত্ররা ভুল উত্তর দিয়েছে বলে সন্দেহ থাকবে না। বিদ্যালয়ে ল্যাটিন গ্রামার এজন্যই পড়ানো হয়। এজন্যই পাটিগণিতের মূল্যায়ন করা হয় খুব বেশি। বৃটেনের পাঠশালাগুলোতে তো পাটিগণিতের কদর সীমাহীন। প্রতিটি ব্যক্তির হিসাববিজ্ঞানের কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। তাই বলে জটিল অঙ্ক বুঝে তার কোনো লাভ হবে না। জটিল পাটিগণিতের জ্ঞান পরবর্তীকালে বাস্তব জীবনে তার কোনো কাজে লাগবে না। বরং ল্যাটিন ব্যাকরণের জ্ঞান কিছু কাজে লাগতে পারে। তাছাড়া অঙ্গসংস্থানবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিদ্যার জ্ঞানও অনেক সময় কাজে লাগে।

অতি-শিক্ষা সমস্যাটা গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল। গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কোনো বুদ্ধিমান ছেলে যদি অতি-শিক্ষা পায় তা হলে তার স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়। আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ফলে সে সমাজের কোনো প্রয়োজনে লাগে না। জটিল এ কারণে যে, জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে গেলে শ্রম দিতে হয় খুব বেশি। সুতরাং অতি-শিক্ষার ক্ষতিকর দিকটা আমরা এই বলে এড়িয়ে চলতে পারি না যে,

www.pathagar.com

'ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলতে ফিরতে দেওয়া হোক, আর বেশি জ্ঞান অর্জনের কোনো দরকার নেই।' আমাদের সমাজ কাঠামোর প্রশিক্ষিত এবং তথ্যাভিজ্ঞ লোকদের ওপর নির্ভরতা কেবলি বাড়তে থাকে। বর্তমানে জগৎজোড়া যে মন্দা চলছে তার কারণ সংসারি ও কেজো লোকদের বিদ্যার অভাব। ব্যাংকার ও রাজনীতিবিদরা যদি মুদ্রা ও ঋণের ব্যাপারটা বুঝতেন তা হলে আমাদের ভাগ্যে অনেক বেশি সম্পদ জুটত। আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে যদি ছেলেরা পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে নিজেদের তৈরি করতে না পারে। কারণ খুব কম লোকের পক্ষেই তিরিশ বছর বয়সের পর মৌলিক অবদান রাখা সম্ভব হয়। বর্তমান জটিল বিশ্বে একজন সাধারণ নাগরিক যদি অবদান রাখতে চান তবে তাকে বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে হবে বুদ্ধি খাটিয়ে। আবেগ কিংবা কুসংস্কারের বশবর্তী হলে কিংবা বিদ্যা জাহির করার প্রবণতা দেখা দিলে কিছু হবে না। এসব কারণেই আধুনিক সমাজ কাঠামোর জন্য দরকার বুদ্ধিবাদী শিক্ষা।

একজনের প্রয়োজন পর্যাপ্ত শিক্ষা, অতি-শিক্ষা কেবল অমঙ্গলই ডেকে আনে। এর জন্য দরকার তিনটি জিনিশ। প্রথমেই দরকার: জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে যেন আবেগগত চাপের সম্মুখীন হতে না হয়। এর জন্য পরীক্ষা ও বৃত্তিপ্রদানের পদ্ধতিতে বিরাট পরিবর্তন আনতে হবে। আর বুদ্ধিমান ছাত্রদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারলে আরো ভালো হয়। আবেগগত বা মানসিক চাপ থাকলে অবসন্নতা আসবেই। পেশীর অবসন্নতার মতো বুদ্ধিগত অবসন্নতা রাতে ঘুম ভালো হলেই দূর হয়ে যায়। কিন্তু আবেগগত অবসন্নতা সুনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। আবার ঘুমের মধ্যে বাজে স্বপ্নও তাড়া করে, ফলে নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের জন্য কিছুটা মুক্ত জীবন নিশ্চিত করা দরকার।

দ্বিতীয় প্রয়োজন: যে জ্ঞান কোনো কাজে লাগে না তা পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দিতে হবে। যাকে আমরা 'কেজো' জ্ঞান বলি, কিশোর ও তরুণদের কেবল তাই অর্জন করা উচিত। তবে একটা জিনিশ সকল যুগেই শিক্ষণীয় গণ্য করা হয়েছে বলে আজকের দিনেও শিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই। স্কুলের শিক্ষা সম্প্রতি শেষ করেছে এমন কিছু তরুণকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা ইতিহাস সম্পর্কে কী জানতে পেরেছে। আমি দেখেছি যে তারা স্কুলের প্রতিটি ক্লাসে Hengest থেকে Horsa এবং Norman Conquest পর্যন্ত জানতে পারে। এর বাইরে কিছু নয়। এর বাইরে তারা কিছুই জানে না। আমি অসাধারণ হতে পারি, কিন্তু আমি কোনো দিন এমন পরিস্থিতিতে পড়ি নি যেখানে (ধরুন) অষ্টম শতকের মার্সিয়া এবং ওয়েসেক্স রাজদ্বয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক ব্যাপারে জানা লাভজনক ছিল। ইতিহাসের অনেক কিছুই জানা খুবই জরুরি, কিন্তু স্কুলগুলোতে এসব একেবারেই পড়ানো হয় না।

তৃতীয় প্রয়োজন: উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া খুব জরুরি ব্যাপার নয়। বরং দরকার হবে ছাত্রদের অনুসন্ধানী মনের অধিকারী করে গড়ে তোলার জন্য খাটাখাটি করা। এ ক্ষেত্রেও পরীক্ষা পদ্ধতিকে দায়ী করতে হয়। যে তরুণ ছাত্রের (ধরুন) ইংরেজি সাহিত্যের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, তাকে সম্ভবত এই পরামর্শ দেওয়া উচিত হবে যে তার বড়ো কোনো লেখকের লেখা পড়ার দরকার নেই, একেবারে নেই; বরং তাকে জানতে হবে সাহিত্যের খুঁটিনাটি বিষয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অনেক খুঁটিনাটি জিনিস মুখস্থ করতে হয়; এ সব জিনিস রেফারেন্স পুস্তকে সহজে পাওয়া যায়। ছাত্রদের জানানো উচিত পুস্তক পাঠের নিয়ম-কানুন। স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভরতা খুব ভালো নয়, তা হলে পুস্তকাদির প্রয়োজনই ফুরিয়ে যাবে। এটা অবশ্য স্নাতকোত্তর ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই মেনে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রাক-স্নাতক ছাত্রদের ক্ষেত্রেও এটা মেনে নেওয়া উচিত। তাছাড়া

www.pathagar.com

কোনো ছাত্রের গবেষণাকর্মের মূল্য পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে বিচার করা উচিত নয়। বরং বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত গবেষকের জ্ঞানের পরিধি এবং যুক্তি জাল বিস্তারের কুশলতা। এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে ছাত্রের বিচার করার শক্তি গড়ে উঠবে, বিদ্যার্থীর মধ্যে যে অনুপ্রেরণা কাজ করে সেটাও কোনোদিন নষ্ট হবে না। জ্ঞানার্জন বৃত্তিও তার কাছে মজার ব্যাপার হয়ে উঠবে। ফলে অধ্যয়ন কিংবা গবেষণা করতে গেলে যে ক্লান্তি বা অবসন্নতা আসে তাও অনেকটা কমে যাবে। বিরক্তিকর ব্যাপারে মনোযোগ দিলে অবসন্নতা আসে, সুতরাং যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে বিরক্তি দূর হয় তা অবসন্নতাও অনেকটা দূর করে।

উক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে উচ্চ শিক্ষিত হতে গিয়েও স্বাস্থ্য ও স্বতঃস্ফূর্ততা, উভয়ই বিপন্মুক্ত রাখা সম্ভব হতে পারে। তবে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার অত্যাচার যত দিন থাকবে তত দিন কিছুই হবে না। প্রতিযোগিতা কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর নয়, আদর্শ হিসেবে প্রতিযোগিতা তরুণদের সামনে ধরলেও সেটা আখেরে ক্ষতি করবে। বর্তমান বিশ্বের জন্য দরকার প্রতিযোগিতা নয়, সংগঠন ও সহযোগিতা, প্রতিযোগিতার বিশ্বাসটাই সেকেলে হয়ে পড়েছে। এমনকি প্রতিযোগিতার কিছু উপযোগিতা থাকলেও সেটা শ্রদ্ধেয় কিছু নয়। কারণ যে আবেগের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক সে আবেগ শত্রুতা এবং নির্দয়তার। প্রতিযোগিতামূলক ধারণা যার মনে বদ্ধমূল তার পক্ষে সমাজটাকে একক সত্তা হিসেবে দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং নীতিগত ভাবে, এমনকি অর্থনৈতিক বিবেচনা থেকে, ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি করা উচিত নয়।

www.pathagar.com

কম্যুনিজমের অধীনে শিক্ষা

ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সঙ্গে সংযোগ শিক্ষাক্ষেত্রে যে অমঙ্গল সাধন করছে তা নিয়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করেছি। এখন আমরা বিবেচনা করে দেখব কম্যুনিজমের অধীনেও সমান অকল্যাণ সাধিত হয় কি–না। কিংবা পুঁজিবাদ নয়, কম্যুনিজমের অধীনেই গণশিক্ষার উন্নতি হওয়া সম্ভব কি–না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমানে শিক্ষার যে অবস্থা তাকে কোনোমতেই শেষ কথা বলে ধরে নেওয়া যায় না; কারণ রাশিয়া এখনো গঠনকর্মে নিয়োজিত আছে। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার এখনো অনেক দেরি। তবে এখানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ইতোমধ্যেই কি এবং কতটা অর্জন করেছে সেটা বিবেচনা না করলেও চলে। আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে দেশটি কী চায়, কী অর্জন করলে শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবে। এ পর্যন্ত তারা যতটুকু করেছে তা কোনো পরিকল্পনা অনুসারে নয়। বিপ্লব সূচনার সময় রুশ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ছিল নিরক্ষর। দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ ছিল কৃষিজীবী। আর এই কৃষকদের মন–মানসিকতা ছিল একেবারে রক্ষণশীল। টাকার অভাব ছিল, স্কুলের ঘর–বাড়ি ছিল না, শিক্ষক পাওয়া যেত না, এসবই প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। এতসব অসুবিধা সত্ত্বেও এটা পরিষ্কার বোঝা যায়, ভবিষ্যতে শিক্ষাব্যবস্থা কী রূপ নেবে। সুতরাং এখন আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে শিক্ষার জন্য এ পর্যন্ত তারা কী করেছেন। অতঃপর তাদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ বিচার করে দেখব।

মস্কোর দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট এলবার্ট পি. পিঙ্কেভিচ তাঁর The new Education in the Soviet Republic গ্রন্থে একটি মোটামুটি সরকারি জরিপ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে লন্ডনের উইলিয়ামস অ্যান্ড নরগেট কোম্পানি। বইটিতে রাশিয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এটি পড়ে পাঠক সম্প্রদায় বিস্মিত হবেন যে, পশ্চিম দুনিয়ার দেশগুলো থেকে রাশিয়ার তফাৎ খুব বেশি নয়। ছেলেমেয়েদের লিখতে পড়তে শেখানো, অঙ্ক কষতে শেখানোর সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। থাকলেও খুব বেশি আছে বলে মনে করা যায় না। জনস্বাস্থ্যও কোনো বিতর্কের বিষয় নয়। এগুলো ছাড়াও বয় স্কাউট, নৈতিকতা এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য শেখানোর মতো ব্যাপার রয়েছে। এসব ব্যাপারেও রাশিয়া ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে ভিন্ন নয়। আবার এত সব মিল থাকার পরও সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক কিছুই নতুন। এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলোই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

www.pathagar.com

আমরা আগেই দেখেছি যে শিক্ষার সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার খুব নিকট সম্পর্ক রয়েছে। কম্যুনিস্টরাও এ ব্যাপারটা জানেন। লেনিন পশ্চিমের পুঁজিবাদী জগতের বিদ্যালয়গুলোর ওপর এক সময় কিছু মন্তব্য করেছেন। পিঙ্কেভিচ লেনিনের মন্তব্য থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

> একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র যত বেশি সংস্কৃতিবান ছিল প্রবঞ্চনা করেছে ততো সূক্ষ্মভাবে। বোঝাতে চেয়েছে যে, বিদ্যালগুলো রাজনীতির আওতার বাইরে থাকলে রাষ্ট্রের সেবা করতে পারবে সামগ্রিকভাবে। বাস্তবে বিদ্যালয়গুলো ছিল বুর্জোয়াদের জন্য শ্রেণী-দমনের হাতিয়ার বিশেষ। জাত-ভেদের ব্যাপারটা বিদ্যালয়গুলোতে ছিল অতি মাত্রায়। পুঁজিবাদীদের জন্য ক্রীতদাস ও দক্ষ কর্মী তৈরি করাই ছিল বিদ্যালয়গুলোর কাজ।

খোলাখুলি বলি : কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রেও বিদ্যালয়গুলো হল শ্রেণী-দমনের জন্য সর্বহারার হাতের হাতিয়ার। আর এরা মনে করে, শ্রেণী সংগ্রামে দরকারি নৈতিকতা ছাড়া আর কোনো নৈতিক শিক্ষার দরকার নেই। লেনিন থেকে পিঙ্কেভিচ আরো একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

> অমানবিক এবং শ্রেণীহীন (Non-Class) ধারণা থেকে গৃহীত নৈতিকতা আমরা মানি না। এই নৈতিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে ভূ-স্বামী এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থে, শ্রমিকদের প্রতারণা ও বঞ্চনা করার জন্য। আমি জোর দিয়ে বলছি, আমাদের নৈতিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে শ্রেণী সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণীকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য।

তা হলে ঘটনা দাঁড়াচ্ছে যে, সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পর যখন শ্রেণী সংগ্রাম বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, তখন কোনো নৈতিকতারও দরকার হবে না। তবে এ ব্যাপারে পিঙ্কেভিচের নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা সদর্থক :

> সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হল স্বাস্থ্যবান, সবল, সাহসী, স্বাধীনভাবে চিন্তায় সক্ষম ও সক্রিয় মানুষ তৈরি করা। এরা সর্বহারার স্বার্থে সমকালীন সংস্কৃতির নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকবে, এরা হবে সৃষ্টিশীল এবং যোদ্ধা। সমগ্র মানবতার স্বার্থেও তারা কাজ করতে পারবে।

উক্ত অনুচ্ছেদ থেকে সর্বহারা শব্দটা বাদ দিলে যা থাকবে তা খুব একটা কম্যুনিস্ট ধর্মী গণ্য করা চলবে না। তবে সন্ধিক্ষণ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে প্রচারের (Propaganda) একটা বড়ো ভূমিকা থাকবেই। এ সময় 'লক্ষ্য হবে, বলতে গেলে, তরুণদের সর্বহারার দর্শনে দীক্ষিত করা।'

পিঙ্কেভিচ স্বীকার করেন যে 'চরিত্র গঠনের জন্য উপযুক্ত সময় হল শৈশব। এবং এ সম্পর্কে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।' পিঙ্কেভিচ আরো মনে করেন, ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠানাদিতে রেখে লালন-পালন করলে অধিকতর সুফল পাওয়া যাবে। এতে শুধু সন্তানের কল্যাণ হবে না, 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়ও সুবিধা হবে, যাতে নারীসম্প্রদায় নীচ, একঘেয়ে, অনুৎপাদনশীল কাজ থেকে অব্যাহতি পাবে এবং পুরুষের পাশাপাশি স্থান লাভ করতে পারবে।' পিঙ্কেভিচ মনে করেন শিশু-কিশোরের ওপর বিদ্যালয়ের প্রভাব পরিবারের চেয়ে অধিক মঙ্গলজনক হবে।

> আমরা প্রধানত বর্তমানে চালু বিদ্যালয়গুলোর সমালোচনা করি এজন্য যে এখানে যারা অধ্যয়ন করতে আসে তাদের তিন-চতুর্থাংশ সময় স্কুলের আওতার বাইরে কাটে, তাদের মেলামেশা হয় এমন ছেলেদের সঙ্গে যারা এক রকম তথ্য রাখে, যারা এক ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং দুনিয়া-জাহান সম্পর্কে তাদের একটা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে ছেলেমেয়েরা যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকে পরিণত হওয়া পর্যন্ত নিজ গৃহের প্রভাবাধীনে থাকে, অতএব তারা স্বগৃহেই একধরনের নিখুঁত শিক্ষা পায়...

www.pathagar.com

শিক্ষক হিসেবে আমরা যে ধরনের পরিবেশ থাকা জরুরি মনে করি তা ছাত্রের গৃহেই সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু সাধারণ বা প্রচলিত বিদ্যালয়গুলোতে, ছাত্রের বাড়ি ও অন্যান্য প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী বলে, আমরা কোনো ক্ষমতা খাটাতে পারি না, বা আমাদের ক্ষমতার কোনো মূল্য থাকে না।

এই অনুচ্ছেদগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় সোভিয়েত সরকার প্রকৃত প্রস্তাবে কী অর্জন করতে চাচ্ছে। তবে বর্তমানে তাদের সদিচ্ছা কেবল সদিচ্ছা হিসেবে কাজ করছে, বাস্তবায়িত হয়নি। চার কি পাঁচ শতাংশ শিশুই কেবল বিদ্যালয়ের দরজা অতিক্রম করে। বর্তমানে, যাকে আমরা সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা বলি, তা আট থেকে বারো বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য সীমাবদ্ধ। এবং এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা তাদের শুধু বছর চারেক নিলেই চলে।

রুশ দেশের বিদ্যালয়গুলো কম বিদ্যায়তনিক। তাছাড়া শুধু শুধু বিদ্যা বিতরণের বাতিক তাদের তাড়া করে না। 'অবশ্যই জ্ঞান বিতরণ লক্ষ্য হবে না। ছেলেমেয়েরা হবে স্কুল নামক প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক সৃষ্টি।' বাস্তবিক পক্ষে আমাদের স্কুলগুলোকে পরিণত করতে হবে 'স্কুল জীবনে।' 'স্কুলগুলো কাজে-কর্মে বাস্তবের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে চলবে; উৎপাদনশীল শ্রমের জন্য থাকবে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব: গোটা বিদ্যালয় কাঠামোই তৈরি করতে হবে এমনভাবে যাতে ছাত্রদের মধ্যে সামাজিকতা বিকশিত হয় এবং ভবিষ্যতের বিপ্লবী কম্যুনিস্ট হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, গড়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত সমাজতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ পায়।' ছাত্ররা বিদ্যালয়ে কেবল পড়াশুনা করে না, তারা দৈহিক শক্তি ও দক্ষতা অনুসারে কায়িক শ্রম দিয়ে থাকে; এবং তারা এটা বিদ্যা অর্জনের অংশ হিসেবে করে না, নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। পিঙ্কেভিচ বলেন, 'স্কুলে শ্রমের বিরাট সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা থাকে... গাড়ি চালনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্কুলের শ্রমের উপযোগিতা কিংবা মূল্য নির্ধারণ করলে সমাজতান্ত্রিক কিংবা সাম্যবাদী স্কুলের কোনো দরকার নেই। ছাত্রদের বোধ করতে হবে যে তারা একটা শ্রমিক সমাজের সক্রিয় সদস্য এবং শ্রমিক।' রুশ শিক্ষাব্যবস্থার এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

পিঙ্কেভিচ অবশ্য সবিস্তারে বলেন না ছেলেরা কোন ধরনের শ্রম দেবে এবং কত ঘণ্টা শ্রম দেবে। মিল-কারখানায় প্রকৃত উৎপাদনে নিয়োজিত হওয়া স্কুলে কায়িক শ্রমদানের অংশ। গ্রামীণ এলাকায় কারখানার স্থান লাভ করে খামার। জুলিয়ান হাক্সলি এ সম্পর্কে ঠিকই বলেছেন :

> কারখানাসহ শাহরিক স্কুলের চেয়ে খামারসহ গ্রামীণ স্কুল সম্পর্কে অনেক বেশি বলা যায়। কারণ কৃষিকাজ অনেক বড় ব্যাপার; পক্ষান্তরে একটি কারখানা একটি পণ্য উৎপাদনে সীমাবদ্ধ থাকে। কৃষিকাজের সঙ্গে গ্রামীণ জীবনের সম্পর্ক খুব গভীর। কিন্তু মিল-কারখানার সঙ্গে নগর জীবনের সম্পর্ক নেই বললে চলে। আর স্কুলের সঙ্গে খামার যুক্ত করা শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খুবই ভালো কাজ।*

এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য সোভিয়েৎ শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একেবারে ভিন্ন। সোভিয়েৎ শিক্ষাবিদগণ স্কুলে শ্রমদানের ব্যাপারকে নৈতিক শৃঙ্খলা আরোপের আলোকে বিচার করেন। 'বিদ্যাভ্যাস দরকারি', পিঙ্কেভিচ বলেন, 'বাস্তব জীবনের কাজকর্ম সম্পর্কে শিক্ষাদানও কম জরুরি নয়। সমাজতান্ত্রিক শ্রমস্কুলে শ্রমদান করতে হবে সামাজিকভাবে,

* A Scientist among the Soviets. পৃ. ১০২

www.pathagar.com

তবেই আবশ্যিক কাজ বলে গণ্য হবে... সামাজিকভাবে দরকারি কাজকে আমরা কি স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক চরিত্রের কাজ বলে গণ্য করব, নাকি চারপাশের জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় স্কুলের কাজ বলে গণ্য করব? আমরা মনে করি সমস্যাটার পুরো অর্থ নির্ভর করছে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণের ওপর।' অর্থাৎ ছাত্রদের শ্রম হবে অতি সাধারণ প্রয়োজনীয় কাজ, শিক্ষামূল্য যাচাই করা বিশেষভাবে নির্বাচিত কাজ নয়।

বিদ্যালয়ে সামাজিকভাবে দরকারি কাজ দু'ধরনের হতে পারে। প্রথমটা হল চিল্লাচিল্লি এবং প্রচারণাকার্য, দ্বিতীয়টা বাস্তব কাজ। ছাত্ররা বিভিন্ন বিচিত্র বিষয় নিয়ে চিল্লাচিল্লি করবে, যেমন এবার ধান বপন করা হবে না গম, নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য সব চেয়ে 'ভালো' প্রার্থী কে, এসব নিয়ে। তাছাড়া ধর্ম, ম্যালেরিয়া, ছারপোকা, ধূমপান, মাতলামি প্রভৃতির বিরুদ্ধে চিল্লাচিল্লি করতে পারে। বাস্তব কাজও বিচিত্র রকমের হতে পারে। ছেলেরা শস্য ক্ষেত্রে কীটনাশক ছড়ানোর কাজে সাহায্য করতে পারে, ভূমিধস ঠেকানোর জন্য গাছ লাগাতে পারে, কৃষকের বাড়িতে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগিয়ে দিতে পারে, নির্বাচনী ইশতেহার কিংবা প্রচার পুস্তিকা বিলি করতে পারে, নিরক্ষর লোকদের খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে পারে, এবং বাড়ি-ঘরের কীট-পতঙ্গ দূর করতে পারে। অভাবী বিধবাদের নানা ভাবে সাহায্য করাও তাদের পক্ষে সম্ভব।

সোভিয়েত স্কুলগুলো জগৎটাকে শুধু বুঝতে চায় না, এই জগতে পরিবর্তন আনাও তাদের অন্যতম লক্ষ্য। পিঙ্কেভিচ জানাচ্ছেন, স্কুলগুলোর লক্ষ্য হল মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসরণ করে জগৎটাকে সাজানো। নিষ্ক্রিয় চিন্তার ধারণা তাদের মধ্যে মোটেই কাজ করে না। সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণায় উপনীত হতে হলে আমাদের এই কথাটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

আমি তো মনে করি মার্ক্সবাদী হিসেবে নয়, রুশ হিসেবেই প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে পয়ত্রিশতম নিখিল রুশ সম্মেলনে এই প্রস্তাবটি নেওয়া হয়। 'ছেলে-মেয়েদের জীবনে সংগীত হবে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষকরা অবশ্যই ওদের ব্যক্তিগত সৃষ্টিশীলতা সুনজরে দেখবেন এবং এ ক্ষেত্রে সুবিবেচনার পরিচয় দেবেন। অর্কেস্ট্রা দল গঠন করলে এবং সমবেত কণ্ঠে গান করার ব্যবস্থা থাকলেও তাদের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে।' প্রস্তাবটা খোলা মনের প্রশংসা দাবি করে। তবে আমি মনে করি না যে, দেশে কম্যুনিস্ট বিপ্লব সাধিত হলেই ইংরেজ ছেলেরা রাতারাতি সংগীতে সুদক্ষ হয়ে উঠবে।

অন্যান্য দেশ রাশিয়ার শত্রুতে পরিণত হয়েছে কম্যুনিজমের জন্য; ফলে রুশদেশে যুদ্ধের মানসিকতা খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। আর এই যুদ্ধের মানসিকতা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের সূচনা করেছে যা অন্যান্য দেশেও লক্ষ করা যায়। তবে অন্যান্য দেশে কারণটা যুদ্ধের মানসিকতা নয়, দেশপ্রেম। রুশদেশের তরুণ অগ্রপথিকরা পশ্চিম জগতের বয়-স্কাউটদের সমতুল এমনকি অনুলিপি-প্রতিলিপিও গণ্য করা চলে। এদের 'বিধান'সমূহ নিম্নরূপ :

১. অগ্রপথিকরা শ্রমজীবী শ্রেণী এবং লেনিনের প্রতি অনুগত থাকবে।

২. অগ্রপথিকরা হল komsomol এবং কম্যুনিস্টদের অনুজ এবং সাহায্যকারী।

৩. অগ্রপথিকরা পরস্পরের কমরেড; তারা জগতের শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবীদের সন্তানদেরও কমরেড।

৪. অগ্রপথিক চারপাশের ছেলেমেয়েদের সংগঠিত করে এবং দিনের একটা সময় তাদের সঙ্গে কাটায়। অগ্রপথিক ছেলেমেয়েদের জন্য উদাহরণ হিসেবে কাজ করে।

www.pathagar.com

৫. অগ্রপথিকের প্রধান লক্ষ্য হল জ্ঞান অর্জন। কারণ সে জানে শ্রমজীবী শ্রেণীর সংগ্রামে জ্ঞান এবং দক্ষতাই মূল শক্তি।

অগ্রপথিকরা আনুষ্ঠানিক শপথও গ্রহণ করে:

'আমি, সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন তরুণ অগ্রপথিক, কমরেডদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে:

১. গোটা দুনিয়ার শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবী শ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামে শরিক হইব;

২. লেনিন প্রদত্ত নির্দেশাবলী এবং অগ্রপথিকের বিধানসমূহ ও আচার-আচরণ আন্তরিকতার সঙ্গে মানিয়া চলিব।'

আমাদের যদিও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে সোভিয়েত সরকার কোনো প্রকার 'নৈতিক' শিক্ষায় বিশ্বাস করেন না, তবু তাদের বিধানাবলি এবং শপথ বাক্যসমূহে নৈতিকতার পরিষ্কার গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়, একটু বেশি মাত্রায়ই পাওয়া যায় বলা চলে। 'তরুণ অগ্রপথিক' জ্ঞান অর্জন করছে এবং ছেলেদের মধ্যে উদাহরণ হিসেবে হাজির হচ্ছে এই দৃশ্য আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ছেলেবেলায় পঠিত শিশুপাঠ্য ধর্মপুস্তকের কথা।

যারা প্রতিক্রিয়াশীল অপপ্রচার বিস্তর শুনেছেন তাদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকবে যে, সোভিয়েত সেক্স এডুকেশনে নতুন কিছুই নেই। পিস্কেভিচ বলছেন, 'শিক্ষক এবং অভিভাবকের ভূমিকা হল যৌনতা সম্পর্কে অতিরিক্ত আগ্রহ থেকে ছেলেদের রক্ষা করা। ছোটদের শক্তি 'পরিচালিত করতে হবে শরীরচর্চা, খেলাধুলা, কায়িক শ্রম, বুদ্ধিনির্ভর কর্মকাণ্ড, অগ্রপথিক আন্দোলন, এবং সকল প্রকার সামাজিক কর্মকাণ্ডের দিকে।' অর্থাৎ তাদের নিয়োজিত করতে হবে এমন সব কাজে যেখানে দৈহিক শক্তির প্রশ্নটা প্রধান। ছেলেরা যদি এসব কাজের মাধ্যমে তাদের পুরো শক্তিটা ব্যয় করে ফেলে তা হলে তাদের মধ্যে যৌন ব্যাপারে অতি উৎসাহ কাজ করবে না।' ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে যৌন আকর্ষণ কমানোর জন্য সহ-শিক্ষা অনুমোদন করা হয়। আর যৌন ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত জ্ঞান দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ তা হলে যৌন সম্পর্ক ব্যাপারে তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে সেটা খুব কল্যাণকর বলে গণ্য হবে না। ছেলেরা কুকুর, মুরগি, গরু এবং ঘোড়ার যৌনক্রীড়া পর্যবেক্ষণ করবে এটা ভাবতেই পিস্কেভিচ আতংকবোধ করেন। তিনি বলেন, 'যৌনতার প্রশ্নটা আলাদা করে দেখা ঠিক হবে না, আর শিশু-কিশোরদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করলে অনভিপ্রেত ফলাফল আসতে পারে।' পিস্কেভিচ আরো বলেন, 'যৌন সমস্যা স্থান লাভ করবে অপরাপর সমধিক মজাদার ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার অনেক পরে।' এসব সিদ্ধান্ত ভালো কি মন্দ সে বিচারে যাবো না, শুধু এটুকু বলব যে এতে 'বৈপ্লবিক' কিছু নেই। সহ-শিক্ষার পক্ষে ওকালতি করা হয়েছে বলে একটু বিপ্লবের গন্ধ থেকে গেছে। তাছাড়া আর যা-কিছু বলা হয়েছে তার সঙ্গে ইংরেজ প্রধান শিক্ষকগণ ভিন্নমত পোষণ করবেন না।

রুশদেশের বর্তমান শিক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ড থেকে অনুমান করা সম্ভব নয় যে কম্যুনিজমের অধীনে শিক্ষার কী উন্নতি হবে। সোভিয়েত সরকার অনেক ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলোর একটিও বাস্তবায়িত করেন নি। শুধু তাই নয়, জগৎজোড়া পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে বিবাদের দরুন স্কুলগুলো আক্রান্ত হয়ে পড়েছে যুদ্ধ মানসিকতা দ্বারা। ফলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে কম্যুনিজম সর্বত্র জয়ী হলে শিক্ষাদর্শ কিরূপ নেবে। ১৯২০ সালের পর আমি নিজে রুশদেশ ভ্রমণে যাইনি। সে সময়ে এক্ষেত্রে অগ্রগতি খুব একটা চোখে পড়েনি। ঐ সময়ে নার্সারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের খুব হাসি-খুশি

www.pathagar.com

দেখেছি, তবে ওদের মুখে কথা ফোটার সঙ্গে–সঙ্গে জোর প্রচারকার্য শুরু হয়ে যায়। বয়স্ক বালকদের বিদ্যালয়ও দেখেছি, ভালো চলছে, তবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ঘাটতি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেছি, ওদের অবস্থা খুব ভালো নয়। অবশ্য আমার এই অভিজ্ঞতার মূল্য তেমন একটা নেই। কারণ এরপর নিশ্চয় অনেক পরিবর্তন এবং উন্নতি হয়েছে। তবে এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর কিছু বিবরণ আমি পেয়েছি।

বর্তমানে ধর্ম ও সেক্স ব্যাপারে রুশ ও পশ্চিমী স্কুলগুলোর মধ্যে তফাৎ খুবই কম। রুশ দেশে যে ধর্ম বিষয়ে পড়ানো হয় তা ভিন্ন, তবে পড়ানোর ক্ষেত্রে সমান গোঁড়ামি কাজ করে। পশ্চিম জগতের মতো রুশদেশেও কিছু বিধান রয়েছে যেগুলো অন্ধের মতো বিশ্বাস করতে হয়, এগুলো সম্পর্কে কোনো প্রকার সন্দেহ কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। রুশদেশের ধর্ম খ্রিস্ট ধর্ম থেকে একেবারে ভিন্ন। সত্য যে, এই ধর্ম তরুণরা উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং তা তাদের গোটা জীবনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। আরো সত্য যে, মেধাবী তরুণরা রুশ ধর্মকে উন্নততর বিশ্ব গড়ার হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করতে পারে, এবং বাস্তবক্ষেত্রে উক্ত ধর্মের ডগমাগুলো মেনে নিতে পারে, আর তা পারে স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি বর্জন না করেই। এক্ষেত্রে মার্ক্সবাদ এখন কিছুটা সুবিধা ভোগ করছে, যে সুবিধাগুলো খ্রিস্টধর্মও প্রথম যুগে ভোগ করেছে। তবে মার্ক্সবাদ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত এবং বিজয়ী হবার পরও কি এই সুবিধাগুলো থাকবে? এটি একটি অর্ধ–শূন্য দেশ, অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য পরিপক্ব, ফলে আশায় বুক বেঁধে আছে, ফলদায়ক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। আমেরিকারও এক সময় একই অবস্থা ছিল। তখন তারা ছিল গণতন্ত্রের প্রবক্তা এবং অগ্রদূত। ঐ সময় প্রগতিশীল ইউরোপীয়রা আমেরিকা ও গণতন্ত্রের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ বোধ করতেন। অনুরূপ ভৌগোলিক কাকতালীয় ঘটনা ঘটছে কম্যুনিজের পক্ষে।

মার্ক্সীয় মতবাদ এখনকার মতো ভবিষ্যতেও যদি সমান জোর নিয়ে চলে তা হলে বুদ্ধিবৃত্তিক সকল কর্মকাণ্ড রুদ্ধ হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো কোনো দিক কম্যুনিস্টরা তাদের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এখন কোয়ান্টাম থিওরি অনুসারে পরমাণুর যা রূপ দাঁড়িয়েছে তা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এই যে মনে করা হয় মানব চরিত্রের সব কিছুর মূলে অর্থনৈতিক কারণ কাজ করে, এটা যে কোনো সময় বিজ্ঞানের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে পারে। উদাহরণ, বক্রকৃমি (hook-worm) গ্রীষ্ম প্রধান দেশে মানুষের শক্তি ক্ষয় করে, তা হলে দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে অর্থনীতি নয়, আবহাওয়া মূল চালিকাশক্তি। উপরন্তু, মার্কসীয় দর্শন শ্রেণী সংগ্রাম নিয়ে এত বেশি ভাবিত যে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের পর এই দর্শন কী করবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলতে পারে না। যদি বিজয়ী মার্কসীয় ডগমা খ্রিস্টান ধর্মের স্থান লাভ করে, তাহালে এই ধর্মও খ্রিষ্ট ধর্মের মতো বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

অবশ্য মনে হয় না যে কম্যুনিজম বিজয়ী হবার পর তার দর্শন পূর্বেকার শক্তি রক্ষা করে চলতে পারবে। কম্যুনিজম প্রকৃত প্রস্তাবে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার মূল্যায়নও করতে হবে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ–এর মতবাদ এবং ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা কম্যুনিস্ট থিওরির সঙ্গে খুব যৌক্তিকভাবে সম্পৃক্ত নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে কম্যুনিজমের প্রতি যদি আর কোনো চ্যালেঞ্জ না আসে, তা হলে অন্যান্য ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকার খর্ব করার দরকার থাকবে না। মার্কস ও লেনিন বরাবর শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন, আবার এটাও আবিষ্কৃত হবে যে, তারা যা কিছু বলেছেন সব সময় পুরো জোর দিয়ে বলেন নি। আজকের দিনে যে ডগম্যাটিজম

www.pathagar.com

লক্ষ করি তা শ্রেণী সংগ্রামের জন্য দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং আমরা আশা করতে পারি যে, সংগ্রাম সফল হবার পর ডগম্যাটিজম অনেকটা হ্রাস পাবে।

অনুরূপ বিচার শ্রেণী দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও আরোপ করা চলে। আমরা দেখেছি যে, পুঁজিবাদী দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমাজে ধনী লোকদের প্রাধান্যের জন্য, রুশদেশে শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সর্বহারা শ্রেণীর প্রাধান্যের জন্য। সর্বহারার সন্তানদের শেখানো হয় তারা যেন 'বুর্জোয়া' শ্রেণীর সন্তানদের ঘৃণা করে। আর বুর্জোয়া পরিবারের তরুণ ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে গিয়ে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সর্বহারার সন্তানেরা পায় মদদ। অবশ্য এক প্রজন্মের মধ্যে এই অসুবিধাগুলো দূর হয়ে যাবে। কারণ অতঃপর সমাজে সর্বহারার সন্তান ব্যতিরেকে অপর কোনো শ্রেণীর সন্তান খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এখানে আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। পরিবার প্রথা কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যাবে কি–না। আশা করা যায় যে, দেশের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হবার পর সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠানাদির তত্ত্বাবধানে অধিক সংখ্যক সন্তানের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করবে। আর এই ছাত্রদের সঙ্গে তাদের পিতামাতার যোগাযোগ একেবারে থাকবে না বললে চলে। পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে এই ব্যবস্থার সুবিধা এবং অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব এখানে তার পুনরাবৃত্তি করার দরকার করে না। তবে ভালো হোক মন্দ হোক, পূর্ণ বিকশিত কম্যুনিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থায় এটিই বোধ হয় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য শিক্ষা কম্যুনিজমের অধীনে থাকা ভালো। থাকলে অন্তত পুঁজিবাদী দেশগুলোর চেয়ে অবস্থার উন্নতি হবে অধিক। একটি হলো, এতে প্রতিযোগিতা হ্রাস পাবে, আর ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব বর্তাবে গোষ্ঠীর ওপর। সত্য যে, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের মতো দেশের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা এ কাজটি সদিচ্ছা থাকলে করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে পারে না, কারণ স্কুলগুলোর দায়িত্ব হয়ে যায় ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য তৈরি করা এবং পরবর্তীকালের প্রতিযোগিতাপূর্ণ বয়স্কজীবনের যোগ্য করে তোলা। উপরন্তু ব্যতিক্রমধর্মী স্কুলগুলো থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্ররা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গেলে ভীষণ বেগ পায়। এই অসুবিধা হয়তো এক সময় দূরও হয়। কিন্তু রুশ ছাত্রদের এই অসুবিধার সম্মুখীনই হতে হয় না। কোনো স্কুলের লক্ষ্য যদি হয় ব্যতিক্রমী পরিবেশ তৈরি করা তবে সেটা বাস্তব জগৎ থেকে কম–বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কোনো সময় দরকার হলেও এটি খুব ভালো কাজ হবে না। রুশদেশে প্রতিযোগিতা শুধু স্কুল থেকে নয়, প্রাত্যহিক জীবন থেকেও হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে, যা পশ্চিমের দেশগুলোতে লক্ষ করা যায় না।

জাগতিক খুঁটিনাটি কাজে স্কুলগুলো অংশগ্রহণ করলে কিছু বিপদের আশঙ্কা থেকে যাবে, তবে কিছু সুবিধাও পাওয়া যাবে, যার জন্য, আমি মনে করি, এটি গ্রহণযোগ্য। বর্তমানে ছাত্রদের কোন কোন কাজ করা উচিত তা নিয়ে প্রচারণা চলে খুব বেশি: কম বয়সেই তাদের কম্যুনিজমে বিশ্বাসী মিশনারিতে পরিণত করা হয়, এতে ছাত্রদের মনে কিছুটা সংকীর্ণতা ঢুকতে বাধ্য, তাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত আত্মবিশ্বাসও জন্মে। তবে ছেলেরা যদি গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নিজেদের অনুভব করতে পারে তা হলে সেটা কল্যাণ ডেকে আনবে। তবে তাদের মধ্যে এ বোধটাও কাজ করতে হবে যে, তারা দক্ষতা অনুসারে সমাজের প্রয়োজনে লাগবে। আমি মনে করি পশ্চিমের প্রগতিশীল শিক্ষাবিদগণ চেয়েছেন ছেলেরা নিজেদের গুরুত্ব বুঝুক, তারা কম বয়সী অভিজাত হিসেবেও নিজেদের ভাবতে পারে; আর বয়স্কদের কাজ হবে

www.pathagar.com

এদের সেবা করা। এতে কিন্তু তারা বড়ো হয়ে ওঠে নৈরাজ্যবাদী হিসেবে, সমাজজীবনের নানা বিধিনিষেধ মেনে চলায় অভ্যস্ত হতে পারে না, প্রায়ই অধৈর্যের পরিচয় দেয়। এই ত্রুটি থেকে রুশ শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে মুক্ত: ছেলেরা প্রথম থেকেই অনুভব করে যে তারা সমাজের এক একটি ইউনিট এবং সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কর্মবিধি দ্বারা তাদের মধ্যে এই বোধ জাগানো হয় না। করা হয় তার কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে। রুশ নৈতিক শিক্ষার আচরণবাদী এই অংশ খুবই প্রশংসা পাবার যোগ্য। এতে একান্ত সমর্থ তরুণও নিজেকে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। পশ্চিমের তরুণদের মতো নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে না, সিনিসিজম থেকে লুণ্ঠনজীবী হয়ে ওঠে না। কম্যুনিজম যে নৈতিক শৃঙ্খলা উদ্ভাবন করেছে তা আধুনিক তরুণরা গ্রহণ করলে ভালোই হবে। কম্যুনিজম জীবনের যে ছক বেঁধে দিয়েছে তাতে আধুনিক তরুণরা সুখী হবে। পুঁজিবাদী দেশগুলো এই সমস্যার কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ পশ্চিমের দেশগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দমবাজি ছাড়া টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

প্রাচীন সভ্যতার ধনিক ও জটিল সংস্কৃতির ভেতর বেড়ে ওঠা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর কাছে, স্বীকার করতে হবে যে, কম্যুনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি অগভীর ও একঘেয়েমিপূর্ণ। সবকিছুতেই শ্রেণী যুদ্ধের গন্ধ পাওয়া কদর্য ব্যাপার, এতে মানসিক কর্মকাণ্ডের সুখ বিনষ্ট হয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান থেকে একটা উদাহরণ নিলেই বোঝা যাবে আমি কী বলতে চাচ্ছি। দূরবর্তী নক্ষত্র ও নীহারিকার দূরত্ব পরিমাপ করার পদ্ধতির কথা ধরা যাক না কেন। একে শুধু পদ্ধতি বললে সব কথা বলা হয় না, একে বলতে হবে উদ্ভাবনী দক্ষতার পরাকাষ্ঠা: এতে সমন্বয় ঘটেছে সতর্ক যুক্তিশীলতার সঙ্গে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের। আমি যতদূর জানি বা বুঝি তাতে বলতে পারি একটা নক্ষত্র একশো আলোকবর্ষ দূরে, না এক হাজার আলোকবর্ষ তার সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু মানুষ যে নির্ণয় করতে পারে কোনটা সত্যের সমধিক কাছাকাছি তা মানবজাতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আরো বাড়িয়ে দেয়। আমি কিন্তু এ-ধরনের কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না যে কম্যুনিজম জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে, আমি শুধু ইংগিত করছি যে, কম্যুনিজমের দর্শন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস ও অনুসরণ করলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা অপঘাতে মারা যাবে, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় উৎসাহ আর থাকবে না। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কেবল বিপথগামী করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নিউটনের সূত্রগুলোর পশ্চাতে সকল ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকারণ সক্রিয় থেকে থাকতে পারে, কিন্তু সূত্রগুলো এত বেশি মজাদার এবং গুরুত্বপূর্ণ যে এ সবের পশ্চাতের কার্যকারণ সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার আগ্রহ আর থাকে না। অর্থনীতির কাজ হল আমাদের বাঁচিয়ে রাখা; এই বাঁচিয়ে রাখার সমস্যা যদি একবার সন্তোষজনকভাবে সমাধান করা যায় এবং কম্যুনিজমের মাধ্যমেই তা সমাধান করা সম্ভব, তা হলে আমাদের অন্য কিছু নিয়ে ভাববার দরকার করবে, একটা নতুন তত্ত্বের প্রয়োজন আমরা অনুভব করব যা দিয়ে 'ভবিষ্যত' ইতিহাস ব্যাখ্যা করা যাবে। আমরা যদি শ্লোগান আওড়াতে চাই তা হলে সরলতার মূল্য বুঝব, কিন্তু দর্শনে সরলতার কোনো স্থান নেই।

সব কিছু পরিকল্পিত হলে অবাঞ্ছিত সরলতা এসে যাবে, উপরন্তু একঘেয়েমি লাগবে, এমনকি একই কথা বার-বার শোনার জন্য মনের অসুস্থতাও দেখা দিতে পারে। হয়তো আমাদের জীবনই এই বিপদ সহজে এড়াতে পারবে। অন্তত রুশ দেশের লোকেরা প্রাগ-বিপ্লব কাল থেকেই এত বেশি সজাগ যে কম্যুনিজম অদূর ভবিষ্যতে জীবনে সরলতা সূচনা

www.pathagar.com

করতে সমর্থ হবে না। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি সুস্পষ্ট ও মজাদার বাস্তব কাজ কিছু করা না যায় তা হলে অতি-সরলতার প্রকৃত বিপদের সম্মুখীন আমাদের হতে হবে। মার্ক্সীয় নীতিমালার চেয়ে জগৎ অনেক সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। দাস কাপিতাল-এর আওতায় থেকে এক প্রজন্মের লোক কেজো, সুখী এবং আত্ম-গরিমার অধিকারী হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে না কোনোদিন, বুঝতেও পারবে না যে সে বিজ্ঞতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এই প্রজন্ম জীবন সম্পর্কে ব্যঙ্গার্থে হবে সুনিশ্চিত এবং অগভীর। আমি অবশ্য একথাগুলো বলছি দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে, রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বললে (একটু ব্যাপক অর্থে) আমাদের রায় ভিন্ন হতে বাধ্য। পরিবার এবং নারী-পুরুষের সাম্য সম্পর্কিত জটিল সমস্যার একটা সমাধান কম্যুনিজম আমাদের উপহার দিয়েছে। এই সমাধান আমাদের পছন্দ হতে না পারে, কিন্তু উক্ত সমাধানে যে বাস্তবতা আছে সেটা মানতে হবে। এতে ছোটদের জন্য একটু শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যেখানে প্রতিযোগিতার জন্য কোনো স্থান রাখা হয়নি। এখানে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যেখানে মানুষের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের চিরায়ত সমস্যার বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের স্কুলগুলো জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, কম্যুনিজম এই বিচ্ছিন্নতা দূর করে। আমাদের স্কুলগুলোর উৎস বানরবৃত্তি, যে বানরবৃত্তির জন্য পশ্চিম জগতের বুদ্ধিজীবীরা দিনের পর দিন সমাজের নিষ্কর্মা সদস্যে পরিণত হচ্ছে। কম্যুনিজম তরুণ-তরুণীদের সামনে একটি আশা জ্বেলে দেয় যা অসার কিংবা আলেয়া নয়, তাদের সামনে এমন কর্মকাণ্ড তুলে ধরে যার যাথার্থ্য সম্পর্কে তাদের মনে কখনো সন্দেহ জাগে না। এই মতবাদ যদি বিশ্ব জয় করে, এবং করতে পারে, তা হলে আমাদের সময়ের অনেক অমঙ্গল দূর করতে পারবে। এজন্যই, অনেক আপত্তি সত্ত্বেও, কম্যুনিজম আমাদের সমর্থন পাবার যোগ্য বলে আমি মনে করি।

www.pathagar.com

শিক্ষা ও অর্থনীতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখেছি যে, পশ্চিমের দেশগুলোর গণশিক্ষায় এমন অনেক কিছুই রয়েছে যার সমালোচনা না করে থাকা যায় না। এক শ্রেণীর লোক মনে করে শিক্ষাব্যবস্থায়, এমনকি যে কোনো ব্যবস্থায়, ত্রুটির জন্য দায়ী বাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আমি নিজে এটা বিশ্বাস করি না; আমি বরং বিশ্বাস করি যে, যে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কিছু নির্বুদ্ধিতা, কিছু ক্ষমতা-লিপ্সা থাকবেই। আর এগুলো নিখুঁত শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেই। তবু স্বীকার করতে হবে যে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাব সুগভীর হতে বাধ্য। এই অধ্যায়ে আমি বিভিন্ন কালের, এবং বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অর্থনৈতিক উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে দেখার চেষ্টা করব।

অন্ধকার যুগের পর প্রথম যে শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করা হয় তাতে অধিকার ছিল একমাত্র ধর্মযাজক শ্রেণীর। আজকের দিনেও পাঠ্যসূচিতে যাজক শ্রেণীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। রেনেসাঁসের আগে সাধারণ অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষা খুব একটা ছিল না। কিন্তু পুরোহিত শ্রেণীর ব্যাপক বিদ্যাবত্তা ছিল। পেশাগত কারণেই লাতিন ভাষার জ্ঞান থাকা দরকার ছিল। কিন্তু এতে খুব একটা কাজ হত না। প্রধানত সিসিলি ও স্পেনের মুরদের (Moors) সঙ্গে সংযোগের কারণেই একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে জ্ঞানচর্চা পুনরায় শুরু ও সূত্রপাত হয়। সংযোগটা অর্থনৈতিক কারণেই সৃষ্টি হয় এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর এতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার জন্য প্রশংসা করতে হবে কিছু ব্যক্তির নিরাসক্ত জ্ঞানাকাঙ্ক্ষাকে।[১] স্কলাস্টিক দর্শন সৃষ্টি হতে পেরেছে খ্রিস্টান পুরোহিতদের আন্তরিক উৎসাহের জন্য, এতে তারা কোনো আর্থিক সুবিধা পাননি, অনেকে অসাধারণ কল্পনাপ্রতিভার জন্য দুর্নাম কুড়িয়েছেন। জ্ঞানচর্চা চালু রাখার জন্য খ্রিস্টান সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুদের দরকার ছিল এবং তাদের মধ্যে প্রেরণা হিসেবে জ্ঞানতৃষ্ণা কাজ করেছে, অন্য কিছু নয়।

এর কিছুকাল পর সাধারণ অভিজাত শ্রেণী জ্ঞানচর্চা শুরু করে। তারাও প্রেরণা লাভ করেছে জ্ঞানতৃষ্ণা থেকে। সম্রাট ফ্রেডারিক (২য়) থেকে সেক্যুলার কালচার শুরু হয়। এই সম্রাট ছেলেবেলা থেকে মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তার মধ্যে অপার কৌতূহল কাজ করেছে। পঞ্চদশ শতকে ইতালিতে যে গ্রিক ভাষা চর্চা শুরু হয় এবং উদ্ভব ঘটে রাজকীয় সংস্কৃতির, তার পেছনে সক্রিয় ছিল নিছক বিদ্যানুরাগ। এটা

১. দেখুন, The Legacy of Israel (Oxford University Press), by Various authors, pp. 204. ff.

www.pathagar.com

ঠিক যে, এই সদিচ্ছা এক সময় হারিয়ে যায়: তখন ভদ্রলোক হওয়ার লক্ষণ দাঁড়ায় গ্রিক ও লাতিন ভাষার কিছুটা জ্ঞান থাকা। এই জ্ঞান ছোটদেরও জোর করে গেলানো হত। ফলে বড় হয়ে এ বিষয়ে তারা আর কোনো প্রকার আগ্রহ দেখাত না। তবু গ্রিক ও লাতিন দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উৎসাহ আসতো স্নবারি থেকে, অর্থনৈতিক কারণে নয়। সংস্কৃতিবান হতে ব্যর্থ হয়ে কোনো ভূস্বামী জমির খাজনা তোলা বন্ধ করে দিত না। সন্ন্যাসীদের মতো অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ছিল অবসরভোগী, এবং তারা ইচ্ছে মতো আনন্দের জন্য জ্ঞান অর্জন করতে পারতেন। এই জ্ঞান ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে এমন ধারণা তাদের মধ্যে কাজ করত না।

যদিও জ্ঞানের জন্য জ্ঞান অর্জন বাঞ্ছনীয়, এই ধারা এখনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কাজ করে এবং আজকের দিনের কোনো কোনো দার্শনিকের মধ্যে এই ধারণা এখনো বিদ্যমান (আমি নিজে একজন), তবু ইতোমধ্যে কিছু-কিছু ঘটনা ঘটেছে যার ফলে শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কিত ধারণা আমূল বদলে গেছে। এই ঘটনাগুলোর অন্যতম হল সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দেখা গেছে যে, বালক-বালিকারা যদি লিখতে ও পড়তে শেখে তা হলে তারা সুনাগরিক হতে পারবে, কর্মী হিসেবেও হবে সুদক্ষ। সত্য যে, এই লক্ষ্য হাসিল করতে গিয়ে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞরা স্কলাস্টিক ঐতিহ্য দ্বারা বাধাগ্রস্ত হন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ছিল একেবারে কেতাবি। অবশ্য বলা চলে যে, কিছুটা হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের লক্ষ্য আরো বেশি হাসিল হত। এক্ষেত্রে রুশ শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক বেশি যুগোপযোগী। তথাপি স্কুলগুলো তাদের দায়িত্ব মোটামুটি পালন করেছে এবং প্রতিটি সভ্য দেশের সরকারসমূহের দরকারি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

আর একটি ব্যাপার, শিক্ষা সম্পর্কে উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি হয়েছে। আজকের দিনে প্রযুক্তির জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দরকার। আর নতুন উদ্ভাবন সম্পদের উৎস এবং জাতীয় গৌরবের ব্যাপার; এক্ষেত্রেও সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া অন্য সবখানে পূর্ব যুগের ঐতিহ্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থা যদি পুরোপুরি উপযোগবাদী বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত হত, তা হলে বিজ্ঞান ও শিল্পপ্রযুক্তির স্থান হত অনেক উপরে, আর শিল্পসাহিত্যের গুরুত্ব যেত অনেকটা কমে। এই ব্যাপারটা এখনো পুরোপুরি ঘটেনি, তবে ক্রমে-ক্রমে ঘটছে। অবশ্য পুরোটা ঘটতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

অর্থনীতি শিক্ষাব্যবস্থাকে পাঁচ রকমে প্রভাবিত করে। আমরা একটি একটি করে সবিস্তারে আলোচনা করব।

প্রথমত, একটি দেশ শিক্ষা খাতে কী পরিমাণ ব্যয় করতে পারবে তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। দেশ ভেদে পরিমাণ কম-বেশি হবেই। কিন্তু পশ্চিমের দেশগুলো শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য চেষ্টা না করলে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্ভব হত না। চীনে জনগণ কর্তৃক পশ্চিমী ধ্যান-ধারণা অবলম্বন করার আগে যে শিক্ষার কদর ছিল তার তুলনা অন্য কোথাও মেলে না। কিন্তু চীন সরকার জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশের বেশি ছাত্রের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবেন না, আর্থিক দীনতার কারণে। ১৭৮০ কিংবা ১৮৩০ সালের ইংল্যান্ডে প্রত্যেকের শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা নতুন কর আরোপ করে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আজকের দিনেও সবার জন্য নার্সারি স্কুলের ব্যবস্থা সম্ভব নয় বলে বিবেচনা করে। হয়তো কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই এটা করা সম্ভবপর। অপরদিকে, স্কুল জীবন দীর্ঘতর করলে আর্থিক অসুবিধা সৃষ্টি

www.pathagar.com

হবে না বলে মনে করা হয়। এ দিকে বেকার সমস্যা এবং সংরক্ষণবাদ নীতির জন্য সাংসারিক লোকেরা মনে করছেন যে কলিমুদ্দি কাজ করছে বলে ছলিমুদ্দির দারিদ্র্য দূর হচ্ছে না। ফলে এরা মনে করেন যে, জনসংখ্যার কোনো অংশকে উৎপাদনশীল কাজ থেকে দূরে রাখতে পারলে দশের মঙ্গল। এ জন্যই মনে করা হয় যে ছেলেদের অধিককাল স্কুলে আটকে রাখতে পারলে আমাদের অবস্থার আরো উন্নতি ঘটবে। ইংল্যান্ডে স্কুল জীবন দীর্ঘতর করা যাচ্ছে না, অর্থনৈতিক কারণে নয়, ধর্মতাত্ত্বিক কারণে। কী মানসিকতা নিয়ে বালক-বালিকারা জগৎ-সংসারে অবতীর্ণ হবে সে সম্পর্কে মতবাদী দলগুলো অভিন্ন মতে পৌঁছতে পারছে না।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা। সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা যারা প্রবর্তন করেন তাদের এটিই ছিল প্রধান লক্ষ্য, আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত লক্ষ্য সমাজের জন্য ছিল মঙ্গলজনক। কারণ, একথা তো ঠিক, স্বাক্ষর জনগোষ্ঠী নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর চেয়ে সুদক্ষ। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে প্রযুক্তি উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, এবং গবেষণার ওপর। বৃটিশ গভর্নমেন্ট গবেষণার জন্য ব্যয় করেন খুবই কম, সরকারের আর্থিক হিসেব-নিকেশ সুষ্ঠু হলে তারা গবেষণা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতেন। এটা হচ্ছে না এ কারণে যে, আমলার দলের প্রথাগত শিক্ষা খুবই আছে, কিন্তু একজন আধুনিক মানুষের যা-কিছু জানা উচিত তা তাদের জানা নেই। উদাহরণত রোগ-বালাই নিয়ে গবেষণার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। অধিকাংশ লোক শৈশবে এবং বার্ধক্যে সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ, এদের কর্মজীবনটাই শুধু সমাজের জন্য লাভজনক। আর্থিক বিবেচনায় শিশুমৃত্যু সমাজের জন্য ক্ষতিকর, সুতরাং শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস রাষ্ট্রের জন্য লাভজনক। কিংবা অর্থনৈতিক কীটপতঙ্গ বিজ্ঞান নিয়ে ভাবা যাক; কার্যক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে জনগণের টাকা খরচ করতে গিয়ে অতি হিসেবি হলে সেটা আতিশয্য বলে গণ্য হবে। আমি কিন্তু কৃত্রিম রং, বিস্ফোরক সামগ্রী এবং বিষাক্ত গ্যাসের মতো শিল্প গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করছি না। এ গুলোর কোনো কোনোটি মানুষের খুবই কাজে লাগে, কোনো কোনোটি মানুষের জন্য বিপজ্জনক। আমরা যাদের শিক্ষিত বলে জানি তাদের মধ্যেও অনেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন না। সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যখন উপলব্ধি হবে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই, তখন ধনী লোকেরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য অনেক বেশি টাকা ঢালবেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতেও বিজ্ঞান সমধিক গুরুত্ব পাবে।

তৃতীয়ত, শিক্ষার ওপর বিতরণ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া অপরিসীম। উপরে যে দুটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি। বিতরণ ব্যবস্থা সমাজের শ্রেণী বিভক্তির নির্ণায়ক, আর যেখানে শ্রেণিভেদ বিদ্যমান সেখানে বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা পাবে। পুঁজিবাদী সমাজে মুজুর শ্রেণীর লোকের সন্তানেরা ন্যূনতম শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। সাধারণ একটি ছেলে বা মেয়ে তার পিতামাতার শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য হয়। কিন্তু অসাধারণ যোগ্যতার কারণে যারা স্কলারশিপ লাভ করে তারা পরবর্তীকালে পেশাজীবী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারে। এ ভাবেই ইংলন্ডে শ্রমজীবী শ্রেণীর মেধাবী ছেলেরা রাজনৈতিকভাবে নির্বীজিত হয়ে পড়ে, স্বীয় শ্রেণীর কোনো প্রকার সেবা করতে পারে না। আর সহজে শ্রেণী ভাঙা-গড়ার জন্য ধনিকতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে অভিজাততান্ত্রিক সমাজের একটা পার্থক্য থেকে যায়। এ জন্যই অভিজাততন্ত্র নয়, ধনিক শ্রেণী কর্তৃক শাসন কালে বিপ্লব সাধন কঠিনতর।

www.pathagar.com

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিরুদ্ধবাদীরা 'পুঁজিবাদ' বলেন, সেটা কিন্তু খুবই জটিল বস্তু। আমাদের লক্ষ্যের জন্য পুঁজিবাদ বস্তুটা কি সেটা বোঝা দরকার। আমি বলব সোভিয়েৎ ইউনিয়নের বাইরে বৃহত্তর আধুনিক দুনিয়ায় সম্পদের উৎস তিনটি। ভূমির মালিকানা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর একচেটিয়া অধিকার; দ্বিতীয়ত, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ; তৃতীয়ত, বাণিজ্যিক উদ্‌যোগ। উৎস তিনটি কিন্তু আবশ্যিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়; হেনরি জর্জ প্রথম উৎসটি বিলুপ্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি সম্পর্কে তিনি কোনো প্রকার মন্তব্য করেন নি। ক্যাথলিক সেকুলার পুরোহিততন্ত্রে প্রথমটি স্বীকৃত, তৃতীয়টিও তারা মেনে নিতে রাজি আছেন, কিন্তু দ্বিতীয়টির বিলুপ্তি প্রত্যাশা করা হয়। কোনো কোনো সেমাইট বিরোধী গোষ্ঠী প্রথম ও দ্বিতীয়টির পক্ষপাতী, কিন্তু তৃতীয়টির আশু বিলুপ্তি দাবি করেন। ভূমির মালিকানা এবং উত্তরাধিকার আইন এসেছে অভিজাততন্ত্র থেকে, আর সমাজতন্ত্রীরা এটিরই বেশি সমালোচনা করে থাকেন। তারা আবার বাণিজ্যিক উদ্যোগ মেনে নিতে রাজি আছেন। কিন্তু যেখানে সম্পদের পাহাড় গড়ার প্রধান উপায় হল বাণিজ্যিক উদ্যোগ, উদাহরণত, হেনরি ফোর্ড বাণিজ্যিক উদ্যোগ দ্বারাই জীবনে সফল হন, সেখানে ভেবে দেখার দরকার এই পন্থা সামগ্রিকভাবে সমাজের মঙ্গল করে সমপরিমাণ অমঙ্গল ডেকে আনে কি-না। আর এটা তো সুনিশ্চিত, উত্তরাধিকার আইন বিলোপ করা হলে সঙ্গে-সঙ্গে শ্রেণীচেতনাও বিলুপ্ত হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ধনী ঘরের ছেলেরা যে শিক্ষা পায় তা মজুরের ঘরের ছেলেদের থেকে ভিন্ন। ইউরোপে অভিজাততন্ত্র-এর প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। কিন্তু আমেরিকায় পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে আমেরিকার ধনিকতন্ত্র অভিজাততন্ত্র দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এজন্য আমেরিকায় বাণিজ্যিক উদ্যোগ হল সম্পদের প্রধান উৎস। এটা মার্কিনি তরুণদের মানসিকতা প্রভাবিত করে। যেখানে ভূমির মালিকানা এবং উত্তরাধিকার আইন সম্পদ আহরণের মূল উৎস সেখানকার তরুণদের মানিসকতায় ধনিকতন্ত্র কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। এতে ব্যক্তিসত্তা প্রাধান্য পায়, সেজন্য এটি ভালো; এতে প্রতিযোগিতার মানসিকতা উৎসাহ পায় বলে এটি আবার একই সঙ্গে সমাজবিরোধীও। এর চেয়ে ভালো কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি কায়েম করা যায় তা হলে প্রতিযোগিতা অনেকটা কমে যাবে, আজকের দিনে যে জঘন্য শ্রেণীভেদ দেখতে পাই তা অনেকটা দূর হবে। এটা ঠিক যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা হয়তো তবু থেকে যাবে, ভিন্ন ধরনের শ্রেণীভেদও হয়তো লক্ষ্য করবো। কম্যুনিস্ট সমাজে নানা ধরনের পদ থাকবে, কোনো কোনো পদের চাকুরি সুখকরও হবে। যারা সুখকর পদে চাকুরি করবে তারা উচ্চতর শ্রেণীর বলে গণ্য হবে। আর উচ্চতর পদ এবং অধিক আয়েসি চাকুরি পাবার জন্য প্রতিযোগিতাও বাড়বে মাত্রাতিরিক্ত। কিন্তু সমাজে উত্তরাধিকার আইন এবং পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতা না-থাকলে প্রতিটি ব্যক্তি স্বীয় মেধা খাটিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। অবৈধভাবে উন্নততর শিক্ষালাভের সুযোগ সে পাবে না। কেউ যদি প্রতিবেশীর চেয়ে ভালো শিক্ষা লাভ করতে পারে, তা হলে বুঝতে হবে যোগ্যতার জন্যই উচ্চশিক্ষা পেয়েছে, তার পিতা ধনী বলে নয়। ফলে এই সমাজে শ্রেণীভেদ থাকলেও সে শ্রেণীভেদের ভিত্তি হবে ব্যক্তির নিজস্ব গুণাগুণ। একজন বড় ভায়োলিনবাদক, উদাহরণত, সব সময়েই মধ্যম মানের ভায়োলিনবাদকের চেয়ে উপরে স্থান পাবেন। তাকে সম্মানী খুব বেশি দেওয়া না হলেও, সম্মান করা হবে অনেক বেশি।

এতটুকু অসাম্য এবং প্রতিযোগিতা কিছুতেই এড়ানো যাবে না। প্রকৃতিতেই অসাম্য বিদ্যমান, আর প্রতিযোগিতা এজন্য থাকার দরকার যে, তাতে জটিল কাজ সমাধানের দায়িত্ব

www.pathagar.com

সবচেয়ে যোগ্য লোকের হাতে পড়বে। এ কারণেই অতি-শিক্ষা (এ সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী একটা অধ্যায়ে আলোচনা করেছি) একটি জটিল ব্যাপার। তবে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। সবার জন্য আর্থিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে। বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতার জন্য দায়ী অসাম্য এবং আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা। এসব দূর করা গেলে তীব্রতার হুল ভোঁতা হয়ে যাবে।

দেশপ্রেম সম্পর্কে বলা যায়: দেশপ্রেম নানা কারণে সৃষ্টি হয়, তবে এর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিকট সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এটা সঙ্গে-সঙ্গে টের পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই সম্পর্কের ব্যাপারটা ব্যক্তির সচেতন মনে কখনো কাজ করে না। সম্পর্কটা ঘোরানো-পেঁচানো, পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ এর জন্য দায়ী। বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, অনুন্নত দেশ দুটো প্রয়োজনে লাগে। বাজার এবং কাঁচামালের উৎস হিসেবে। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকলে দুটিই লাভজনক প্রমাণিত হয়। ফরাসি পুঁজি অত্যন্ত লাভজনকভাবে উত্তর আফ্রিকায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে। বৃটিশ পুঁজি বিনিয়োগ করা হচ্ছে ভারতে। মার্কিনি পুঁজি খাটছে মধ্য আমেরিকায়। এজন্য বিদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদ পছন্দ করে। এই সাম্রাজ্যবাদ ভূ-খণ্ডগত না হলেও, আবশ্যিকভাবে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ হয়। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা এটাও বোঝে যে, নাগরিকদের মধ্যে অপপ্রচার চালিয়ে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে পারলে সাম্রাজ্যবাদিতা করতে গিয়ে যে ব্যয় হয় তার একটা বিরাট অংশ করদাতাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। আর এটিই হল অধিকাংশ শক্তিধর দেশের দেশপ্রেমের উৎস। নাগরিকরা দেশপ্রেমের অন্তর্নিহিত কুমতলব কখনো আঁচ করতে পারে না। দুর্বল দেশের দেশপ্রেম হল সবল দেশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। যতদিন তারা অপরকে শোষণ না করে নিজেরা শোষিত হওয়া ঠেকানোর চেষ্টা করবে ততদিন তারা নৈতিক দিক থেকে সবল দেশগুলোর চেয়ে ভালো অবস্থানে থাকবে। কিন্তু যে দেশ বা জাতি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, সে দেশ বা জাতি একবার স্বাধীনতা পেলে যে আচরণ শুরু করে সেটা কেবল অবাঞ্ছনীয় নয়, অবজ্ঞেয়। পোল্যান্ড দুশো বছরের পরাধীনতার গ্লানির পর ইউক্রেনবাসীদের ওপর একই গ্লানি চাপিয়ে দেয়। জাতীয়তাবাদ ব্যাপারটা এত বাজে যে, স্বাধীনতার জন্য লড়ছে এমন জাতিরও জাতীয়তাবাদ ভালো চোখে দেখা উচিত নয়। তাই বলে একটি আক্রমণকারী জাতিকে প্রতিরোধ করবে না, এমন কথা আমি বলছি না। আমি বলছি যে, তারা প্রতিরোধ অবশ্যই করবে, তবে আন্তর্জাতিক অনুভূতি থেকে, জাতীয় অনুভূতি থেকে নয়। সবল দেশ, দুর্বল দেশ নির্বিশেষে, জাতীয়তাবাদের অমঙ্গল দিকটার সম্পর্ক ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে। জাতীয়তাবাদ লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেয় শোষণ কিংবা শোষিত হওয়া ঠেকানো। তা হলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা পুঁজি বিলোপ করা গেলে শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদ যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা অনেকটা রহিত হবে, একেবারে দূর না হলেও।

চতুর্থত, আমরা এবার বিবেচনা করে দেখবো উপঢৌকন (endowments) শিক্ষার ওপর কি আর্থিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। উইল করার ক্ষমতা থাকলে এবং সরকারি নীতিমালার পরিপন্থী না হলে একজন ব্যক্তি ইচ্ছেমতো তার সম্পত্তির সদ্‌গতি করতে পারেন। এই কিছুকাল আগে বুদ্ধিবাদ বা যুক্তিবাদ প্রচারের জন্য সম্পত্তি উইল করে যাওয়া ইংল্যান্ডে নিষিদ্ধ ছিল; বলা হত যে একটা খ্রিস্টান দেশে যুক্তিবাদ প্রচার করা যায় না। এই নিষেধাজ্ঞা এখন উঠে গেছে। তবু প্রগতিশীল কাজের জন্য সম্পত্তি উইল করা অবৈধ না হলেও আশা করা হয় যে রক্ষণশীলতা শক্তিশালী করার জন্য উইল করা হোক। উইল হল

www.pathagar.com

একজন মৃতব্যক্তির শুভেচ্ছা, এবং হয়তো ঐ ব্যক্তি কয়েক শ বছর আগে মারা গেছেন। গির্জা, সুপ্রাচীন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক স্কুল কম-বেশি অতীতে উইল করা সম্পত্তির আয়ে চলে। এ ধরনের উইল করার ব্যাপারটা আমেরিকায় সম্প্রতি শুরু হয়েছে, উইল করছেন ধনিক শ্রেণীর বিখ্যাত লোকেরা; এই শ্রেণী দারুণ রক্ষণশীল এবং অশিক্ষিত, ফলে এরা শিক্ষা আধুনিকায়নে বাধা দিয়ে থাকেন। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা যদি প্রগতিশীল হন, অন্তত তাদের যদি প্রগতিশীল বলে সন্দেহ করা হয়, তবে তারা কোনো দাতা শিল্পপতির কাছ থেকে কোনো প্রকার উপঢৌকন পান না। আর স্থিতাবস্থা সমর্থন করলে অধ্যাপকরা উপঢৌকনে প্লাবিত হন।

শিক্ষায় ধর্মীয় দিকটা অধিকতর অতীতমুখী করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। লোকেরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পত্তি উইল করে যায় বলে ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা সংযোগ সৃষ্টি হয়। আর সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তির কুসংস্কার শতাব্দীর পর শতাব্দী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। সত্য যে, ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যাণ্ডে আইন করে উইল পরিবর্তন করা যায়। রিফর্মেশনের কালে মধ্য যুগের ধার্মিক ব্যক্তিদের উইল পরিবর্তন করে সম্পত্তি থেকে আয়ের টাকা অ্যাংলিক্যানিজম প্রচারের জন্য ব্যয় করা হয়। আমেরিকার শাসনতন্ত্রে কিন্তু উইল পরিবর্তনের আইন তৈরি নিষিদ্ধ। আপনি একটা মতবাদে বিশ্বাস করেন। মতবাদটা হল কেনটাকির লোকেরা Lost ten tribes-এর অন্তর্ভুক্ত। মতবাদটি প্রচারের জন্য আপনি সম্পত্তি উইল করে গেলেন। অতঃপর আমেরিকায় উক্ত উইল কোনো আইন দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে না। ইংল্যান্ডে উইল হেরফের করা যায়, তবে হেরফের করার ঘটনা কমই ঘটে। অ্যাংলিক্যান এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ ধনাঢ্য প্রতিষ্ঠান, এসব প্রতিষ্ঠানের আয় কেবল গোষ্ঠীর অনুসারি লোকদের জন্য ব্যয় করা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সুদূর অতীতের কোনো ব্যক্তির কুসংস্কার বা মতবাদের অনুসারী হওয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ কাজ করে। প্রতিটি মানসিক প্রগতির জন্য আর্থিক জরিমানা থাকে: কলেনসো আবিষ্কার করলেন যে খরগোশ জাবর কাটে না, সঙ্গে-সঙ্গে কলেনসোর চাকরিটা চলে গেল।

ধর্মীয় উপঢৌকনের ব্যবস্থা যদি না থাকত তা হলে সমাজে অনেক দ্রুত পরিবর্তন আসতো। তবে উপঢৌকন থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে কিন্তু পরিবর্তন আসে, মতবাদে আসে না। অ্যাংলিক্যান যাজকগণ যা-কিছু বিশ্বাস করতে বলেন, পেশাগত কারণেই বলেন, অনেক সময় বলেও থাকেন পেশাগত কারণে বলছেন, এজন্য তাদের কিন্তু কেউ খারাপ ভাবে না। খ্রিস্টান ধর্মের কোনো কোনো নীতির সময় সময় বিচিত্র ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। অধিকাংশ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মনে করেন, বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে যিশু খ্রিস্টের মত আক্ষরিক অর্থে মেনে নিতে হবে। আর অহিংসা, কছমকাটা থেকে বিরত থাকা, দরিদ্রকে ধনদান সম্পর্কিত উপদেশ ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করলে ক্ষতি হবে না। শুধু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা কেন, আমূল পাল্টে দিলেও ক্ষতি হবে না। কিন্তু যিশুখ্রিস্টের মতবাদের কোন কোন অংশ খ্রিস্টানদের কাছে গ্রহণযোগ্য, সেটা একটা জটিল প্রশ্ন। অতএব এখানেই থামা যাক।

চতুর্থত, ঐতিহ্য বা প্রথা নিয়ে কিছু কথা বলব। সাধারণ ঐতিহ্যের কথা আমি তুলছি না; আমরা বিবেচনা করে দেখব অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্ট ঐতিহ্য, তবে কারণটা এখন আর কার্যকর নয়। যৌন নৈতিকতা (স্বাভাবিক কারণেই খুব রক্ষণশীল) এখানে একটা উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে আসতে পারে। অতীতকালে, যখন জনসংখ্যা ছিল সীমিত, শিশু মৃত্যুর হার ছিল খুবই বেশি, কোনো দম্পতি অধিক সন্তানের জন্ম দিলে সেটা জনসেবা হিসেবে গণ্য হত। বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিশু শ্রম নিষিদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত শিশুরা ছিল

www.pathagar.com

পিতামাতার খুচরো আয়ের উৎস। জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং গর্ভপাতের বিরুদ্ধে যে অনুভূতি ছিল সেকালে, তার ছিল একটা যথার্থ অর্থনৈতিক পটভূমি, যা এখন নেই। তবু যে আজকের দিনেও এই অনুভূতিটা কাজ করে তার কারণ হল এটা ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের উৎপত্তি হয় অর্থনৈতিক কারণে। কারণ মহিলারা গর্ভবতী অবস্থায় এবং সন্তান কোলে থাকা অবস্থায় শিকার করতে পারত না। এই সে দিন পর্যন্তও মেয়েদের স্বাধীনভাবে রোজগারের সুযোগ ছিল না, ফলে তারা স্বামী বা কোনো পুরুষ আত্মীয়ের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হত। এজন্যই স্বাভাবিকভাবেই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার দাবি করে বসে স্ত্রীর সতীত্ব। আর সতীত্ব কার্যকর হত কঠিন নৈতিকতা এবং ধর্মীয় বিধিনিষেধ আরোপ করে। সত্যতার উষালগ্নে অসততার জন্য প্রদান করা হত মৃত্যুদণ্ড। বর্তমানে আইনানুগ দণ্ড লঘু করা হয়েছে, তবে নিউ ইয়র্ক স্টেটের মতো দূরাঞ্চলে শাস্তি উঠে গেছে। কিন্তু নৈতিক এবং ধর্মীয় তিরস্কার বন্ধ হয়ে যায়নি। অথচ প্রথানুগ এই নীতি, আমরা দেখেছি, তত্ত্বগত দিক থেকে না হলেও বাস্তবে নারী পুরুষের সাম্যনীতির সঙ্গে মেলে না। আবার যেখানে নারীরা স্বাধীনভাবে উপার্জন করে সেখানে তাদের সমানাধিকার দিতেই হবে। বিবাহিত মহিলাদের চাকরি লাভে নানা ভাবে বাধা প্রদান করা হয়। তবে অনন্তকাল এই বাধা টিকবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া মহিলাদের সামনে নানা পথ খুলে যাবে, ফলে তারা স্বাধীনভাবে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। তবে এতে তাদের হয়তো প্রথানুগ ও রক্ষণশীল অর্থে সতীত্ব থাকবে না। ফলে প্রথাগত নৈতিকতা অর্থনৈতিক কারণে ভেঙে পড়ার প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে চলেছে। সমরবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিম্ন জন্ম হার শিশুমঙ্গলের প্রতি রাষ্ট্রের আগ্রহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। কারণ কেউ যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অপঘাতে মৃত্যুবরণের মতো বয়সে পৌছার আগেই অক্কা পায় তা হলে সেটা হয় রাষ্ট্রের জন্য বিরাট অপচয়। যদি অর্থনৈতিক কারণগুলো যুক্ত হয়ে নারীর সতীত্ব হ্রাস করে এবং শিশু লালন–পালনে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় তা হলে পিতার গুরুত্ব কমে যাবে, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার থেকে আসা সকল আবেগ ও নৈতিক ধারণার আর কোনো মূল্য থাকবে না। বর্তমানে অভিভাবক শ্রেণী এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ছেলেদের সেক্স সম্পর্কে সেকেলে ধারণা প্রদান কল্যাণকর মনে করেন। অথচ এটা বর্তমান জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারে না। সেক্স ও পরিবার নিয়ে অনুভূতির যে রক্ষণশীলতা চলে, এটা তার উজ্জ্বল উদাহরণ। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই রক্ষণশীলতা আরো সবল, কারণ অধিকাংশ লোকের অভিমত হল কঠোর নৈতিকতার শিক্ষা দিলে তরুণদের কোনো ক্ষতি হবে না। তা হলে শিক্ষার লক্ষ্য হল সমাজের পরিবর্তিত প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা। অন্তত দ্রুত পরিবর্তন ঠেকানো। এতে কি দাঁড়ায়? প্রাপ্তবয়স্ক নর–নারী যৌনতা সম্পর্কে আতংক বোধ করে। অথচ যৌন ব্যাপারটা সহজ ভাবে নেওয়া স্বাস্থ্যের লক্ষণ। অতীতে অর্থনৈতিক কারণে যে নৈতিক মান তৈরি হয়েছে তা কেবল সেকালের জন্যই প্রযোজ্য। আজকের পরিবর্তিত অর্থনেতিক পরিস্থিতির জন্য নতুন নৈতিকতা একান্ত দরকার।

আমরা দেখেছি যে, যদিও অর্থনৈতিক কারণসমূহ ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষণশীল করার দিকে ঝুঁকে পড়ে কিন্তু বিপ্লবের যুগ পাড়ি দেওয়ার পর কম্যুনিজমের অধীনে শিক্ষাও কম রক্ষণশীল হবে না। অতঃপর শিক্ষাব্যবস্থা একান্তভাবে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। আর আমলারা যে পরিবর্তনের বড় একটা পক্ষপাতী নন তা সবার জানা। হয়তো তখন দ্রুত পরিবর্তনের প্রয়োজনও কমে আসবে। হয়তো শান্তিপূর্ণ

www.pathagar.com

পুনর্বিন্যাসের সময়কালটায় মানবতার অবস্থাও উন্নততর থাকবে। সে যাই হোক, প্রতিযোগিতার বিকল্প হিসেবে সহযোগিতা যদি শিক্ষার আদর্শ হয়, তা হলে সেটা সুনিশ্চিত নৈতিক অগ্রগতি বলে বিবেচিত হবে। আর সেটা সম্ভব হবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যাস করলে। শুধু এই একটি কারণেই আশা করা যায় যে কম্যুনিজম উন্নততর, তাজা নর-নারী তৈরি করতে পারবে। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য পশ্চিম জগতের পক্ষে এই কাজটি করা কোনোদিনই সম্ভব হবে না।

www.pathagar.com

প্রচারণা ও শিক্ষা

প্রচারণার সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে নিরপেক্ষ লোকদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজ দলে টানার প্রচেষ্টা। সুতরাং নির্যাতনের পদ্ধতি থেকে এটি ভিন্ন। এখানে বলপ্রয়োগের কথা ওঠে না। জ্ঞান প্রচারও লক্ষ্য নয়। দলীয় অনুভূতি জাগিয়ে তোলাই লক্ষ্য। জ্ঞানদান থেকে প্রচারণার পার্থক্য অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে; কিন্তু প্রচারেও যথাযথ তথ্য থাকতে পারে। তবে লোকদের নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করা অভিপ্রায় হিসেবে কাজ করে। আর লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কিছু প্রচার করা হয় না, বা বলা হয় না। প্রশংসা কিংবা নিন্দা, উভয়ই বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণবিরোধী এবং নিছক প্রচারণা ছাড়া কিছু নয়। অধিকাংশ লোকের মধ্যে ভালো-মন্দ উভয় গুণ রয়েছে। ফলে তারা যে কোনোটি গ্রহণ করতে পারে। অনুরূপভাবে কোনো জাতির ইতিহাস লেখা যেতে পারে বন্ধুভাবাপন্ন কিংবা শত্রুভাবাপন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

সকল প্রকার শিক্ষায় প্রচারের একটা ভূমিকা থাকে; কোনো বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষেই মনের খোশ না-খোশ অবস্থা প্রকাশ না-করে থাকা সম্ভব নয়। আর তরুণদের সামনে মনের কথা খুলে বললে সেটা প্রচারের পর্যায়ে চলে যায়। শিক্ষাবিদদের সামনে প্রচারের স্থান থাকবে কি-না সেটা প্রশ্ন নয়; তাদের ভাবা উচিত প্রচার কতটা থাকা উচিত, কীভাবে থাকা উচিত, কোন ধরনের প্রচার থাকা উচিত তাই নিয়ে। আরো ভাবা দরকার শিক্ষার একটা পর্যায়ে এসে বালক-বালিকাদের প্রচারের প্রভাব থেকে দূরে রাখা উচিত কি-না। এই কাজটি করতে হবে তাদের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে পৌঁছার উপায় শিখিয়ে।

রিফর্মেশনের পর থেকে শিক্ষায় প্রচারের মাত্রা কেবল বেড়েই চলেছে। জেসুইটরা প্রথম প্রচার পদ্ধতি নিখুঁত করেন। এরা শিক্ষার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে পাল্টা-রিফর্মেশন থেকে লব্ধ সুফল সংহত করেন। প্রটেস্টান্টরাও পিছিয়ে ছিলেন না; উদাহরণত, ইংল্যান্ডে স্প্যানিশ ইনকুইজিশন, স্মিথফিল্ডের অগ্নিকাণ্ড, বন্দুকের গোলা ষড়যন্ত্র, প্রভৃতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়। সপ্তদশ শতকের তুলনায় অষ্টাদশ শতক ছিল অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ এবং অনেকাংশে প্রচারণামুক্ত। এই অবস্থা ফরাসি বিপ্লব সূচনার সময় পর্যন্ত চলে।

অষ্টাদশ শতকে যুদ্ধ বাধার গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। তবে যুদ্ধের তীব্রতা খুব বেশি ছিল না। যুদ্ধরত দলসমূহ পরস্পরের শ্রদ্ধা হারাতেন না। তবে জ্যাকবিনিজম ইউরোপীয়দের মন কঠিন করে তোলে, এদিকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সময় ইংরেজরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে, আর জার্মানরা হয়ে পড়ে দারুণ দেশপ্রেমিক। সেই সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব কেবলি তীব্রতর হচ্ছে। আবার

www.pathagar.com

এদিকে, সাধারণ নর–নারীর জীবনে জাতীয়তাবাদ বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে বিভিন্ন জাতি, এমনকি একটি জাতির মধ্যেকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পরস্পর থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন এবং এই বিচ্ছিন্নতা কেবল এক একটি দলের আলাদা বিশ্বাসের জন্য নয়, তারা কী জানে এবং কী জানে না তা নিয়ে বিরোধ বাধে, প্রথিতযশা লোকদের সম্পর্কে ধারণা নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ও আশংকা ব্যাপারেও তারা একমত হতে পারে না।

আধুনিক বিশ্বে বিভেদ, বিচ্ছিন্নতার জন্য প্রচারণা প্রথমত প্রতিক্রিয়া, অতঃপর কারণ হিসেবে কাজ করে। রিফর্মেশনের প্রাক্‌কালে ইউরোপে কিছুটা একতা ছিল; বিরুদ্ধবাদীদের নির্যাতন করা হত, আর আধুনিক অর্থে প্রচারণার কোনো দরকার হত না। অপর পক্ষে Wars of Religion-এর সময় স্বীয় ধর্ম মতে দীক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করতো জয় কিংবা পরাজয়ের ওপর। বৈপ্লবিক যুদ্ধে ফ্রান্স যে জয়ী হয় তার জন্য শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছে জ্যাকোবিন প্রচারণা। প্রচারণাশক্তি দ্বারাই সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম পায়ের ওপর দাঁড়িয়েছে। আর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যে বিরাট আত্মত্যাগ স্বীকার করার দরকার হয়েছিল, লোকেরা আত্মত্যাগ করেছেও, তার জন্য ভূমিকা পালন করেছে দেশপ্রেমমূলক প্রচারণা।

সর্বজনীন শিক্ষা প্রচারণার সুযোগ বাড়িয়েছে ব্যাপক হারে। এখন সর্বত্র শিক্ষাই শুধু প্রচারমুখীন নয়, পড়তে জানা লোকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সংবাদপত্রগুলো হয়ে পড়েছে প্রভাবশালী প্রচারযন্ত্র। এজন্যই প্রথম মহাযুদ্ধ পূর্বেকার যে কোনো যুদ্ধের চেয়ে ছিল তীব্রতর। লোকেরা যদি কেবল শেখে, বিদ্যা অর্জন না করে, তা হলে তাদের নির্যাতনের গল্প বলে সহজে প্রভাবিত করা যায়। আগের যুগে অধিকাংশ লোকের কোনো বিদ্যাই ছিল না, কিংবা পরিমাণে ছিল খুব বেশি। অতএব তাদের সমস্যা ছিল কম। এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়, আজকের দিনে প্রচারণার যে গুরুত্ব, পূর্বের কোনো কালে তা ছিল না।

প্রচারণার প্রধান রূপ তিনটি; রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রচারণা, কোনো ধর্মমত কিংবা বিশ্বাসের পক্ষে প্রচারণা, জাতির পক্ষে প্রচারণা। প্রথমটির দায়িত্ব রাষ্ট্র প্রকাশ্যে গ্রহণ করতে পারে না, তবে ক্ষুদ্র দলের বিপক্ষে প্রচারণায় নামতে পারে, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় কম্যুনিস্ট পার্টির বিপক্ষে এই কাজটি করা হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রচারণাকার্য পরিচালনা করা হয় না। অবশ্য ধনীর সন্তানদের স্কুলের পরিবেশ রক্ষণশীল। এখানকার অধিকাংশ ছাত্র রক্ষণশীল হয়, ফলে দলীয় প্রচারণার খুব একটা দরকার করে না। স্কুলে কোনো বিশ্বাস কিংবা জাতির পক্ষে প্রচারণাকে বড়ো করে দেখা হয়। রোমান ক্যাথলিকরা চান যে তাদের সন্তানেরা রোমান ক্যাথলিক স্কুলে শিক্ষা লাভ করুক। প্রটেস্টান্টরা চান মৃদু ধর্মীয় আবহের মধ্যে শিক্ষা লাভ। যেখানে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস পাত্তা পায়। প্রত্যেকটি বড়ো জাতি চায় স্কুলগুলোতে কাজ করুক জাতীয়তাবাদী প্রেরণা। সাধারণত নাগরিকের জন্য জাতীয়তাবাদী শিক্ষাকেই বড়ো করে দেখা হয়। কম্যুনিজমের অধীনে জাতীয়তাবাদী শিক্ষা প্রদান করা হয় না, কিন্তু স্কুলগুলোতে কম্যুনিজমের পক্ষে জোরদার প্রচারণা চালানো হয়। আরো বলা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন হল কম্যুনিজমের প্রধান প্রতিভূ। এতে ছেলেদের মনের ওপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা পুঁজিবাদী দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা যে জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় তার থেকে খুব ভিন্ন মনে করা যায় না।

ব্যর্থ হওয়ার বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে শিক্ষায় প্রচারণা সহজেই সফল হয়। অধিকাংশ লোক পিতামাতার ধর্মই নিজেদের ধর্ম হিসেবে আজীবন পালন করে। দেশপ্রেমের

www.pathagar.com

শিক্ষা গ্রহণ করে বিদ্যালয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশাগত ছেলেরা দেশপ্রেমিক আমেরিকান হয় এবং যথারীতি তাদের মূল দেশকে ঘৃণা করতে শেখে। এবং এই শিক্ষাটা বিদ্যালয়ে লাভ করে। একটা কারণে জাতীয়তাবাদী প্রচারণা সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়। কারণটা হল যুদ্ধে পরাজয়। ১৯১৭ সালে অধিকাংশ রুশবাসীর দেশপ্রেম বলতে কিছু ছিল না। জার্মানরা ভার্সাই সন্ধির কারণে আন্তর্জাতিকতা ভুলে যায়। নিয়ম অনুসারে প্রচারণা ব্যর্থ হবার কথা নয়। তবে জনগণকে যদি এমন কিছু বিশ্বাস করতে বলা হয়, যা তাদের পক্ষে একেবারেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয় এবং উক্ত ব্যাপার সম্পর্কে ইতোমধ্যেই বিরূপ হয়ে আছে, তা হলে প্রচারণায় কোনো কাজ হয় না। দেখা গেছে যে দক্ষিণাঞ্চলের আইরিশদের বৃটিশ দেশপ্রেমিক এবং প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী করা কোনো মতেই সম্ভব হয় না। প্রচারণা সফল হতে হলে এমন কিছু প্রচার করতে হবে যা মানুষের মনের কাছে জোর আবেদন রাখবে। এই উপায়ে গোষ্ঠী চেতনার জোর খুব বাড়ানো যায়। যেখানে ঘৃণা ইতোমধ্যেই কাজ করতে শুরু করেছে, সেখানে ঘৃণার মাত্রা চড়িয়ে দেওয়া খুবই সহজ। যেখানে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুভূতি পেছনে উঁৎ পেতে আছে, সেখানে উক্ত কুসংস্কারের প্রাধান্য সৃষ্টি করা কোনো কঠিন কাজ নয়। যেখানে ক্ষমতা-লিপ্সা সুপ্ত অবস্থায়, প্রচারণা সেখানে লিপ্সাটা সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলতে পারে। তবে প্রচারণারও সীমাবদ্ধতা রয়েছে; তা সে মঙ্গলের জন্য হোক কিংবা অমঙ্গলের জন্য। অন্তত অবস্থা এখন পর্যন্ত এ রকমই, হয়তো গণমনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণতা সাধনের পর বিভিন্ন সরকার নাগরিকদের ছাইভস্মে বিশ্বাস করানোর জন্য অসীম ক্ষমতা লাভ করবে।

প্রচারণা সম্পর্কান্বিত হতে পারে মূল্যবোধের সঙ্গে, কিছু সৎ প্রস্তাবের সঙ্গে কিংবা বাস্তব কিছু ঘটনার সঙ্গে। এই তিনটি বিষয় নিয়ে কিছুটা ভিন্ন ধরনের আলোচনার দরকার করে।

মৌলিক মূল্যবোধ নিয়ে কোনো প্রকার বিতর্ক চলে না। যদি কোনো ব্যক্তি মনে করেন দীন-দরিদ্র অবস্থা কাম্য, সবার সব সময় দাঁতে ব্যথা থাকা উচিত, তা হলে তার সঙ্গে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করতে পারি, আবার তিনি যখন নিজের দাঁতের ব্যথা নিয়ে দন্তচিকিৎসকের কাছে যাবেন তখন তার দিকে তাকিয়ে আমরা হয়তো মজা করে হাসব, কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে পারবো না যে তার কথাগুলো ভুল। তবে তিনি যদি বলতেন লোহার ওজন পানির চেয়ে বেশি তা হলে আমাদের পক্ষে বলা কঠিন হত না যে লোকটা ভুল বলেছেন। যদি কোনো প্রফেট বলেন, জীবনে শুধু তাদেরই সুখী হওয়া উচিত যাদের নাম Z অক্ষর দিয়ে শুরু হয়, তা হলে তিনি Zachary, Zedekiah এবং Zebedee-দের কাছ থেকে বিপুল সমর্থন লাভ করবেন, কিন্তু Jhon এবং George-এর দল তাকে পাত্তাই দেবেন না। এটা অবশ্য হবে প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত প্রফেটের সিদ্ধান্ত অস্বীকার, কিন্তু যুক্তির কষ্টিপাথরে উক্ত সিদ্ধান্ত যেমন টিকবে, তেমনি আবার টিকবে না। চূড়ান্ত মূল্যবোধ সম্পর্কে বলা যায়, লোকেরা সম্মত হতে পারে, অসম্মত হতে পারে, তারা যেমন বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে, তেমনি পারে ভোটযুদ্ধে লিপ্ত হতে, কিন্তু যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার তাদের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হবে না।

বাস্তব জীবনে চূড়ান্ত মূল্যবোধ সংক্রান্ত প্রশ্ন কোনোদিনই বিশুদ্ধ যুক্তির আকারে উত্থাপিত হয় না। কারণ মানুষ কেবল ব্যস্ত কী 'করতে' হবে তাই নিয়ে। একটা কাজ করা উচিত হবে কিনা তা নির্ভর করে দুটি বিবেচনার ওপর: প্রথমত, এর ফলশ্রুতি কি হবে; দ্বিতীয়ত, এই ফলশ্রুতি কি মঙ্গলজনক হবে, অথবা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অন্য কিছু করলে যে

www.pathagar.com

ফল পাওয়া যেত তার চেয়ে এটা ভালো হবে কি না। এই দুটি প্রশ্নের মধ্যে প্রথমটি বিজ্ঞানমূলক, নৈতিক নয়; অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সমস্যার মতো এটিও যৌক্তিকভাবে বিচার করা চলে। নির্দিষ্ট একটি কাজ করা উচিত কি–না তা নিয়ে যখন বিতর্ক হয় তখন আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের মুখোমুখি হই। এখানে আমরা লক্ষ করি যে যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করার তত্ত্বগত কোনো সম্ভাবনা নেই।

রাজনৈতিক বাদানুবাদে দু' ধরনের মতামতের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়: একটা নাম মাত্র, অপরটা বাস্তব। কেউ নিছক প্রবৃত্তির নির্দেশে চললে বলবে যে তার ব্যক্তিগত সুখই সবচেয়ে বড় কথা, অতঃপর স্বীয় পরিবারের জন্য সুখ দরকার, তার পর স্বজাতি, তার দল, তার স্বধর্মাবলম্বীর জন্য সুখ আসতে পারে যদি সে সুখ তার নিজের সুখের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না করে। যদি তিনি একচ্ছত্র সম্রাট হন, তা হলে তিনি এই অভিমত গোটা জীবন পোষণ করবেন। তা না–হলে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটাই সম্ভব) তিনি মিত্রবর্গের সহায়তা গ্রহণ করবেন, আর মিত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি এমন উদ্দেশ্য সামনে রাখবেন যা সম্ভাব্য মিত্রদেরও স্বার্থের অনুকূল মনে হবে। নিয়ম অনুসারে উক্ত উদ্দেশ্যের আংশিক খাঁটি, আংশিক মেকি। মেকি অংশের কতোকটা নির্ভর করতে হবে আবেগ জানানোর ওপর, কতোকটা নির্ভর করতে হবে ভ্রমাত্মক যুক্তির ওপর। ভ্রমাত্মক যুক্তির কিন্তু বিরাট ভূমিকা থাকে, অনেক আধুনিক অ–যুক্তিবাদী সেটা উপলব্ধি করতে পারেন বলে মনে হয় না। উদাহরণত, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ১৯৩১ সালের শরৎকাল পর্যন্ত বৃটিশ শিল্পকারখানা বৃটিশ ব্যাংকিং–এর কাছে স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দেয়, কারণ অধিকাংশ বৃটিশ শিল্পপতি বৃটিশ ব্যাংকারদের ভ্রমাত্মক যুক্তির কাছে হার মানে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থ আন্তরিকভাবেই তুলে ধরে, কিন্তু তারা কার্যত দাবি করে যে কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থই তারা উপেক্ষা করে না। স্বপক্ষে এক ধরনের যুক্তি দেখানো হয়। কোনো প্রকার যুক্তি দেখাতে ব্যর্থ হলে সস্তা আবেগ জাগিয়ে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। ঘটনা যাই হোক, এখানে কিন্তু চূড়ান্ত মূল্যবোধ নিয়ে কোনো বাদানুবাদের সৃষ্টি হয় না। কারণ রাজনৈতিক দলগুলো সব সময় ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে চায়। প্রতিটি রাজনৈতিক দল দাবি করে যে সমগ্র জনগোষ্ঠীর সর্বাধিক মঙ্গল তাদের লক্ষ্য। আর ইহজগতে সেটা সম্ভব না হলে পর জগতের জন্য তোলা থাকবে। সুতরাং চূড়ান্ত নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্নটা আমরা উপেক্ষা করে চলতে পারি, কিন্তু মূল্যবোধের আবেগগত দিকের যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

এতক্ষণ যা কিছু বলা হল তাতে এই দাঁড়ায়, রাজনৈতিক বাদানুবাদের একটা এলাকা নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যায়। যখন একটা গোষ্ঠী দাবি করে তাদের স্বার্থের সঙ্গে অপর একটি গোষ্ঠীর স্বার্থ জড়িত তখন তাদের দাবি তত্ত্বগতভাবে কিংবা বাস্তবে প্রমাণিত কিংবা অপ্রমাণিত করা যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহ মনে করে পশ্চাৎপদ জাতিসমূহ (অর্থাৎ যাদের শক্তিশালী সেনাবাহিনী নেই) স্বাধীনতার ভেতর নয়, পরাধীন অবস্থায় বেশি সুখী থাকে। মেয়েদের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা পাওয়ার আগ পর্যন্ত পুরুষশ্রেণী দাবি করেছে যে, পুরুষ–প্রধান সরকারের অধীনে তারা বেশি সুখে থাকে এবং নারী–পুরুষে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে অবস্থা খারাপের দিকে যাবে। শিল্পপতিরা দাবি করেন যে তাদের বিজ্ঞ পরিচালনার অধীনে মজুর–শ্রেণী অনেক বেশি সমৃদ্ধি অর্জন করবে, এবং ব্যবস্থাপনা পাবলিকের হাতে গেলে তাদের ক্ষতি হবে। এ ধরনের যুক্তি নিশ্চয় নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের মন জয় করে। এক্ষেত্রে তাদের যেহেতু প্রকারান্তরে কোনো স্বার্থই থাকে না তাই পক্ষের যুক্তিগুলো ভ্রমাত্মক হলে কুযুক্তির জাল বিস্তার করে ব্যাপারটা তুলে ধরা হয়। এমনকি

www.pathagar.com

প্রাধান্য বিস্তারকারী গোষ্ঠীও আত্মবিশ্বাস হারাবে যদি তাদের বিশ্বাসের ভিত নড়ানো যায়। ১৭৮৯ সালে অনেক ফরাসি অভিজাত ব্যক্তি, ১৯১৭ সালে অনেক রুশ অভিজাত ব্যক্তি সন্দেহ করতেন, তারা যে সুবিধাদি ভোগ করছেন তা ন্যায়সংগত কিনা। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এই সন্দেহটা না থাকলে ফরাসি ও রুশ বিপ্লব সফল হওয়া কঠিনতর হত।

মূল্যবোধের যুক্তিবাদী দিক সম্পর্কে এটুকুই বলা যায়। বাস্তবে, নৈতিক প্রচারণার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা আবেগ প্রধান, যুক্তিবাদী নয়। যখন আমরা দেখি যে শেষ পর্যন্ত সকল মূল্য বিচারের ভিত্তি আবেগ, তখন মানতেই হয় যে নৈতিক প্রচারণা আবেগ প্রধান হবেই। তথাপি প্রচারণাকার্যের জন্য বেছে নেওয়া বিভিন্ন আবেগের মধ্যেকার তফাৎটা বুঝতে হবে, আরো বুঝতে হবে কী ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে এই আবেগটা উসকে দেওয়া হয়।

আবেগগত প্রচারণা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দু'রকমই হতে পারে। Uncle Tom's Cabin প্রত্যক্ষ প্রচারণা; Ye Mariners of Englandও তাই। প্রত্যক্ষ প্রচারণায় লক্ষ্যটা এমন ভাষায় বর্ণনা করা হয় যেন তা কাঙ্ক্ষিত আবেগের সৃষ্টি করে। পরোক্ষ প্রচারণায় আবেগ জাগানো হয়, তবে আবেগটা সরাসরি লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে সৃষ্টি করা হয় যেন লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। এই কাজটিই গির্জার সংগীত করে থাকে। কোনো সামাজিক সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত সকল সংগীতই এই দায়িত্বটা পালন করে। উচ্চবিত্ত ইংরেজদের পাবলিক স্কুলের প্রতি যে মমত্ববোধ, সেটা একটা জটিল অনুভূতি। কারণ স্কুলে ছাত্ররা বিচিত্র সামাজিক আবেগ অনুভব করে। এর অনুভূতি খুবই শক্তিশালী, মানুষের গোটা জীবনে এই অনুভূতি বেঁচে থাকে, এর রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশি। রোমান ক্যাথলিকদের গির্জার প্রতি যে অনুভূতি তার জন্য বিভিন্ন আবেগ কাজ করে; নৈশ ভোজনোৎসব, গুড ফ্রাইডের পবিত্রতা, ঈস্টারের নির্মল আনন্দ, ধুপের ধোঁয়া, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এবং রহস্যময়তা। যখন কৈশোরের কিংবা বয়ঃসন্ধিকালের এই ধরনের আবেগ কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হয় তখন তা এমন অনুভূতির প্লাবন সৃষ্টি করে যে সকল যুক্তিবাদী বিশ্বাস ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ক্যাথলিক গির্জা এই ধরনের প্রচারণার কায়দাটা খুব ভালো বোঝে। দু'হাজার বছরে তারা এই কৌশলকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। একই কাজ করে থাকে জাতীয় রাষ্ট্রগুলো, তবে অতো নিখুঁতভাবে পারে না। এদের কায়দা হল সমরসংগীত এবং সামরিক কুচকাওয়াজ। আমি শৈশবে দেখেছি, বৃটিশ সৈন্যরা ঐতিহ্যবাহী রক্তবর্ণ কোট পড়ে কুচকাওয়াজ করছে। এই দৃশ্য থেকে আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করেছি। এ ধরনের আনন্দ একজনকে সমরবাদে বিশ্বাসী করে তোলে।

আবেগগত প্রচারণার অনেক বিপদ রয়েছে। প্রথমত, এটা মন্দ কাজে যেমন ব্যবহার করা হয়, ভালো কাজেও তেমনি ব্যবহার করা হয়। ভালো কাজে অপেক্ষাকৃত সহজে ব্যবহার করা হয়। বাস্তবিকই, যুক্তিগ্রাহ্য আচরণ করতে গেলে যেহেতু আবেগ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তাই যে ধরনের প্রচারণায় সহজ ও অসংস্কৃত আবেগ উসকানি পায় তা স্বাভাবিক আচরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। যুদ্ধ সমাসন্ন হলে মানুষ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে কারণ এবার বর্বরোচিত আবেগ নিয়ন্ত্রণ থেকে ছাড়া পাবে; তারা যে মজা উপভোগ করে তা ধীরোদাত্ত ব্যক্তি প্রেমে পড়লে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তার চেয়ে ভিন্ন নয়। ধর্ম ও দেশপ্রেম, উভয়ই আদি আবেগের কাছে আবেদন রাখে। আর এ ধরনের আবেগ সভ্যতার জন্য বিপজ্জনক। লোক–সাধারণের যদি ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি বাস করতে হয় তবে তাদের সযত্নে সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, আর অপরের প্রতি সহজাত শত্রুতা বোধ

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। আজকের সভ্য দেশগুলোর বিরাট জনসংখ্যা রক্ষণাবেক্ষণ দুরূহ হয়ে পড়বে যদি অসভ্য আবেগগুলোকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। এতে সভ্য লোকেরা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে, আদিম জীবন যাপনের জন্য তৃষ্ণা বোধ করবে। আবেগপ্রধান প্রচারবাদীরা এই তৃষ্ণার কাছেই আবেদন রাখেন। যুদ্ধ ও ধর্ম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আকুলতা।

আবেগ প্রধান প্রচারণার আরো একটি বিপদ হলো, এতে মনের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। সচেতন মন যুক্তিশীল হতে পারে, কিন্তু সচেতনতার একটু নিচেই ছেলেবেলার অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে যায়। নির্জনে অনেক লোকই আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং মুক্তবুদ্ধির পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু যুদ্ধ ও মৃত্যুর মতো বিপদ দেখা দিলেই তারা দেশপ্রেমিক ও ধর্মধ্বজ হয়ে পড়ে। এর কারণ অংশত ছেলেবেলার প্রচারণা; বড় আকারে এটা আতংকিত অবস্থার স্বাভাবিক ফল। কিন্তু প্রচারণা স্বাভাবিক ভয়টাকে দেশপ্রেম এবং ঈশ্বরপ্রেমের ছদ্মবেশ ধারণে সহায়তা করে।

ধর্মীয় মতবাদের মতো ক্ষেত্রে প্রচারণা প্রধানত আবেগের আশ্রয় গ্রহণ করে। উদাহরণত, ক্যাথলিকরা যে ধরনের আবেগ প্রত্যাশা করে তার সঙ্গে ক্যাথলিক বিশ্বাসের সম্পর্ক রয়েছে। নচেৎ সে যেন কিছু অধিবিদ্যক উপাদান ছাড়া অসুখী বোধ করে। কোনো ধর্মমতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তত্ত্বগতভাবে বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী উপায় কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু সম্ভব করে তুলতে হলে অনন্যসাধারণ যুক্তিবাদী লোকের দরকার হবে। সাধারণভাবে, বিরাট সংখ্যক নরনারী যখন আজীবন চর্চিত ধর্মমত পরিত্যাগ করে, তখন তার পেছনে অর্থনৈতিক মতলব কাজ করে, অবশ্য এটা সব সময় সচেতনভাবে ঘটে না। রিফর্মেশন কিছুতেই সফল হত না যদি গির্জাগুলোর বিরাট ভূ-সম্পত্তি না থাকতো এবং রোম কর্তৃক প্রভূত উপঢৌকন আদায় করা না-হত। কন্টিনেন্টের সমাজতন্ত্রীরা প্রধানত খ্রিস্টধর্ম বিরোধী, তারা অর্থনৈতিক যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে, খ্রিস্টধর্ম সব সময়ই ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। কোনো ধর্মমত যুক্তি দ্বারা ঠেকানো গেছে এমন ঘটনা বিরল; এক্ষেত্রে ফরাসি অষ্টাদশ শতকের বুদ্ধিবাদ হয়তো বিরাট দৃষ্টান্ত। তবু সাধারণের বিশ্বাস নিরূপণের জন্য যুক্তির বৃহত্তর ভূমিকা পালন বাঞ্ছনীয়। বিশ্বাস না থাকার জন্যও যুক্তির ভূমিকা জরুরি। যে প্রচারণা প্রশংসা বা নিন্দা, বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাসের মতো আবেগের সঙ্গে জড়িত তা বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

যদিও আশা করা যায় না যে, বিভিন্ন সরকার কিছু কিছু অপ্রিয় প্রশ্ন ব্যাপারে তরুণদের উল্টো দিক থেকে বোঝানোর সুবিধা গ্রহণ করবে, কিন্তু করলে যে খুব ভালো হবে এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষকদের কাছে যদি প্রত্যাশা করা হয় যে তারা বিতর্কিত ব্যাপারে অভিমত দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন, তা হলে তাদের কাছে প্রকারান্তরে প্রত্যাশা করা হয় যে তারা হবেন স্থূল বুদ্ধি এবং স্বীয় ব্যক্তিত্বের অর্ধেকটা প্রকাশ করবেন। সত্য যে, অনেক শিক্ষকের মধ্যে দলীয় অনুভূতি কাজ করে না, কিন্তু তারা কখনো ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন না, নিজেরা ভালো শিক্ষক হিসেবে সুনাম কুড়াতে ব্যর্থ হন। এটাও কাম্য নয় যে শিক্ষা সমকালীন সকল ঘটনাবলীর নিয়ন্তা প্রশ্নাবলী কৃত্রিমভাবে এড়িয়ে চলবে। তরুণদের উৎসাহিত করতে হবে তারা যেন একটা প্রশ্নের সব দিক সম্পর্কে নিজেদের মতো করে বিবেচনা করে। এক সোমবার সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত, অপর সোমবার উইনস্টন চার্চিল কম্যুনিজম সম্পর্কে বেতার বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারেন। স্কুলের ছেলেমেয়েদের উক্ত বিতর্ক শুনতে বাধ্য করা যেতে পারে। আর মাস তিনেক বিতর্কের পর প্রতিটি স্কুলে এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে ভোট গ্রহণ করা উচিত। মঙ্গলবার ভারত বিষয়ে গান্ধী এবং রাজদূতের (viceroy) মধ্যে বিতর্ক হতে পারে; বুধবার খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে স্টালিন এবং ক্যান্টারবারির আর্চবিশপের মধ্যে বিতর্কের আয়োজন করা যায়। গণতন্ত্রে অংশ গ্রহণের জন্য এটিই হবে বাস্তব প্রস্তুতি, একতরফা ঘোষণা থেকে প্রকৃত সত্য বের করে আনার দুরূহ কায়দাও এতে রপ্ত করা যাবে। প্রচারণা মাত্রেই ক্ষতিকর নয়, একতরফা প্রচারণা অবাঞ্ছনীয়। প্রচারণা সম্পর্কে বিচারপন্থী হওয়া, আর আমেরিকায় যাকে বলে 'বিক্রয় প্রতিরোধ', তার পক্ষপাতী হওয়া, একান্ত কাম্য, আর এটা প্রচারণা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অর্জন করা যাবে না, হাম-বসন্ত থেকে দূরত্ব বজায় রেখে যেমন রক্ষা পাওয়া যায় না। প্রচারণার অভিজ্ঞতা লাভ করে, প্রচারণা যে মানুষকে বিপথগামী করে তা আবিষ্কার করেই শুধু এটা অর্জন করা যায়। এই লক্ষ্য সামনে রেখে প্রতিটি স্কুলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রচারবাদী গোষ্ঠী পুষতে হবে। বেতার সম্প্রচার এদের সাহায্য করতে পারে।

আবার এটা স্বীকার করতে হবে যে সামাজিক সংহতির জন্য কিছুটা নির্জলা প্রচারণার দরকার রয়েছে। যদিও অনেক সময় আইন অগ্রাহ্য করার দরকার হতে পারে, তবে আমাদের আসল দায়িত্ব কিন্তু আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। যুদ্ধ এড়াতে হলে বিবাদ মীমাংসার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন অত্যাবশ্যক, এবং সবার উক্ত সংস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। শান্তিবাদীরা তর্ক করে বলতে পারেন যে, প্রচারণা কোনো ক্ষতি করে না; ক্ষতিকর হল বিরুদ্ধ প্রচারণা; যদি প্রতিটি জাতি স্বীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে শিক্ষা না দিয়ে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়, তা হলে বিভিন্ন জাতের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কোনো কারণ ঘটবে না; যদি গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক শিক্ষা হয় কম্যুনিস্টপন্থী কিংবা পুঁজিবাদী, তা হলে সোভিয়েৎ সরকারের সঙ্গে পশ্চিম জগতের সরকারসমূহের বিরোধের চির অবসান ঘটবে। শান্তিবাদীরা হয়তো এ ধরনের যুক্তিই দেখাবেন। কিন্তু এ রকম পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিশেষ আপত্তি উঠবে। জগতের সকল প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে যদি কোনো বিতর্কিত বিষয়ে শুধুমাত্র একটি মতবাদই চলতে দেওয়া হয়। আর কোনো বিষয়ে বিতর্ক করার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হলে জগৎ থেকে বিচারবোধ বিলুপ্ত হবে। এজন্যই প্রচারণা হতে হবে বৈচিত্রপূর্ণ, প্রগতির স্বার্থেও, নানা জিনিশ বোঝার শিক্ষা গ্রহণের স্বার্থেও। যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে আপত্তির এটা একটা অংশ।

অপর্যাপ্ত তথ্য থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে শেখানো ব্যাপারে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাজটাকে, একই সঙ্গে, অবহেলাও করে। আমি একজন ন্যায়শাস্ত্রী, ফলে আমি বুঝি, কি একটা বাজে কথা এখানে বললাম। তথাপি, বাস্তবিক জীবনে সফলতা নির্ভর করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার ওপর। সফল সমরনায়ক জানেন, তার বিরুদ্ধ পক্ষের সমরনায়কের মনের কথা; সকল সংগঠক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার নিয়েই উপযুক্ত কাজের লোক বাছাই করে নিতে পারেন। কৃতী বিজ্ঞানীও কিন্তু আগে অনুমান করেন, পরবর্তীকালে পরীক্ষা করে দেখেন। রাজনীতিতে কখনো যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য বা উপাত্ত মেলে না, তবু যুক্তিশীল ও সুচতুর রাজনীতিকরা অপর্যাপ্ত উপাত্ত থেকে বিচক্ষণ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন। এ জন্য দরকার বৈজ্ঞানিক পক্ষপাতহীন মন এবং কল্পনাপ্রধান চিন্তাশক্তি। তবে আরো একটা জিনিসের দরকার, যাকে অস্পষ্টভাবে বলা হয় 'বিচারবোধ'। অভিজ্ঞতার ভেতর এই গুণ যে কোনো দিকে উন্নত হতে পারে। শিক্ষার একটি স্তরে তরুণদের রাজনৈতিক বিচার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাদের বক্তৃতা শুনতে হবে, অবশ্য এটা জেনে যে বাগ্মিতা সচরাচর বিপথগামী করে থাকে। অতীতের

www.pathagar.com

ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাসম্বলিত দলীয় কাগজপত্র তাদের পড়তে হবে এবং তাদের অনুমান করে নিতে হবে অতীতে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছে। এ সবই প্রচারণার বিপরীত তত্ত্ব; আর এই কৌশল অবলম্বন করেই কেবল প্রচারণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

আমি সচেতন যে, এই সব বলতে গিয়ে আমি নীরবে একটা বিতর্কিত বিষয়ে এক পক্ষে চলে গেছি। এবং বিতর্কটা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। আমি বলেছি যে কোনো অভিমত কেবল কল্যাণকর কিংবা ক্ষতিকর নয়, একটা অভিমত সত্য কিংবা মিথ্যাও। আমি বলেছি যে, নিয়ম অনুসারে, যেখানে বাস্তব ঘটনা নিয়ে কথা, সেখানে একটা অভিমত কতোটা কল্যাণকর তা জানার চেয়ে, সত্য কিনা তা জানা সহজতর। পরিশেষে, আমি বলেছি যে, সাধারণ নিয়ম অনুসারে, মিথ্যার চেয়ে সত্যে বিশ্বাস স্থাপন অনেক বেশি কল্যাণকর। আমার এই ধারণাগুলোর বিরুদ্ধে জোরালো আপত্তি উঠতে পারে, প্রয়োগবাদী এবং কমুনিস্টরা আপত্তি উত্থাপন করেও থাকেন। অতএব এবার ব্যাপারটা একটু সযত্নে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

বলা হয়ে থাকে যে সিজার ইডিস অব মার্চে (Ides of March) নিহত হন। এর পক্ষে সাক্ষী-প্রমাণ আমি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখি নি, কিন্তু এ সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য পুস্তকের বিবৃতি পড়েছি, ফলে এটা আমি বিশ্বাস করি। ছেলেবেলায় এটা বিশ্বাস করা হয়তো লাভজনকও, কারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে এটা বিশ্বাস করতেই হবে। কিন্তু পরীক্ষা পর্ব একবার সাঙ্গ হলে এই বিশ্বাসের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। দ্বিতীয়ত, 'সিজার মার্চ মাসের পনেরো তারিখে নিহত হন', এই ঘোষণার সত্যতা যাচাই অনেক সহজ। কিন্তু এটি জানার প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় সহজ নয়। তবে পরীক্ষার্থীদের কাছে নিশ্চয় জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তৃতীয় দফায় আমি যা বলেছি এখানে কি তার উল্টো কিছু বলা হলো? তৃতীয় দফায় বলা হয়েছে মিথ্যা জানার চেয়ে সত্য জানা ভালো। উপযোগিতা থাকলেই শুধু এ কথা সত্য মনে করা চলবে। অধিকাংশ আপ্তবাক্য বিশ্বাস করেও লাভ হয় না, অবিশ্বাস করেও লাভ হয় না। কল্পনা করা যাক, নামতার সংখ্যা খুব বাড়িয়ে দেওয়া হলো, এতে থাকবে অসংখ্য প্রতিজ্ঞা, কিন্তু বাস্তবে মাত্র গুটিকয় প্রতিজ্ঞা কাজে লাগবে। এর বাইরেও দু'একটি প্রতিজ্ঞা কাজে লাগতে পারে, তবে প্রতিজ্ঞাগুলো সঠিক হতে হবে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না, তারা শুধু দেখেন যে, ছাত্ররা সঠিকভাবে অঙ্ক কষতে শিখেছে কি-না।

পাটিগণিতের ব্যাপারটা যাই হোক কম্যুনিস্টরা মেনে নেবেন, কিন্তু বিতর্কিত অভিমত নিয়ে কথা হলে কম্যুনিস্টরা বলবেন যে দৃষ্টিভঙ্গি দু'রকমের হয়ে থাকে, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গি। আর সর্বহারা বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক অবশ্যই সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে। উদাহরণস্বরূপ অমরত্বের প্রশ্নটা ধরা যেতে পারে। কম্যুনিস্টরা বলবেন, এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে গিয়ে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক নিয়ে ভাবলে চলবে না, এ বিষয়ে কী-কী গূঢ় সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে তা বিচার করলেও চলবে না, সাক্ষ্য-প্রমাণ অপর্যাপ্ত বলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুলতবি রাখলেও চলবে না, এখানে শুধু দেখতে হবে ইহজীবনের পর যে স্বর্গের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা কেবল সর্বহারাদের ঠেকানোর জন্য। অর্থাৎ মজুর শ্রেণী যেন ইহজগতের নিম্ন মজুরি মেনে নেয়, এটা তাদের বিধিলিপি। স্বর্গে এমনটা হবে না। এইভাবে দেখানো হয় যে অমরত্ব মতবাদ পুঁজিবাদীদের হাতের হাতিয়ার মাত্র। আর আত্মার অবিনশ্বরতা অস্বীকার কম্যুনিস্টদের হাতের হাতিয়ার। এখানে সত্য কিংবা মিথ্যার প্রশ্ন ওঠে না; কেউ স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করতে পারেন একটা বুলেট সত্য না মিথ্যা। অথবা বুলেট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা এই যে, বুলেটটা কোন বাহিনীর কাজে লাগছে? একটা অভিমত সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা চলে।

www.pathagar.com

এই দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানশক্তিকে উপেক্ষা করে। বিজ্ঞানের আদর্শ এই যে, সত্যের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছা সম্ভব, যেখানে সম্ভব নয় সেখানে সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে মুলতবি রাখা যুক্তিশীলতার পরিচায়ক। উপরন্তু কম্যুনিস্টরা কোনো সময় সংশয়মূলক অবস্থানে থাকেন না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে প্রকৃতই সত্য গণ্য করা হয়, এখানে সর্বহারার কি বিশ্বাস করা লাভজনক তা দেখা হয় না। আবার বলা হয় অমুক অমুক বিশ্বাস সর্বহারার জন্য শুধু লাভজনক নয়, ও-সব প্রকৃত সত্যও। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কম্যুনিস্টদের প্রয়োগবাদ শিথিল-উদ্যমের সগোত্র; এতে কেবল অধৈর্য প্রকাশ করা হয়।

আমি উপসংহারে বলব যে, কিছু-কিছু সত্য রয়েছে, যেগুলোর সত্যতা অনেকটা যাচাই করা সম্ভব। এবং এটা প্রয়োজনে লাগে। কিন্তু অসত্যে বিশ্বাস কোনোদিন কাজে লাগে না। উপসংহারে আরো বলব যে, ছাত্রদের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো শেখা শিক্ষার অন্যতম দায়িত্ব। এ কাজে ব্যর্থ হলে দলীয় মনোভাব তীব্র হবে, দেখা দেবে ধ্বংসাত্মক দ্বন্দ্ব, বিজ্ঞানের প্রগতি একেবারে থেমে যাবে। রাষ্ট্রনীতিকরা যখন শিক্ষাকে রাজনৈতিক প্রচারণার অঙ্গ মনে করেন তখন উপরের কথা কটি স্মরণ করলে দশের মঙ্গল হবে।

www.pathagar.com

স্বকীয় ব্যক্তিতা ও নাগরিকতার মধ্যে সমন্বয়

আমাদের প্রথম অধ্যায়ে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল: ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সামাজিক সাযুজ্য সমন্বিত হতে পারে কি–না? এই বিষয়টা বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে রাজনীতি এবং অর্থনীতি শিক্ষা ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে। আর এর অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট বালক–বালিকাদের জন্য ক্ষতিকর। ব্যক্তির ওপর রাজনীতি এবং অর্থনীতির প্রভাব ক্ষতিকর হওয়া কি আবশ্যিক? নাকি এটা একালের সাময়িক দুর্ভাগ্য মাত্র? আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে স্বকীয় ব্যক্তিতা ও নাগরিকতার সমন্বয় ব্যাপারে আমরা কতটা আশাবাদী হতে পারি?

রাজনীতি শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি করে দু'ভাবে: প্রথম, কোনো কোনো দলের একাংশ নিজেদের স্বার্থ মানবতার স্বার্থের ওপর তুলে ধরে; দ্বিতীয়, লোক–সাধারণ এবং আমলা শ্রেণীর মধ্যে অনুরূপতা খুব বেশি প্রত্যাশা করা হয়। এই দুটি অমঙ্গলের মধ্যে প্রথমটির প্রকোপ বর্তমানে খুব বেশি; তবে প্রথমটি উত্তীর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয়টি ভয়াবহ রূপ নেবে বলেই মনে হয়।

নিজের রাষ্ট্র, নিজের ধর্ম, পুরুষজাতি এবং ধনিক শ্রেণীর পক্ষপাতিত্ব করা শিক্ষার নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। যে দেশগুলোতে পাশাপাশি অনেকগুলো ধর্মের অবস্থান সেখানে রাষ্ট্র স্কুলগুলোর মাধ্যমে কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতে পারে না। ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য আলাদা–আলাদা স্কুল স্থাপিত হয়েছে। অথবা নিউ ইয়র্ক সিটি কিংবা বোস্টনের মতো স্থানে ক্যাথলিকদের স্বার্থে পাবলিক স্কুলগুলোতে ইতিহাসের বিকৃত জ্ঞান দান করা হয়।* কিন্তু পুরুষ জাতির প্রতি আগের মতো বিশেষ পক্ষপাত প্রদর্শন সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু রুশদেশের বাইরে শিক্ষা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালনা করা হয়; এবং সর্বত্র স্বীয় রাষ্ট্রের প্রতি একান্তভাবে অনুগত হওয়া শেখানো হয়ে থাকে।

একারণেই বিভিন্ন ধর্ম, শ্রেণী এবং জাতির মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে বিবাদে শিক্ষার ভূমিকা রাখতে হচ্ছে। ছাত্রদের স্বকীয়তা অস্বীকার করে তাদের নবিস সৈনিক গণ্য করা হয়। শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদের কল্যাণের জন্য কিছুই করেনা, কেবল রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টায় থাকে। এমন মনে করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই যে, রাষ্ট্র স্বীয় স্বার্থের উর্ধ্বে ছেলেদের স্বার্থ তুলে ধরবে। তা হলে আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে এমন কোনো রাষ্ট্রের সম্ভাবনা আছে কি–না যেখানে রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ মিলে যাবে।

---

* উদাহরণত, নিউ ইয়র্ক সিটিতে শিক্ষকদের বলতে হয় যে, রিফর্মেশন মূলত প্রটেস্টান্ট বিদ্রোহ।

www.pathagar.com

কোনো সন্দেহ নেই যে, এ রকম একটি সম্ভাবনার জন্য প্রথমেই দরকার হবে বড় ধরনের যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করা। আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ স্থাপন করে যদি এটা অর্জন করা যায় তা হলে সমরবাদী জাতীয়তাবাদী শিক্ষা প্রদানের আর কোনো দরকার করবে না। তখন অফিসার্স ট্রেনিং কোর–এর দরকার হবে না, বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষারও দরকার হবে না, বিকৃত ইতিহাস দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়বে। নরহত্যা পুণ্যবান জীবনের পরকাষ্ঠা বলে গণ্য হবে না। শিক্ষাগত, এমনকি যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যথেষ্ট শক্তিশালী আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা (এই কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা থাকতে হবে বেয়াদব রাষ্ট্রের ওপর মীমাংসা চাপিয়ে দেওয়ার) হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

অবশ্য এ ধরনের কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বড় রকমের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। এতটা বাধা আসবে যে, শান্তিবাদীরা তা ভাবতেও পারবেন না। কম্যুনিজম এবং পুঁজিবাদের মধ্যে বিবাদের ব্যাপারটা ভেবে দেখা যেতে পারে। এই বিবাদের মীমাংসা শান্তিপূর্ণভাবে হবে, এটা আশা করা যায় না। উভয় পক্ষের সমর্থকরাই মনে করেন যে স্বপক্ষ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। ফলে যে যুদ্ধ সমাসন্ন হবে তা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা ঠেকাতে পারবে না। সে সংস্থা যতই শক্তিশালী হোক না কেন। কল্পনা করুন জার্মানিতে কম্যুনিস্ট এবং জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে গেল। এমতাবস্থায় ফ্রান্স ও রাশিয়া চুপ করে বসে থাকবে? আর ঐ গৃহযুদ্ধে যদি ফ্রান্স ও রাশিয়া অংশ গ্রহণ করে তা হলে গ্রেট বৃটেন কি চুপ করে বসে থাকতে পারবে? গোটা ইউরোপ মহাদেশে কম্যুনিজম ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি আমেরিকা নেবে কি? এই সুযোগে চিন এবং ভারত কি লাভবান হতে ব্যর্থ হবে? কম্যুনিজম এবং পুঁজিবাদের মধ্যেকার বিবাদের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না, কোনো সংস্থাই এর সুরাহা করতে পারবে না। তাছাড়া কম্যুনিজের বিজয় না হওয়া পর্যন্ত বিবাদ মীমাংসার কোনো সম্ভাবনা নেই। অন্তত গোটা ইউরোপে কম্যুনিজমের জয় হতেই হবে। পুঁজিবাদ সুখ আনতে পারবে না। অদূর ভবিষ্যতে জীবনযাপনের সাধারণ মান হয়তো অন্যান্য দেশের চেয়ে রাশিয়ায় হবে উন্নততর; এই অবস্থার প্রচারবাদী প্রতিক্রিয়া ঠেকানো যাবে না। তা হলে দেখা যাচ্ছে, বিশ্ব শান্তির সংক্ষিপ্ততম পথ রুশীয় প্রচারণা। যদি বাস্তবিক পক্ষে ঘটনা তাই হয় তা হলে তো সোভিয়েত সরকার যে বালক–বালিকাদের অমার্জিত উপায়ে কম্যুনিজম সম্পর্কে শিক্ষা দেয় তার সমালোচনা করা ন্যায্য কাজ হয় না। এ সব কথা কিন্তু আমি খুব জোর দিয়ে বলছি না; আমি কেবল ইংগিত রাখছি যে উক্ত প্রস্তাবনাগুলো অসম্ভব কিছু নয়।

এতটুকু অবশ্য পরিষ্কার, জার্মানি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে বলেই সে দেশকে শাস্তি পেতে হবে এটা কোনো কাজের কথা নয়। আর জার্মানিকে শাস্তি প্রদান বন্ধ করা না–হলে বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত হবে না। আবার ইউরোপে ফ্রান্সের আধিপত্যের অবসান না হলে শান্তিভোগ থেকে জার্মানি অব্যাহতি পাবে না। আর ইউরোপে ফ্রান্সের আধিপত্যের অবসান হতে পারে কেবল আর একটি যুদ্ধের ফল হিসেবে।

এখানেও সন্দেহ আছে যে একটা প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধ ছাড়া ভারত ইংল্যান্ডের অধীনতা থেকে এবং চিন জাপানের অধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারবে কি–না।

আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করে শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা করার আগে এই বড়ো–বড়ো প্রশ্নগুলোর সমাধান অবশ্যই করতে হবে। যদি আগামী বিশ বছরের মধ্যে কম্যুনিজমের বিজয় সম্ভব হয় তা হলে এই প্রশ্নগুলোর সমাধান হয়ে যাবে। তবে আমি এতটা প্রত্যাশা করার মতো যথেষ্ট আশাবাদী নই।

www.pathagar.com

যুদ্ধ দূর করার পর, ব্যক্তির সঙ্গে নাগরিকের সমন্বয়ের স্বার্থে সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হল কুসংস্কার দূর করা। প্রথাগত কিংবা আবেগগত যে কোনো কিছুতে বিশ্বাসকেই আমি কুসংস্কার মনে করি। যখন লোকেরা এ ধরনের বিশ্বাস সংরক্ষণ জরুরি মনে করে তখন তারা এমন শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি করে যেখানে ছাত্রদের পূর্বপুরুষদের প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা হয়, এবং তাদের যুক্তিহীনভাবে সমস্যা সমাধানে অভ্যস্ত করা হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিরা চান যে, লোকেরা যেন যুক্তিবাদী না হয়ে আবেগতাড়িত হয়। কারণ এতে তারা সমাজ ব্যবস্থা বৈষম্যপূর্ণ, ন্যায়নীতিহীন বলে বিক্ষুব্ধ হবে না, ভাগ্যের লিখন জ্ঞান করে সন্তুষ্ট থাকবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, কুসংস্কার হল অন্যায়-অবিচারের স্বাভাবিক মিত্র। যেখানে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি ন্যায়ভিত্তিক সেখানেই শুধু সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা যুক্তিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পক্ষে কাজ করে।

যুদ্ধ চলাকালে জনসাধারণের মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য মিথ্যা বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। আর যুদ্ধ বাধার কারণের গুরুত্ব সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ জাগলে কঠোর বুদ্ধিগত শৃঙ্খলা কাজে লাগানো হয়ে থাকে। রুশ কম্যুনিজমের জন্য ইতোমধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ, কম্যুনিজমের বীরদের যশগাথা, কম্যুনিজমের পূত-পবিত্র ইতিহাস ইত্যাদি তৈরি হয়ে গেছে। যদি এক শো বছরের সংগ্রামের পর কম্যুনিজমের নিরঙ্কুশ জয় হয়, তা হলে এই সময়কালে রুশ মতবাদ ঘিরে অনেক উপকথা তৈরি হবে, মতবাদে আসবে অনমনীয় কঠোরতা। অসম্ভব নয় যে কম্যুনিজমের বিজয়ের পর যদি কেউ সাহস করে বলেন যে, মার্ক্স ও লেনিন বড়ো মাপের ব্যক্তি ছিলেন না, তবে তাকে খুবই নির্যাতন করা হবে। অসম্ভব নয় যে, অন্ধকার যুগে (Dark Ages) গির্জার যে ভূমিকা ছিল, কম্যুনিস্ট পার্টিও অনুরূপ ভূমিকা দাবি করবে। সম্ভব যে, কম্যুনিজমের বিজয়ের আগে যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তাতে দুনিয়ার সকল শিল্প-কারখানা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর সকল খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ও সুযোগ্য প্রযুক্তিবিদদের ঘটবে অপমৃত্যু। সে ক্ষেত্রে যখন কমুনিস্ট ধর্মগ্রন্থে দেখা যাবে যে, লেনিন 'বিদ্যুতায়ন' থেকে মুক্তি প্রত্যাশা করেছিলেন, তখন সাধারণ মানুষ হয়তো অবাক হয়ে ভাববে ঐ শব্দের ('বিদ্যুতায়ন') তাৎপর্য কী, এবং হয়তো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, ঐ শব্দ দ্বারা বোঝায় মার্ক্সের সঙ্গে মিস্টিক মিলন। সুতরাং এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, একটা বিশ্ব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে থাকবে ন্যায্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, একই সঙ্গে থাকবে কুসংস্কারের প্রাধান্য। তবে অবর্ণনীয় ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ ছাড়া এর কোনোটাই বাস্তবায়িত হবে না। অন্য কোনো অনুমান থেকে বলা যায়, আজকের সোভিয়েত সরকারে যে কুসংস্কার বিদ্যমান তা দূর হয়ে যাবে যদি যুদ্ধে জয়ের দরুন যুদ্ধের মানসিকতা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অবশেষে, এমন কি কম্যুনিজমে বিশ্বাসও গুরুত্ব বহন করবে না। কারণ অন্য কোনো রাজনৈতিক মতবাদ বাস্তব রাজনীতির আওতার মধ্যে আসবে না।

এবার দ্বিতীয় বিপদ সম্পর্কে কিছু বলব। এটা হল অনুরূপতার প্রতি অন্ধ ভক্তি। আমরা আগেই বলেছি, এটা আমলাতন্ত্র এবং গোষ্ঠীর মধ্যে থাকতে পারে। বাচ্চা ছেলেরা অপর ছেলেদের মধ্যে 'অদ্ভুত' কিছু লক্ষ করলে বিরূপ হয়। বিশেষত দশ থেকে পনেরো বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই বিরূপতা খুবই লক্ষ করা যায়। কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন, প্রথানুগতা বাঞ্ছনীয় নয়, তা হলে তা ঠেকানোর জন্য নানা উপায় রয়েছে। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত চতুর বিদ্যার্থীদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় খোলা যেতে পারে (এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)। নির্বোধ বালকরাই কিন্তু খামখেয়ালির প্রতি সমধিক অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে থাকে। এরা মনে করে কোনো সহপাঠীর

www.pathagar.com

রুচি যদি ভিন্ন হয় তবে তাকে নির্যাতন করার যথেষ্ট ও উপযুক্ত কারণ থাকবে। কর্তৃপক্ষও যখন নির্বোধ হয়, তখন নির্বোধ ছেলেদের দলেই যোগ দেয়, আর মৌনভাবে বুদ্ধিমান ছেলেদের নির্যাতনে সায় দেয়। এমতাবস্থায় যে সমাজ সৃষ্টি হবে সেখানে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করবে নির্বোধেরা। কারণ তারা নির্বুদ্ধিতা দ্বারা গোষ্ঠীর মন সহজেই জয় করবে। এ ধরনের সমাজের রাজনীতিবিদরা হবে দুর্নীতিপরায়ণ, স্কুল শিক্ষকরা হবে অজ্ঞ, পুলিশবাহিনী হবে অথর্ব, আর বিচারকরা সাজা দেবে নিরপরাধ লোকদের। এ ধরনের সমাজ, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর হলেও, এক সময় দীন-দরিদ্র হয়ে পড়বে। কারণ গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য যোগ্য লোকদের নির্বাচন করতে ব্যর্থ হবে। এ ধরনের সমাজ, স্বীয় স্বাধীনতার' জন্য উচ্চস্বরে গলাবাজি করতে পারে, সদর রাস্তার মোড়ে স্থাপন করতে পারে 'স্বাধীনতা মূর্তি', কিন্তু এটা হবে অত্যাচারী সমাজ, এ সমাজ এমন লোকদের শাস্তি দেবে যাদের হয়তো বিপর্যয়ের হাত থেকে সমাজটাকে রক্ষা করার যোগ্যতা ছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ে, পরে বৃহত্তর জগতে গোষ্ঠীর অত্যধিক চাপের জন্য এ সব ঘটবে। এ ধরনের অত্যধিক চাপ যেখানে আছে সেখানকার শিক্ষা পরিচালকরা এমনকি সচেতন নন যে এসব অশুভ লক্ষণ। বস্তুত তারা একে ভালো আচরণের উপাদান হিসেবে অভিনন্দন জানায়। এখন তা হলে আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে স্কুল শিক্ষক এবং শিক্ষা অফিসাররা কেন এই ভুলটা করেন, আর এমন কোনো ব্যবস্থার কথা কি আমরা কল্পনা করতে পারি যেখানে এই ভুলটা ঠেকানোর ব্যবস্থা থাকা সম্ভব।

শিক্ষা পেশায় দু'ধরনের লোক থাকেন। এক ধরনের শিক্ষক কোনো পাঠ্য বিষয়ে দারুণ উৎসাহ দেখান, ঐ বিষয়টা ছাত্রদের পড়িয়েও আনন্দবোধ করেন, এবং শিক্ষার্থীদের উক্ত বিষয়ে উৎসাহ জাগাতেও সমর্থ হন। আরেক ধরনের শিক্ষক পদগৌরবে গরিয়ান এবং স্বীয় উচ্চপদের জন্য আনন্দবোধ করেন। এরা শাসন করতে পছন্দ করেন, কিন্তু সাবালক শাসনে কোনো প্রকার যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন না। কোনো ব্যবস্থা প্রথমোক্ত ধরনের শিক্ষকদের জন্য সুবিধাজনক, কোনো-কোনো ব্যবস্থা দ্বিতীয় ধরনের লোকদের পছন্দসই; আধুনিক দক্ষতার ঝোঁক শাসনের প্রতি, শিক্ষকতা এখানে বেশি পাত্তা পায় না। আমি অস্বীকার করছি না যে দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষকেরও দরকার রয়েছে: আমি এক ভদ্রমহিলাকে জানতাম, তিনি এক সময় টেক্সাসের একটি বিদ্যালয়ে পড়াতেন, তিনি স্কুল সময়ে সঙ্গে রিভলভার রাখা প্রয়োজন মনে করতেন। দূরবর্তী এবং জনবিরল এলাকা ছাড়া, অন্যত্র প্রকৃতই অবাধ্য ও বেয়াদব বালক-বালিকাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্ভব। তাতে ফল দাঁড়াবে এই যে, তবুও যারা থেকে যাবে তারা দলপতি হারানোর জন্য সহজেই কাবু হয়ে পড়বে। যে শিক্ষক তার বিষয়ে দারুণ উৎসাহী এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি মমত্ববোধ করেন, এ দুয়ে মিলে যে কোনো পরিস্থিতিতে অনেক বেশি জ্ঞানদানে সমর্থন হন। যে শিক্ষক কেবল শৃঙ্খলারীতি ও দক্ষতাকে বড়ো করে দেখেন, কিন্তু জ্ঞান রাখেন কম এবং ছেলেদের প্রতি মমত্ববোধ করেন না, তার পক্ষে শিক্ষক হিসেবে সফল হওয়া সম্ভব হয় না, ছাত্ররা এদের দ্বারা কম উপকৃত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বড়ো স্কুলগুলোতে প্রশাসনিক কড়াকড়ি খুব বেশি থাকে, আর প্রশাসনিক কাজে সর্বাধিক পটুত্ব দেখাতে পারেন সবচেয়ে বাজে শিক্ষকরাই। আবার, যেহেতু উচ্চতর কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক কাজকর্মের খোঁজ-খবর রাখেন, ক্লাস কীভাবে চলছে তা জানার গরজ বোধ করেন না, ফলে তারা শিক্ষক হিসেবে অযোগ্য লোকদের মাল্যভূষিত করেন। উপরন্তু যে কোনো বড়ো প্রশাসনযন্ত্রের উচ্চপদস্থ কর্তারা স্বাভাবিকভাবেই মনে করেন প্রশাসন সবচেয়ে সম্মানজনক ও দুরূহ কাজ। ফলে স্কুলের প্রশাসন কর্তারা সমধিক

www.pathagar.com

পদমর্যাদা লাভ করে, বেতনও পায় বেশি, আর প্রকৃত শিক্ষকরাই থাকে অবহেলিত। এজন্যই লক্ষ্য করি দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষকের সংখ্যাধিক্য। এই শিক্ষকরাই অনুরূপতাকে উৎসাহিত করেন, অথচ প্রকৃত শিক্ষকরা যোগ্যতার কদর করে (এটাও এক ধরনের পাগলামি বা খামখেয়ালিপনা)। এরা যোগ্যতার খাতিরে যে কোনো ধরনের খামখেয়ালিপনা সহ্য করেন। অতএব অনুরূপতার বিপদ দূর করার জন্য দরকার হল শিক্ষা প্রদানে উৎসাহী শিক্ষকদের মদদ দেওয়া।

এখানে আমরা একটা সমস্যার কাছাকাছি এসেছি। দুনিয়া আরো সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যাটা আরো গুরুতর রূপ নেবে। একটি বড় প্রতিষ্ঠানের বড় কর্তার বিশেষ ধরনের যোগ্যতার দরকার করে। একে আমরা নির্বাহী বা প্রশাসনিক যোগ্যতা বলি। এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃত কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। যে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠান চালনার জন্য একই ধরনের প্রশাসনিক যোগ্যতার দরকার করে। যে লোক ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলার বাণিজ্য দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারে তার পক্ষে বিমান আক্রমণ থেকে লন্ডনের আকাশ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব, মধ্য এশিয়ায় অনুসন্ধান কার্য পরিচালনাও তার জন্য কঠিন নয়, বৃটিশ কলাম্বিয়া থেকে ইংল্যান্ডে কাঠ পরিবহনের ব্যবস্থা করাও তার জন্য কোনো সমস্যা নয়। এই কাজগুলোর জন্য তার তুলা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান থাকার দরকার নেই, তার বিমান যুদ্ধের বিদ্যা না থাকলেও চলবে, তুর্কিস্তানের মাটির নিচে চাপা-পড়া নগরাদির খবর তার জানা না থাকলেও সমস্যা হবে না, বন কিংবা নৌবিদ্যার জ্ঞানের তার কোনো দরকার নেই। তার অধীনস্থ কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকলেই চলে যাবে। কিন্তু তার নিজের দক্ষতা, বলতে গেলে, বিমূর্ত এবং বিশেষ কোনো বিদ্যার ওপর নির্ভরতাও নেই। অতএব দেখা যায় যে, একটা প্রতিষ্ঠান যতোই বড় হতে থাকে ততই প্রতিষ্ঠানের বড়-বড় পদগুলো এমন লোকদের কাছে চলে যায় যাদের প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত কাজের সঙ্গে সম্পর্কই নেই। এই ঘটনার অনিবার্যতা থাকলেও, কিছু বিপদ থেকে যায়। এবং এই বিপদগুলো শিক্ষাক্ষেত্রেও উঁকি দেয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিপদটা এখানে যে, প্রশাসকরা কেবলই শ্রেণিকরণ ও পরিসংখ্যানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান। এই পক্ষপাতিত্বগুলো থাকবে না, তা নয়; অনেক উপাদান, তথ্য কাজে লাগাতে হয়, এবং দ্রুততার সঙ্গে কাজে লাগাতে হয়, ফলে শ্রেণিকরণ ভিন্ন তার চলে না। এখন, এক ধরনের উপাদানের বেলায় শ্রেণিকরণ হয় সন্তোষজনক। শব্জী বিক্রেতা মূলা, আনাজ, বেগুন, আলু ইত্যাদি বিক্রি করে। তাকে কখনো ভাবতে হয় না; 'এটা বেগুন না গাজর?' ছেলেদের কাছে ব্যাপারটা অন্য রকম। একটা ছেলের মাথায় ঘিলু কম কি-না সেটা একটা অনিশ্চিত প্রশ্ন, বৈজ্ঞানিকভাবে বলতে গেলে, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কোনো দিনই সম্ভব হবে না। প্রশাসনিকভাবে বলতে গেলে, সঠিক জবাব দিতেই হবে; কারণ এ জবাব থেকেই সাব্যস্ত করতে হবে ছেলেটাকে বিশেষ স্কুলে পাঠানো জরুরি, নাকি ওর জন্য সাধারণ স্কুলই উপযুক্ত। স্বয়ং প্রকৃতিতে যথাযথতা না থাকলেও একজন প্রশাসককে যথাযথতায় পৌঁছার জন্য উপায় খুঁজে বের করতেই হয়। এজন্য প্রশাসকরা মেধা পরীক্ষায় বিশ্বাসী। যে কথা মানসিক প্রতিবন্ধীদের বেলায় খাটে তা অনুরূপ যে কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যে ব্যক্তি বাচ্চাদের একটি ক্ষুদ্র দল অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে দেখাশুনা করেন, তিনি দলের প্রত্যেককে ব্যক্তি হিসেবে জানেন। তিনি ওদের সম্পর্কে যা বোধ করেন তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কোনো ছাত্রের মধ্যে নতুন কিছুর আভাস পেলে তিনি সেটা বেশি পছন্দ করবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ছেলেদের দূর থেকে দেখেন, ছেলেদের সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন

www.pathagar.com

অফিসীয় কাগজপত্রের স্তূপ থেকে তার মধ্যে অনুকম্পায়ী হওয়ার ধৈর্যই কাজ করবে না। তিনি শুধু প্রত্যাশা করবেন সব ছেলে যেন এক রকম হয়, কারণ এতে তার প্রশাসনিক দায়িত্ব সহজতর হবে। কিন্তু তিনি বয়স, লিঙ্গ, জাতীয়তা এবং ধর্মের কারণে শ্রেণিকরণে বাধ্য হন। সর্বাধিক আলোকিত ব্যক্তিরাও মেধা পরীক্ষা দ্বারা শ্রেণিকরণ অনুমোদন করেন। এমনকি এই আলোকিত ব্যক্তিরা সব কিছু রেডিমেড চান, ব্যক্তি জীবনের গুণাবলী ভুলে থাকেন। অথচ ব্যক্তি গুণের জন্যই একজন লোক অপর জন থেকে আলাদা। এই কারণেই ভয় থেকে যায়। বর্তমানে জগৎ যে অনুরূপতার দিকে ঝুঁকছে, শিক্ষা কর্তারা না পাছে সে দিকেই ঠেলে দেয় শিক্ষা ব্যবস্থা।

এই সমস্যাটা প্রশাসনিক। এর প্রশাসনিক সমাধানও আছে, যার নাম বিকেন্দ্রীকরণ। বিশ্ব-সরকার বলে কিছু থাকলে সকল শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর কিছুটা নজরদারি নিশ্চয় করতো; অতিরিক্ত স্থানীয় দেশপ্রেমূলক শিক্ষা নিশ্চয় নিষিদ্ধ হয়ে যেত, অহিতকর সকল মতবাদও চলতে দেওয়া হত না। তবে অন্য সব ব্যাপারে শিক্ষা স্থানীয়ভাবে সংগঠিত হওয়া অনুমোদন লাভ করত। উক্ত সরকার বৈজ্ঞানিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে নানা রকম নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনুমতি পাওয়া সহজ হত। অধিকাংশ প্রশাসকের কাছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুত্ব অজ্ঞাত। কিন্তু শিক্ষা আরো বিজ্ঞানমনস্ক হলে অবস্থার পরিবর্তন হবে। বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রের অনিয়ম ও ব্যতিক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বার্থে মেনে নিতে হবে। আসলে অনিয়ম ও ব্যতিক্রম না থাকলে প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে, জীবনে বৈচিত্র্যও থাকবে না। তবে কর্মকর্তাদের এই জিনিসটা বুঝতে সময় লাগবে, তারা যদি বিজ্ঞানের জ্ঞান যথেষ্ট আয়ত্ত করতে না পারেন তা হলে কোনোদিনই বুঝতে পারবেন না। তাছাড়া বিজ্ঞানের জ্ঞান শুধু পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, জীববিজ্ঞানের জ্ঞানও থাকতে হবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গুরুত্ব খাটো করে দেখার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু জনবহুল শিল্প জগতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা দরকার। আমরা যারা বড়-বড় শহরে বাস করছি, তারা জানি জনতার ভিড়ে কীভাবে চলতে হয়। আমরা হাঁটতে হলে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে হাঁটি, আমাদের গতি সীমিত, নির্ধারিত স্থান দিয়েই রাস্তা পার হই। এসব অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং বাহ্যিক ব্যাপার। কিন্তু কিছু গুরুতর ব্যাপারও রয়েছে। সাধু জন ব্যাপ্টিস্ট আধা-ন্যাংটো অবস্থায় চলাফেরা করতেন, আর প্রায় চিৎকার করে বলতেন, 'এখনো অনুশোচনা করার সময় আছে: স্বর্গরাজ্য হাতের কাছে।' আজকের দিনে যদি কোনো ব্যক্তি এই কাজটি লন্ডন কিংবা নিউ ইয়র্কে করেন তা হলে রাস্তায় জনতার ভিড় ঠেকানো যাবে না, ট্র্যাফিক বন্ধ হয়ে যাবে। আর পুলিশ তাকে এসব কথা প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া করে বলার জন্য উপদেশ দেবেন। শিল্প সমাজের গুটিকয় ব্যক্তিই শুধু নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীন; সংখ্যাগরিষ্ঠের সত্তা সংস্থার কাছে বাঁধা। সমষ্টিগতভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। বর্তমান কালে, অতএব, নাগরিকতা বোধ এবং সামাজিক সহযোগিতার মানসিকতা অনেক বেশি জরুরি। আবার এসব করতে হবে ব্যক্তিসত্তা যথাসম্ভব কম খাটো করে।

মানুষের জীবন যদি সন্তোষজনক হতে হয়, তা সে ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে হোক কিংবা বৃহত্তর জগতের দৃষ্টিকোণ থেকে, তা হলে দু'ধরনের সঙ্গতি থাকতে হবে: মেধা, আবেগ এবং ইচ্ছাশক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ সঙ্গতি, আর বাহ্যিক দিকে অপরের সঙ্গে সঙ্গতি। এই উভয় ক্ষেত্রের জন্যই বর্তমানে চালু শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ অন্তঃসঙ্গতি রুদ্ধ হয় শৈশব ও কৈশোরে ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয় বলে। আর এই শিক্ষা আবেগ

www.pathagar.com

শাসন করে, কিন্তু পরবর্তী জীবনের মেধা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। ইচ্ছাশক্তি দোদুল্যমান থাকে। আবেগ ও মেধার মধ্যে যখন যেটা নিয়ন্ত্রণ লাভ করে, একজনের ইচ্ছাশক্তিও সে দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ ধরনের দ্বন্দ্ব সহজেই দূর করা যায় যদি তরুণদের এমন মতবাদ গেলানো হয় যা বয়স্ক বুদ্ধির কাছেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। এই কাজটি ক্ষুদ্র আকারে বেসরকারি স্কুলগুলোতে করা যেতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বৃহৎ আকারে করা যাবে না।

অপরের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে বাহ্যিক অন্তঃসঙ্গতি সৃষ্টি দুরূহ কাজ। এবং এর পূর্ণ সমাধান এ যাবৎ অনাগত। প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতা মানুষের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। আর ব্যক্তিতা বিসর্জন না দিয়ে প্রতিযোগিতা রুদ্ধ করা যাবে না। তবে ব্যক্তিতা এবং অসংগঠিত প্রতিযোগিতা জগতের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। দু'ব্যক্তি একটি নারীর জন্য একে অপরের ক্ষতি না-করে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারেন, তবে দেখতে হবে একজন যেন অপরজনকে খুন করে না বসেন। আধুনিক জগতে অন্তঃসঙ্গতির অভাবের ভয়াবহ রূপটা সংগঠিত রূপ, এই বিরোধ জাতিতে-জাতিতে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে। এ ধরনের বিরোধ বা অন্তঃসঙ্গতিহীনতা যতদিন থাকবে, ততদিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যে সুবিধাদি সৃষ্টি করেছে তা উপভোগ ব্যাহত হবে। বর্তমানে জাতিতে-জাতিতে বিরোধ শিক্ষাব্যবস্থা উৎসাহিত করে। বিদ্যালয়গুলোতে যদি আন্তর্জাতিকতাবাদী প্রচারণা চালানো যায় তা হলে এই অবস্থার অবসান হতে পারে। আবার আগে রাজনৈতিক আন্তর্জাতিকতার জয় না হলে এটি সম্ভব হবে না। রাজনৈতিক কৃতিসমূহ শিক্ষা সংহত করতে পারে। কিন্তু যত দিন জাতীয় রাষ্ট্র শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে ততদিন এ কাজটি সাধ্যের বাইরে থেকে যাবে।

অতীতে যুদ্ধের আকারে প্রতিযোগিতা বিজয়ী পক্ষের জন্য লাভজনক ছিল। সে কাল আর নেই। এখন প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তি স্পষ্ট অনুভব করেন যে, জগতের সকল সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করা গেলে, সকল বিবাদের মীমাংসা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের মাধ্যমে হলে, বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দিলে, যে কোনো ব্যক্তিকে দেশ থেকে দেশান্তরে ইচ্ছেমতো পর্যটন করার স্বাধীনতা দিলে আমরা সবাই আরো সুখী হতাম। বিজ্ঞান এতটা পরিবর্তন এনেছে যে গোটা বিশ্ব একটা অর্থনৈতিক ইউনিটে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি এবং ধ্যান-ধারণা অনেক পেছনে পড়ে আছে। প্রতিটি জাতি অর্থনীতির দেয়াল তুলে বিচ্ছিন্ন হয়ে অযথা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। আমরা শ্রম বাঁচানোর উপায় উদ্ভাবন করি, আর এদিকে বেকার সমস্যা দ্রুত বেড়ে যায়। উৎপাদিত পণ্য আমরা যখন বিক্রি করতে পারি না তখন মজুরি হ্রাস করি। আমরা ধরে নিই যে, লোক কম কাজ করলে বেশি উপার্জন করবে, তারা ব্যয়ও করবে বেশি। এই যে সার্বিক অমঙ্গল, তার উৎস একটাই। আমাদের প্রযুক্তি দাবি করে যে সমগ্র মানবতা এককভাবে উৎপাদক ও ভোক্তা হিসেবে সহযোগিতা করবে, কিন্তু আমাদের আসক্তি এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের লক্ষ্য হল প্রতিযোগিতা।

আমাদের এই জগৎ উন্মাদরোগগ্রস্ত। ১৯১৯ সালের পর থেকেই গঠনধর্মী চিন্তা উঠে গেছে। কারণ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য মানুষ তাদের বুদ্ধি খাটাবে না। মানবতাকে কেবল বিভিন্ন শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করবে। আত্ম-সংরক্ষণের জন্য বুদ্ধি খাটানোয় এই সামগ্রিক ব্যর্থতার প্রধান কারণ হলো, অনেকের অবচেতনে পাগলাটে এবং বিধ্বংসী প্রেরণা ওৎ পেতে আছে। শৈশব, কৈশোর এবং বয়ঃসন্ধিকালে এদের সঠিকভাবে লালন-পালন করা হয়নি বলেই এমনটা ঘটছে। উৎপাদনের উপায়ের নিরন্তর উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আমরা দরিদ্রতর হতে থাকব। আর একটি মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদের

www.pathagar.com

সচেতনতা সত্ত্বেও আমরা তরুণদের মনে এমন প্রেরণা প্রবিষ্ট করছি যে, এটা মহাযুদ্ধ অনিবার্য করে তুলবে। বিজ্ঞানের সেবা সত্ত্বেও আমরা কোনো সমস্যা যুক্তিশীলভাবে বিবেচনার বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি। প্রকৃতির ওপর উত্তরোত্তর প্রভুত্ব বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও মানুষ হতোদ্যম এবং অক্ষমতার বোধ দ্বারা আক্রান্ত। এতটা নৈরাশ্য মধ্যযুগেও ছিল না। এসবের উৎস বাহ্যিক জগতে অনুসন্ধান করলে চলবে না, আমাদের অন্তর-প্রকৃতিতেও এটা খুঁজে লাভ নেই। কারণ অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার অনেক বড়। এটা খুঁজতে হবে আমাদের আসক্তির মধ্যে, এটা খুঁজতে হবে আমাদের আবেগগত অভ্যাসে; কৈশোরে আমাদের মনে যে অনুভূতি প্রবিষ্ট করা হয়েছে তাতে এর সন্ধান মিলতে পারে; শৈশবে আমাদের মনে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে তাতে এর সন্ধান হয়তো সমূলক। এই সমস্যার নিদান হল, আমাদের মানসিকভাবে প্রকৃতস্থ হতে হবে। আর প্রকৃতস্থ করার জন্য প্রকৃতস্থ শিক্ষা প্রদান করতে হবে। বর্তমানে আমরা যেসব বিষয় বিবেচনা করছি তার সবগুলোর ঝোঁক দেখা যাচ্ছে সামাজিক বিপর্যের দিকে। ধর্ম নির্বুদ্ধিতা উসকে দেয় এবং জাগতিক বাস্তবতা সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে; যৌন শিক্ষার স্নায়ু-বৈকল্য ডেকে আনার ঘটনা বিরল নয়। কোনো ক্ষেত্রে বৈকল্য সংগঠনে ব্যর্থ হলে অবচেতন মনে বিরোধের বীজ বপন করে, যা পরবর্তীকালের বয়স্ক জীবন অসুখী করে তোলে; বিদ্যালয়গুলোতে জাতীয়তাবাদের নামে শেখানো হয় যে, তরুণদের প্রধান কর্তব্য হল গণহত্যা; শ্রেণীচেতনা থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্য মেনে নেওয়া হয়; আর সামাজিক সংগ্রামে প্রতিযোগিতা নির্দয়তার জন্ম দেয়। আমরা কি অবাক হয়ে ভাবতে পারি না যে, এই আমাদের জগৎ যেখানে রাষ্ট্রশক্তি নিয়োজিত আছে তরুণদের মধ্যে ক্ষেপামি, নির্বুদ্ধিতা, গণহত্যার জন্য প্রস্তুতি, অর্থনৈতিক অন্যায় ও নির্দয়তা অনুপ্রবিষ্ট করার জন্য, সে জগৎ কোনো অর্থে সুখী হতে পারে? আমরা কি একজন লোককে শাস্তি প্রদান করব যদি তিনি এসবের পরিবর্তে মেধার দীপ্তি, প্রকৃতস্থতা, দয়া ও ন্যায়বোধের পক্ষে কথা বলেন? বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষায় এ সবের ওপর জোর দেওয়ার দাবি করেন?

বর্তমান বিশ্ব বড় বেশি উত্তেজনায় ভুগছে, ঘৃণার ভাবটা অতিরিক্ত দেখা যাচ্ছে, এতটা দুর্ভাগ্য এবং যন্ত্রণা আক্রান্ত যে লোকেরা ভেদবুদ্ধি হারিয়ে ফেলছে। অথচ বিপাক থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হল সঠিক বিচারবুদ্ধি। এ যুগ এতটা যন্ত্রণাকর যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও নিদারুণ নৈরাশ্যে ভুগছেন। অথচ হতাশা বোধ করার যুক্তিগ্রাহ্য কোনো কারণ নেই; মানববংশের সুখী হওয়ার মতো উপায় এখনো অবশিষ্ট আছে। শুধু দরকার উপায়ের সঠিক সদ্ব্যবহার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com